KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলি-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীরা [illegible]
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৮/২ ৫৮/৩ ৫৮/৪	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫ কার্তিক-পৌষ ১৪০৫ মাঘ-চৈত্র ১৪০৫
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৪ মাঘ-চৈত্র ১৪০৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

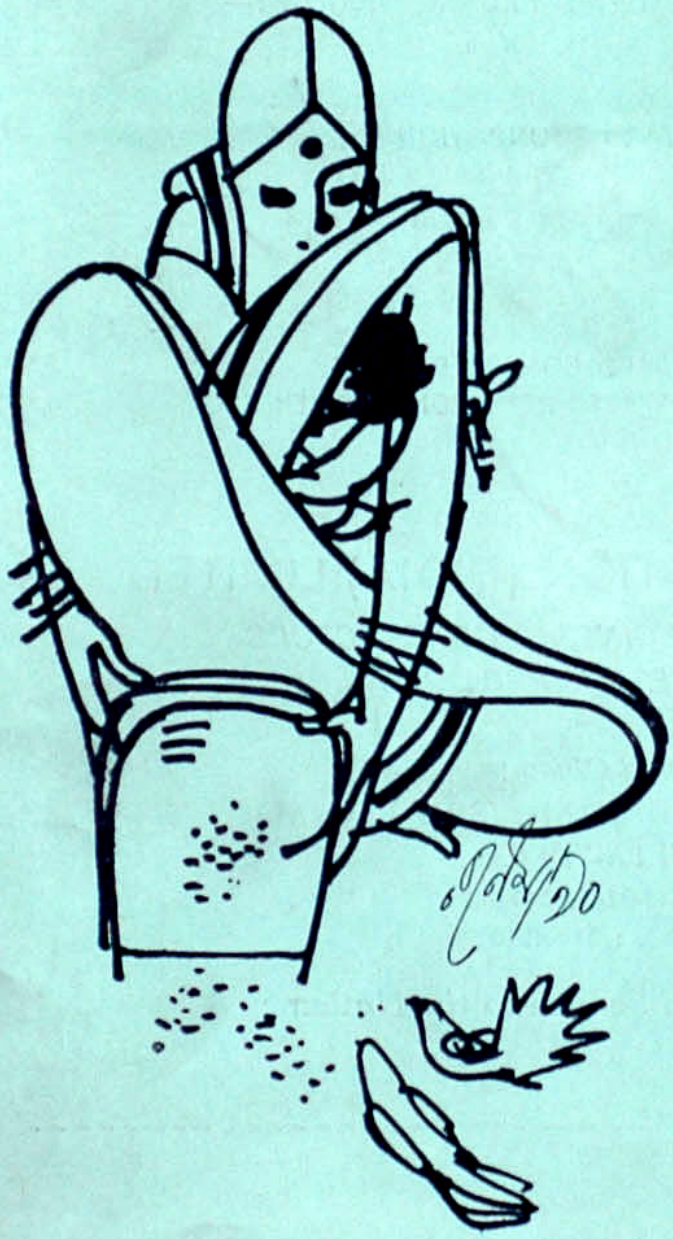

কীভাবে আধুনিক ভারতীয় কবিরা নজরুল ইসলামের প্রাণসত্তাকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ নিবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে সেই চমকপ্রদ তথ্য।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যে বিরূপতা ছিল তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তন অধ্যাপক অরুণ মজুমদার।

গৌরী আইয়ুবের ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি'র শেষাংশ। এতে রয়েছে ১৯৫২ সালে শান্তিনিকেতনে আয়োজিত দুই বাংলার সম্মিলিত ঐতিহাসিক সাহিত্যমেলার সাফল্যের বর্ণনা।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত-র ধারাবাহিক 'বঙ্গসংহার'-এ এবারের আলোচ্য নোয়াখালির দাঙ্গার সেই অজানা তথ্য যা বিধৃত রয়েছে তৎকালীন উচ্চপদস্থ আমলার প্রতিবেদন সম্বলিত সরকারি নথিতে। ফজলুল হক প্রসঙ্গ সূচিত হয়েছে এই পর্বেই।

উনিশ শতকের মহিলা শিল্পী মিসেস বেলনোর আঁকা তৎকালীন দৈনন্দিন ভারতীয় জীবনযাত্রার অমূল্য চিত্ররাজি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরচনার অসাধারণত্ব নিয়ে অমিতাভ দাশগুপ্ত-র অনবদ্য আলোচনা।

ভিন্ন স্বাদের কাহিনী 'রাইহান স্যারের গল্প'।

আহমদ শরীফ স্মরণে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবাসী মাত্রেই দাবি করেন
তিনি মিষ্টির ঠিকুজি কুলুজি সমস্ত জানেন।
কিন্তু সত্যিই জানেন কি ?

★ ঘরে বাইরে রসগোল্লার প্রচলন কে করেন বলুন তো ?
★ এই রসগোল্লাকে প্রথম বায়ু নিরুদ্ধ আধারে আবদ্ধ করেন কে ?
★ রসমালাই কার সৃষ্টি ?
★ ডায়াবিটিস রুগীর জন্যে বিশেষ মিষ্টি তৈরি করেন কে ?
★ কে প্রথম সন্দেশের মধ্যে ছানার পায়েস ভরার কথা ভাবেন ?

যদি সব প্রশ্নের উত্তরে বলে থাকেন কে. সি. দাশ,
তাহলে আপনি সত্যিই.....

কে. সি. দাশ

১) ১১এ ও বি, এসপ্ল্যানেড ইস্ট,
কলিকাতা-৭০০ ০৬৯
টেলিফোন : ২৪৮-৫৯২০

২) ৩৮, চার্চ স্ট্রীট
ব্যাঙ্গালোর-৫৬০ ০০১
টেলিফোন : ৫৫৮-৫৬৭২/৭০০৩

নবীন চন্দ্র দাশ
২এ, হেমকর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৫
টেলিফোন : ৫৫৪-৫৬৮৯

বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৪
মাঘ-চৈত্র ১৪০৫

এ গান যেখানে সত্য	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	২৬৩
দিনপঞ্জি	কৃষ্ণ ধর	২৬৬
হাতিপুজো	আনন্দ ঘোষ হাজরা	২৬৭
এখন আমরা	তুলসী মুখোপাধ্যায়	২৬৮
জন্মান্ধ	অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৯
নির্মাণবাদীরা এসো	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭০
ঢেউ	সুদেব বক্সী	২৭১
হে দেহপোজীবিনী	আমীর সিংহ	২৭২
ভাঙি না কখনও	ধ্রুব চক্রবর্তী	২৭৩
ধারাবাহিক		
শান্তিনিকেতনের দিনগুলি	গৌরী আইয়ুব	২৭৪
বঙ্গসহার এবং	সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত	২৮২
বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক বাঙালি মধ্যবিত্ত-মন	অরুণ মজুমদার	২৮৯
গল্প		
রাইহ্যান স্যারের গল্প	বেণু দত্তরায়	৩০১
গ্রন্থসমালোচনা		৩০৭
অমিতাভ দাশগুপ্ত ■ দিবেন্দু হোতা ■ মন্দার মুখোপাধ্যায় ■ বসন্তকুমার সামন্ত ■ সৌমেন সেন ■ শতদ্রু চাকী ■ শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় ■ অসীম রেজ ■ সৌমিত্র লাহিড়ী ■ রণেন্দ্রনাথ দেব ■ কুন্তল মুখোপাধ্যায়		
সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি		
মিসেস এস.সি. বেলনো — উনিশ শতকের এক মহিলা শিল্পী	আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৩৩
আর্সেনিক খেয়ে বেঁচে আছি	তিমির বসু	৩৪১
নাট্যসমালোচনা		
সন্দর্ভ-এর যযাতীয় : উপভোগ্য হাসির নাটা	মেঘ মুখোপাধ্যায়	৩৪৫
স্মরণে		
আহমদ শরীফ, শ্রদ্ধাস্পদেষু	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৭
চিঠিপত্র		
অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী		৩৪৮

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইণ্ডেপ্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে — র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

দূরভাষ : ২৩৭-৩৭৭০

শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদক : আবদুর রউফ

THE ABC OF NATION-BUILDING BEGINS WITH YOU

For us, even a task as Herculean as building a nation appears simple as you become the focus of attention. As simple as learning the alphabet since we begin at the beginning—with the ABC. In our Tata Steel Rural Development Scheme, the TSRDS, there is a concerted emphasis on education at primary and secondary levels.

We also endeavour to make sure you never run out of water for drinking or irrigation, travel over wide roads and sturdy bridges and have access to modern health care.

Besides, in the fields of sports promotion, afforestation, family planning, community and tribal welfare, we have undertaken special programmes that keep your interests in mind. Because if you don't have benefits, we can't succeed in our endeavour to build this nation. An endeavour as complex as any, yet, thanks to you, as simple as ABC!

TATA STEEL
Where *you* come first

HTA 3876.97-1

প্রবন্ধ

এ গান যেখানে সত্য

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভাবতে কিছু অবাকই লাগে, যাঁকে ঘিরে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সঞ্চার ঘটেছিল, সেই মানুষটি অন্তত এপার বাংলার কবিতার আসরে এখন সবচেয়ে অনুল্লেখিত ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে, পক্ষান্তরে নজরুল ইনস্টিট্যুটের প্রবর্তনায় যেসব কাজ সম্পন্ন হয়েছে সে ক্ষেত্রে নিছক জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র হিসাবেই তাঁকে খাড়া করার চেষ্টা হয়নি। এমনকী সেখানে আঞ্চলিক সম্মোহ থেকে মুক্ত করে নিয়ে সুব্রহ্মণ্য ভারতীর পাশে রেখে তাঁর যে-আলেখ্য রচিত হয়েছে সেটি মূলত একজন আধুনিক কবির। প্রসঙ্গত অবশ্যই কৃষ্ণমূর্তির মতো সতর্ক সমালোচককে এই দুই কবির রচনায় বিদ্রোহবীক্ষা কিংবা সর্বস্বান্ত মানুষের প্রতি নিবিড় আগ্রহ ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়েছে। সেটা কোনও অপরাধের ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়, কেননা আমাদের এই ক্ষুব্ধ সময়ে সারা জগৎ জুড়েই এই লক্ষণগুলি আবারও জাগর হয়ে উঠেছে এবং একদা শিল্প-সর্বস্ব কবিরাও কবিতার বিষয় হিসাবে তাদের বরণ করে নিচ্ছেন। সেদিক থেকে দেখলে নজরুলের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলার সুযোগ তো থাকতেই পারে না। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণমূর্তি সংগতভাবেই এক ঝটকায় ভারতী এবং নজরুলকে যাবতীয় সংকীর্ণ বর্গ থেকে বিবিক্ত করে নিয়ে চিরায়তের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, সেই এষণা আমার কাছে শ্রদ্ধেয় বলে মনে হয়: 'The two poets were not mere rationalists and patriots. They were internationalists and humanists.'

এ রকম বড় জায়গায় রেখে প্রিয় কবিকে দেখতে চাইলে সর্বব্যাপী ভারতীয়তার অভীপ্সাও চরিতার্থ হয় এবং আমরা এক সময় অনুমান করে নিতে পারি তামিল কিংবা বাংলা কবিতার বিবর্তনে নজরুলের ভূমিকা শুধুমাত্র ঐতিহাসিকই নয়, কোথাও না কোথাও প্রবহমান ও সক্রিয় হয়ে আছে। সেই কৌতূহলে ভর করে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পাই তামিলনাড়ুর দুরাইপণ্ডিয়ান (জ. ১৯৪১), মু সেথা (জ. ১৯৪৫) কিংবা বয়ইবলভন (জ. ১৯৪৮)-এর মতো বড় মাপের কবিরা নজরুল ইসলামের প্রাণচেতনা অনায়াসেই অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। সামাজিক অন্যায়-অবিচার এঁরা আদৌ মেনে নিতে পারেন না, প্রতিবাদ ও প্রতিকারের মর্মে তাঁদের কলম কেঁপে যায় এবং শেষ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীকেই শিল্পের শামিল করে তুলবার জন্য এই তিনজনই বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন।

অন্যদিকে নজরুলের জীবদ্দশাতেই, বিশেষত তাঁর সমবয়স্ক এবং প্রথম পর্বে তাঁর দ্বারা গ্রস্ত কবি জীবনানন্দের ক্রমগ্রাসী

অভিঘাতে, বাংলা কবিতা অন্তর্বৃত একটি সংঘটন হয়ে উঠেছে। প্রগতি শিবিরের কবিরাও, প্রাথমিক কিছু উচাটনের পর, তাঁদের কথাটা বলার জন্য অত্যন্ত অনুদাত্ত স্বরেরই আশ্রয় নিয়েছেন। শুধুমাত্র কবিতার মাধ্যমেই বৈপ্লবিকতার সংগ্রাম রচনা যে সম্ভব নয়, এই বোধ এক সময় তাঁদের স্পর্শ করেছে বলে তাঁরা জীবনবিমুখ কিংবা পরাভববাদী, এ রকম অপবাদ দিলে বিপ্লব বা কবিতা কোনোওটির প্রতিই সুবিচার করা হবে না। যেহেতু কবিতার কাজ ভাষার স্নায়ব বয়নে চলতে থাকে, তাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলতে গিয়ে যে ফয়দা হয় না সেই চৈতন্য কোনও-না-কোনওদিন বিপ্লবের কাজেও লাগতে পারে। আমাদের মার্কসবদী কবিরা ক্রমশই এই উপলব্ধির ঘরানায় শ্বাসিত হয়েছেন, সেটা এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে কবিতা আমাদের ইহজীবনের একটি গহন শক্তি যাকে মহত্তম উদ্দেশ্যের তাড়নায় ব্যবহার করা যায় না।

কিন্তু তা বলে কি কবিরা সব সময় হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন, কোনও ইমার্জেন্সি কিংবা পারমাণবিক বিস্ফোরণেও অবিচলিত থেকে প্রেমের কবিতাই লিখে যাবেন? বাংলাভাষার পরিমণ্ডলে ভাগ্যক্রমে এরকম দুর্দশার নজির নেই। এ জাতীয় নানাবিধ প্রযোজিত দুর্ঘটনার আগে থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় কি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় যে-অগ্নিকোণগুলি প্রণীত হয়েছে তাদের শিল্পমূল্য নস্যাৎ করে দেওয়া আমার অভিপ্রায় বা সাধ্য নয়। আমি এই সূত্রে বরং এতদূর দাবি করব, বাংলা কবিতার প্রান্তে একটি ধারা এখনও সজাগ যেখানে, বাইরের দিক থেকে চাপিয়ে দেওয়া দুঃসময় দেখা দিলেই, নজরুল ফল্গুশক্তি হয়ে কাজ করেছেন। এই প্রবাহের একটি উত্তীর্ণ উদাহরণ:

লিখেছিস কি যে একটি কবিতা
যা নিয়ে পাড়ায় এত হল্লা?
যাকে দেখি, সেই বলে 'ছেলেটা
ছিল, ভাল; আজ গেছে গোল্লায়

লিখেছিস বটে এক কবিতা
পুলিশ করছে তোকে তল্লাশ...

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নজরুল যে কালে বিদ্রোহী লিখেছিলেন' নামাঙ্কিত এই কবিতার প্রসঙ্গ নন, অনুষঙ্গ নজরুল। একথা চোখে আঙুল দিয়ে আজ বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার পড়ে না, কবিতায় অনুষঙ্গই এখন প্রসঙ্গ।

আমি জানি, শতবার্ষিকীর গরজে এ ধরনের তুলনালব্ধ উক্তি কবিবন্ধুদের কাছে আপত্তিকর ঠেকতেই পারে। আত্মপক্ষ সমর্থনের দিকে না গিয়ে আমি শুধু বলতে চাই, সরাসরি উচ্চারিত না হলেও বাংলা কবিতার অন্তঃশরীরে নজরুল এমনই নিশ্চিন্ত অথচ উদ্দীপক সত্তা হয়ে অধিষ্ঠিত যে আলাদা করে তাঁর বন্দনা করবার প্রয়োজন বড় একটা হয় না। কিছুকাল আগেও পাড়ায় পাড়ায় একযোগে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তকে যে-তরুণেরা উদ্‌যাপন করত, সৌভাগ্যত তারা অধুনা কথঞ্চিৎ অবসন্ন এবং অন্যমনস্ক। বলা বাহুল্য তাদের পক্ষে নজরুলের কবিতা নতুন করে পাঠপঠনের পক্ষে এই এক সুবর্ণ মুহূর্ত।

এরকম উদ্যম নিলে নজরুলের এককালীন প্রকাশ্য প্রতিপত্তির আবহাওয়াটা আবার হয়ত চোখের সামনে ফুটে উঠবে। কবিতা তখনও 'ধ্রুপদী' এবং 'লোকায়ত' এই দুই শিবিরে বিভক্ত। এই বিভাজনের জন্য দায়ী সমালোচকেরা এই দুটি অভিমুখিতার মাঝখানে যে কী রকম বিবাদমান পাঁচিল তুলে দিয়েছিলেন খোদেজা খাতুনের প্রতিবেদনে তার উপভোগ্য বর্ণনা আছে: 'লোকে লোকারণ্য। আমরা কয়েকজন মোহিতবাবুকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করতে গেলাম। শুনে মোহিতবাবু বললেন, 'আমি যাব নজরুলের সভায়? তোমরা অর্বাচীন বালক। বাংলাদেশে কে কী তোমাদের জানার কথা নয়। নজরুল, জসীম এরা তোমাদের কবি হতে পারে, সাধারণের কবি হতে পারে, কিন্তু এরা আমার কবি নয়। এদের কাছে আমার শুনবার কিছুই নেই।' অথচ 'সাধারণ' এবং তথাকথিত 'অসাধারণ' কবিতার মধ্যে যে স্বতঃসিদ্ধ যোগাযোগ থাকতে পারে এবং থাকা অধিকাংশতই জরুরি হয়ে পড়ে, অ্যাকাডেমিক সাহিত্য বিচারকদের পক্ষে সে কথা কবুল করা সে সময় ছিল অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যে যিনি এই পুঁথিগত সাহিত্যচর্যার প্রতাপ ভেঙে দিলেন, সেই বুদ্ধদেব বসুই প্রথম মেরুমৌল এই মনস্কতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন: 'নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথাটা এইটেই যে তিনি একই সঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি।' এই পর্যন্ত বলে বুদ্ধদেব আরেকটি চিন্তনযোগ্য সূত্র যোগ করে দিয়েছেন, 'তাঁর পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই পলকের জন্য এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল।'

আজ থেকে অন্তত পাঁচ দশকেরও আগের এই উচ্চারণে নজরুল বিষয়ে বক্তার যে প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছিল তাকে সদর্থক অর্থে যদি 'দুর্বলতা' বলি তাহলেও মনে রাখতে হবে পক্ষপাতিত্বের, মমতার সেই ঝোঁক কবিতা সমালোচনার একটি শর্ত। সপ্রশংস এই নির্ধারণের পরক্ষণেই বুদ্ধদেব, সত্যের সৌজন্যে, 'চড়া গলার কবি'র কবিতার গোলমেলে দিকগুলির কথাও আমাদের অকপটে জ্ঞাপন করেছেন, দেখিয়েছেন ওই সমস্ত শৈথিল্য ('হৈ-চৈ'/'অতি মুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা'/'আতিশয্য') নিয়েই নজরুলের কবিতা আধুনিককালের। 'কালের পুতুলে'র এই ভাল লাগার ভালবাসার কথাগুলো যদি ঘরোয়া এবং অন্তরঙ্গ পিছুটানে বেজে ওঠার জন্যই কারও কারও কাছে আজ খারিজযোগ্য বিবেচিত হয়, তাঁদের আমি একই লেখকের 'An Acre of Green Grass—A Review of Modern Bengali Literature' (প্রথম সংস্করণ ১৯৪৮) বইটি পুনর্বার পড়তে অনুরোধ করব। এই গ্রন্থে ব্যক্ত কোনও কোনও ধ্যানধারণা সম্বন্ধে আমরা এতদিন পর দ্বিমত পোষণ করতেই পারি, কিন্তু এখানে যে কবি নিজেকে যথাসম্ভব নির্জিত করে নিয়ে সমালোচক হয়ে উঠেছেন সেই তথ্য অস্বীকার করতে পারব না। এ বইতেও 'কালের পুতুলে'র অধিকাংশ নজরুল সংক্রান্ত অভিভাবনা পুনরুক্ত হয়েছে। কিন্তু এর সম্পূর্ণ চতুর্থ অধ্যায় নজরুলকেই উৎসর্গিত (বইয়ের অন্যান্য অংশেও আলোচ্য কবি অনিবার্যভাবেই এসে গিয়েছেন) এবং সেই অধ্যায়ের পাঠক একথা যথার্থই অনুধাবন করবেন, আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় বুদ্ধদেব নজরুল ইসলামকে 'এলিট' ও 'অদীক্ষিত' পড়ুয়ার অন্তঃস্থ সেতুর সম্মানে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

আমাদের আসল সমস্যাটা বোধহয় এখানেই যে কবির আগেও বাংলা কবিতায় যে কাব্য ও প্রস্বর বলয়িত হয়ে গিয়েছে সে বিষয়ে আমরা পরিশীলিত বিস্মৃতির উপাসক বনে গিয়েছি। মনে আছে একটি কবিপত্রে স্মৃতিচর্যা করতে গিয়ে বিনয় মজুমদার যখন আবিষ্ট হয়ে 'চোরাবালি', 'ছাড়পত্র', 'কাব্য সঞ্চয়ন' এবং 'অগ্নিবীণা'র কথা এক নিশ্বাসে বলেন, তাঁর ভক্ত একজন কবিপাঠক আমাকে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গিতে বলে ওঠেন—'ওসব বাজে বই উনি কেন পড়তে গেলেন।' সত্যেন্দ্রনাথ-সুকান্ত-নজরুলকে ভুলে যাওয়া বা ভুলতে চাওয়ার সপ্রতিভ চাহিদা না হয় কিছুক্ষণের জন্য কবুল করে নেওয়া গেল, বিষ্ণু দে কী দোষ করলেন? অথবা প্রশ্নটাকে আরও বিশদ করে পেশ করা যায়, জীবনানন্দকে পূজার ছলে কি সুধীন্দ্রনাথ এবং অমিয় চক্রবর্তীকে ভুলে থাকতে হবে?

আরেকটি শোচনার বিষয়, এপার-বাংলায় নজরুলের কিছু গান পার্বণধার্য হলেও নান্দনিক ঔৎসুক্য থেকে অনেক দূরে নির্বাসিত। আমাদের প্রতিবেশী একাধিক অঞ্চলেই কবিরা আবার গান লিখতে শুরু করেছেন। আমি এমন কয়েকজন সন্ধানীকে জানি যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের ঊষর চর্চায় ক্ষুণ্ণ হয়ে শহরিয়ার (জ. ১৯৩৬), আদিল মনসুরি (জ. ১৯৩৬) কি নিদা ফজলি (জ. ১৯৪০) রচিত গজল নিয়মিতই শুনে থাকেন। এই আত্মবিস্তার অপ্রাদেশিক বলেও আনন্দজনক। এঁদের কাছে তবু নজরুলের লেখা ও সুর দেওয়া গজল এজন্যই হয়ত তেমন কদর পায়নি যেহেতু এঁরা মনে করেন, এগুলি নাইভ কবি ও সুরকারের প্রণীত। অথচ মার্গসংগীত এবং হাফিজ-রুমির গীতিবিশ্বকে নজরুলের মতো আর কেউ এমন মিলিয়ে দিতে পেরেছেন কিনা আমার জানা নেই। এক লহমা ওস্তাদের কাছে 'ফাগুয়া বিজ (ব্রজ) দেখন কো চালোরি' শীর্ষক বাহার-রাগাশ্রিত গান শুনেই যিনি 'হাস্নুহেনা—আজ নিরালায়' লিখতে বসে মিশ্র মর্জিতে আস্থায়ী থেকে অন্তরায় যাবার মুখে শ্রাবণরোদন জাগিয়ে যান এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শ্রোতাকে সংস্কারমুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষায় একই সুরের দমে 'করুণ কেন অরুণ আঁখি / দাও গো সাকি দাও শরাব' গজল বানিয়ে বসেন তাঁর ক্ষমতায় আচ্ছন্ন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। জানি, দ্বিতীয় সংবেদনে বুঝে নেওয়া যায়, ওই ক্ষমতাই মাঝে মাঝে তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়। ওই অমিতব্যয়ী সৃজনধর্মের ঔদার্যকে দু'দণ্ড সহ্য করতে শিখলে আমরা কিন্তু দেখতে পাই, আমাদের নাগরিকতার মধ্যে আর্যেতর গ্রামগঞ্জেরা ঢুকে পড়ছে, আর সেসব আর্কেটাইপ অনভ্যস্ত অসংখ্য চিত্রকল্প নিয়ে চতুর্দিকে পরিকীর্ণ। জীবনানন্দের বেশ কিছু 'গ্রামীণ' কবিতায় তাদের প্রতিকল্প আমরা ভালবেসেছি। গানের ঈষৎ খোলামেলা প্রকরণে নজরুলের তৈরি সে সমস্ত শব্দছবির আবদার আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হবে না কেন? অনেক দিন আগেই বুদ্ধদেব এই মর্মে নির্বাচিত সংকলনের আবেদন জানিয়ে নজরুলের 'শক্তি' কিংবা 'কবিত্বশক্তি'র এই চ্যালেঞ্জের হিসাব আমাদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন, 'কালের কণ্ঠে গানের মূর্ছনা তিনি পরিয়েছেন, সে-মালা-ছোটো কিন্তু অক্ষয়।' মুশকিল শুধু, নজরুলের ভাষায় কবিতার 'বাজার ডামাডোল', চয়ন কিংবা নির্বাচনের অভিরুচি বা সময় কোনওটাই আমাদের নেই এখন। □

দিনপঞ্জি

কৃষ্ণ ধর

সব দিন নয়, এক একটি দিন এসে কড়া নাড়ে
খুব আচমকা তখন আবহাওয়া বদলে যায়
এক একটা দিনের জন্য বাকি দিনগুলি আলো হয়ে ওঠে
এভাবেই দিনপঞ্জিতে বিন্দু বিন্দু জমতে থাকে
তারপর সেগুলো মস্ত এক নদী হয়ে যায়
এক একটি দিন সেই জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে।
বাকি দিনগুলি ঘাড় গুঁজে হুকুম তামিল করে।

এক একটি দিন যেন তুরুক সওয়ার হয়ে আসে
উঠোনে তার তেজি ঘোড়াটা পা দাপায়
এক একটি দিন কখন যে নদী থেকে সমুদ্রে পৌঁছায়;

সারা বছরে ঝুল জমে থাকা দিনগুলিকে
এক ঝটকায় সাফসুতরো করে দিয়ে যায়
এক একটি দিন
তার গায়ে থাকে ঝড়ের পোশাক আর
শরীর ভর্তি বাজবিজুলির হরেকরকম উল্কি
অথচ এমন ভালমানুষের মতো মুখ করে দাঁড়ায়
যেন আলাদিনের জিন হুকুমের অপেক্ষায়।

তালিতাল্লি মারা দিন গুজরানের পর
এমন এক একটি দিনের হাত ধরে
বেরিয়ে পড়া যায় দিগন্তের দিকে ধুধু চড়া পেরিয়ে
যদি একটু ছায়া কোথাও মেলে।

হাতিপুজো

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সৃষ্টিশীলতা থেকে বহুদূরে বসে থাকে অনবদ্য হাতি
মাথা নাড়ে মাঝে মাঝে আন্দোলিত হয়
'কুঞ্জর সাজানো' বলে তাকে — টিপ পরায় কপালে ও শুঁড়ে
লাল রঙ আলপনা এঁকে দেয়, কলাটা মুলোটা দেয়
গোছা গোছা কলাগাছ তুলে এনে সামনে রাখে
প্রভু যদি ভক্ষণ করেন।
ঢাক ঢোল কাড়া ও নাকাড়া ঘন্টা বাজে
সমবেত হুল্লোড়ের মাঝে শুধু গতর দোলায় মাথা নাড়ে
সৃষ্টিশীলতা থেকে বহুদূরে বসে থাকে অনবদ্য হাতি।

ঘন্টা ঢোল কাড়া ও নাকাড়া কাকে অনামনা করে!
হাতের লণ্ঠন নিয়ে সে তখন অন্ধকারে ভূমিখণ্ড খোঁজে
যেখানে পুঁতবে বীজ, গাছ হবে, এই তো সময় —
জনকোলাহল নেই হুল্লোড়ের শব্দ দূরে বহুদূরে ক্ষীণ
এই তো স্তব্ধতা ভাল, এ গভীর মনোযোগ, বৃষ্টিফোঁটা খোঁজা
হাতে মৃদু আলো নিয়ে পুঁতে রাখা ভূমিখণ্ডে বীজ —
মহীরুহ সে তো দেখবে না।

সৃষ্টিশীলতা থেকে বহুদূরে বসে থাকে অনবদ্য হাতি
কাড়া ও নাকাড়া বাজে গতর দোলায় মাথা নাড়ে
'কুঞ্জর সাজানো' বলে তাকে।

এখন আমরা

তুলসী মুখোপাধ্যায়

আমাদের প্রিয়সব খাদ্যতালিকা থালা থেকে উড়ে গেছে কবে
আমাদের প্রিয়সব আসবাবসামগ্রী অন্য গ্রহে বেড়াতে গিয়েছে
আমাদের প্রিয়সব সঙ্গীতগুলি মন থেকে মুছে গেছে কবে
আমাদের প্রিয়সব আলবামগুলি একে একে ইঁদুরে খেয়েছে।

প্রিয়সব বৃক্ষগুলি বদরাগী রোদে আর ছায়া দিয়ে জড়িয়ে ধরে না
প্রিয়সব সঙ্গীসাথী পুরাতনী মায়া ছেড়ে হৃষ্টপুষ্ট ঠিকানা নিয়েছে
প্রিয়সব বিগ্রহগুলি মৌলিক চেহারা পাল্টে ঝকমকে মুখোস পরেছে
প্রিয়সব প্রতিবাদগুলি প্রিয়সব স্বপ্নগুলি সমূহ ভস্মের মতো ছারেখারে গেছে।

অমিত পরাক্রম ভয়াবহ যত অপ্রিয়
তারা আজ বরণীয়—তারাই ভজনীয়...
দমন শাসন ত্রাসে আমাদের শুধুমাত্র বাঁচিয়ে রেখেছে।

জন্মান্ধ

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীভেদ্য অন্ধকার কাকে বলে
আলপিন ছুঁয়ে জেনে নেয়
জন্মান্ধ বালিকা।
শব্দের ওড়াউড়ি থেমে গেলে
আকার বশ্যতা মেনে
ডানা মেলে দেওয়া

তুমি শুধু ফিরবার কথা বলো
আপাতমুখী
জন্মসঙ্গমের কথা বলো
প্রথাসঙ্গীতে
বলো, রহস্য বিলোপ থেকে
ডানানির্ভর প্রজন্মসংকট।

তুমি বলো প্রেমে আছ
অনন্য কথার ভাঁজে
ত্বকে রোমে শিহর সম্পন্ন
নিঝুম দুপুরে,
আমার নিরালা নিয়ে
তুমি খেলে যাচ্ছ সংখ্যাজট।

প্রপাত খুলে বাঁধ অছিলায় থাকে
সশব্দ চুম্বন রাখে
জন্মান্ধ চোখের পাতায়,
আমি নিঃসাড়ে দেখে যাব
অভিমান বুকে—
তুমি কুয়াশায় জড়িয়েছ চুল
ঘনত্বক বিদ্যুৎ স্পর্শবাহী হয়ে
আকাশে নীল বিদ্যুৎ।

নির্মাণবাদীরা এসো

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্মাণের সহস্রধারা, জানে শুধু নির্মাণবাদীরা
আর জানে সৃষ্টিশীল লেখক-বন্ধুরা
সে সব নির্মিত হয় কবিতায়
অথবা গল্প-উপন্যাসে....
চরিত্ররা হাসে খেলে এবং দৌড়োয়
মোটেই স্থবির নয় সেই শব্দাবলী
একবার গড়ে উঠলে কখনও ভাঙে না
এমনই নির্মাণশৈলী, এমনই গড়ন...

অতএব, নির্মাণবাদীরা এসো
গড়ে তোলো ভাঙা দেশ, ভাঙা স্বপ্ন
যা সত্যিই ভেঙে খান খান...
সেখানে প্রতিষ্ঠা করো শান্তির বাগান।

ঢেউ

সুদেব বক্সী

১.
ঢেউ ঢেউ — পালকের ঢেউ
দু'চোখে সরায় যত আঁশ
ঝলসানির গন্ধ এসে লাগে —
যত সব শীতল আগুন!

কত দূর শান্ত এক মাথা —
হৃদ্‌পিণ্ড নড়ে সসাগর,
সংকেত ভরিয়ে দ্যায় ধূ ধূ...
জাহাজকে তুচ্ছ মনে করে!

২.
উঠছি, উঠছি — এত ঢেউ — ছেড়ে আসা
সহজ নাকি? মাঝিমাল্লাদের গান
কাদামাটির মতো গায়ে-মাখা,
এত ঢেউ, তবু ধুয়ে যাচ্ছে না!
ঢেউয়ে চিকচিক করছে সোনা
ঢেউয়ে কিচকিচ করছে বালি
ঢেউয়ে মাছের ঝাঁকের মতো আঁশজাল —

যৌগিক-মৌলিক ঢেউ, উঠছি, উঠছি!
কোনওদিনই উঠতে পারব না?

হে দেহপোজীবিনী

আবীর সিংহ

ক্লান্ত হৃদি। ক্লান্ত শ্রমও। তবু রোজগার হয়।
মাথার ওপরে ঘুরে গেছে ক্লান্ত সিলিং ফ্যান আর
প্রাচীন অন্ধ হাওয়া। কতদিন হল মা-র
মুখ মুছে গেছে — শুধুই এক ক্লান্ত পরাজয়
প্রতিদিন জয়ী হয়েছে এই দমবন্ধ ভ্যাপ্‌সা ঘরে —

তোমার জন্য প্রকৃত ঘর একটিও নেই আজ এই বিরাট শহরে!

ভাঙি না কখনও

ধ্রুব চক্রবর্তী

কালকের আমি আজকে হয়ত কিছুটা ভিন্ন
নিজেকে পেরিয়ে চলার চিহ্ন
শরীরে ধারণ করেছি
প্রথাগত সব চেতনাই ভেঙে
নিজস্বতায় গড়েছি

বিমূর্ত ছিল পথ অনেক ধারালো কাঁটার
আঘাতই প্রেরণা দিয়েছে রক্ত ঝরিয়ে হাঁটার

সহজে তো কিছু হয় না জীবনে
সব অর্জন ক্রমাগত এক যুদ্ধের পরিণতি, এভাবেই জানি
কিছু ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিয়ে দৃঢ় স্বভাবে
মাথা উঁচু রেখে বাঁচি, ভাঙি না কখনও
হাজার দৈন্য অভাবে।

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

শান্তিনিকেতনের দিনগুলি

গৌরী আইয়ুব

[গত সংখ্যার পর]

১৯৫০-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশন হচ্ছিল। তাতেই যোগ দেবার অছিলায় কলকাতায় এসেছিলাম।

অধ্যাপক ক'দিন আগেই এসেছিলেন। আমি যে আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলাম, সেখান থেকে সিনেট হাউসে সভাস্থলে যাওয়া-আসার পথটি চেনা হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপকের বাড়িতে আসার পথটি তখনও অজানা ছিল। একদিন তিনি বন্ধু মানসী দাশগুপ্তকে অনুরোধ করেছিলেন যেন সিনেট হাউস থেকে আমাকে তাঁর পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের বাড়িতে তিনি পৌঁছে দেন।

দুপুরবেলা মানসী আমাকে সেই বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেদিন সযত্নে রক্ষিত (well maintained) সেই বাড়িটি বড় সুন্দর লেগেছিল। লাল সিঁড়ি প্রথম ভাগটিতে পা দিতেই একটা সুগন্ধ পেয়েছিলাম। এবং দোতলায় ওঁর ঘরে এসে পৌঁছে টের পাওয়া গেল যে সুগন্ধটি এই ঘর থেকেই একতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

মানসী দরজা পর্যন্ত এসে বলে গিয়েছিলেন, 'এই যে, আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি তো?'

সেদিন তিনি আর বসেননি।

আমার মনটা খচ খচ করছিল। কিন্তু তাকে থাকতে বলার সাহস ছিল না। কারণ বুঝতে পারছিলাম, তিনি সেদিন কোনও তৃতীয় ব্যক্তি চান না।

একটু পরে উনি এসে সোফায় আমার পাশে বসলেন। হঠাৎ সম্পর্কটা এত ঘনিষ্ঠ হল যে ভিতরটা কাঁপতে লাগল। এর আগে কত দিনই তো কত গল্প কত হাস্য পরিহাস হয়েছে, কিন্তু এতটা কাছে বসিনি, যাতে গায়ের গন্ধটুকুও পাওয়া যায়। আজ সেকথা বিশ্বাস করে তোলা কঠিন হবে বলে মনে হয়, কারণ জীবনে, সাহিত্যে এবং অন্য মিডিয়াতেও এত দ্রুত দুটি মানব-মানবী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে যে আমাদের অতি বিলম্বিত লয়ে ঘনিষ্ঠতার কথা যদি বলি তাহলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। বিশেষ করে তিনি ছিলেন একজন যথেষ্ট পরিণত বয়স্ক মানুষ। হয়ত বা সেই কারণেই একটি অপরিণত এবং স্পষ্টত অনভিজ্ঞ মেয়েকে তিনি ঘাবড়ে দিতে সাহস পাননি।

কয়েক ঘণ্টা কিছু গভীর অন্তরঙ্গ কথা এবং কিছু স্পর্শের ভিতর দিয়ে কোন স্বর্গরাজ্যে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তা আজও ভাবতে বসলে মনের মধ্যে শিহরণ জাগে। কিন্তু হঠাৎ দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উনি উঠে পড়লেন এবং সাড়ে চারটের মধ্যে উনি আমার স্থানীয় অভিভাবকদের গৃহে আমাকে পৌঁছে দেবেন বলে তৈরি হয়ে নিলেন। সেই বাড়িতে আমি ট্যাক্সি থেকে নামার আগে উনি নেমে দরজাটি ধরে দাঁড়ালেন। সেই এক মুহূর্তেই আমার জাঠতুতো দিদি তাঁকে দেখতে পেয়ে অবাক হলেন।

আমি নামলে তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। ওই ট্যাক্সি নিয়েই ফিরে গেলেন। আমি বাড়ির গেট খুলে কয়েক ধাপ পার হয়ে ঘরে ঢুকছি, দিদি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে এসে বললেন, 'কে রে ওই সুন্দর মানুষটি?'

আমি একটু বিচলিত ভাবে বলেছিলাম, 'আমার অধ্যাপক'। আমার মুখের বিচলিত ভাবটা দিদির চোখ এড়ায়নি।

পরদিন আমাদের শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার কথা, সেটা পৌষমেলার আগের দিন। অভিভাবকরা এক আত্মীয় যুবকের সঙ্গে আমাকে বোলপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা যখন হাওড়া স্টেশনে দুটি থার্ড ক্লাসের টিকিট হাতে নিয়ে পৌষমেলার যাত্রীর ভিড় ঠেলে একটা কম্পার্টমেন্টের দিকে এগুচ্ছি হঠাৎ দ্রুত পায়ে পিছন থেকে এসে আমার অধ্যাপক আমাকে বললেন, 'তোমার টিকিট আমার সঙ্গে কাটা হয়েছে। এদিকে এসো।'

সেই যুবকটি হতচকিত হয়ে আমার পিছন পিছন এল দেখবার জন্য যে কে কোথায় ছোঁ মেরে নিয়ে আমাকে তুলল।

আমি একটু বিব্রতভাবে অধ্যাপকের পিছন পিছন একটা সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে আমার চলনদারকে বললাম, 'কিছু মনে কোর না। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখা হবে। তুমি তো ফাল্গুনীদির বাড়িতেই রইলে'।

সে বেশ অপ্রসন্ন মুখে হাত নেড়ে বিদায় নিল। পরে যতবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার এই আচরণের জন্য খোটা দিতে ছাড়েনি।

এদিকে সেকেন্ড ক্লাসেও সেদিন বেশ ঠাসাঠাসি ভিড় ছিল। বিশ্বভারতী কর্মসমিতির কয়েকজন কেষ্টবিষ্টুও ওই কম্পার্টমেন্টে আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। ঘনিষ্ঠভাবে বসতে বাধ্য হওয়ায় কয়েক ঘণ্টা যাবত আমরা পরস্পরের হাত ধরে রাখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটাও তাঁর কালো শালের অন্তরালে।

উল্টোদিকে থেকে একজন প্রবীণ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ভ্রূ কুঞ্চিত করে সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। অধ্যাপক একটু বিচলিত বোধ করছিলেন এই ভেবে যে পরদিনই আম্রকুঞ্জর সভায় ওই ব্যক্তিটি তাঁর পরিচয় আবিষ্কার করে ফেলবেন।

তবু সেদিন আমরা যেন একটু 'দুঃসাহসী' হয়ে উঠেছিলাম।

* * *

পৌষমেলার উৎসবে, বিশেষ করে ৭ই পৌষ মন্দিরের উপাসনায় আর আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমরা পরস্পরকে দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু কথাবার্তা কিছুই হয়নি।

এরপর প্রত্যেকটি ভবন থেকে এক্সকার্সনের দল নানা জায়গায় চলে গেল। শিক্ষাভবনের ছাত্রছাত্রীদের দলে আমি ছিলাম না। শিক্ষাভবন অথবা বিনয়ভবনের অধ্যাপকদের মধ্যে আবু সয়ীদ আইয়ুবও ছিলেন না।

পৌষমেলার পরেই শান্তিনিকেতন যখন খানিকটা ফাঁকা, তখন বাবা এলেন আমার খোঁজখবর নিতে। আমার জনৈক শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপককে নাকি তিনি চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, আমি কেমন আছি, কেমন পড়াশুনো করছি। তার উত্তরে তিনি নাকি জানিয়েছিলেন যে আমি পড়াশুনোয় অবহেলা না করলেও কোনও একজন অধ্যাপকের সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা করছি এবং তা নিয়ে লোকেরা বলাবলি করছে।

বলাবাহুল্য পিতা খানিকটা উদ্বেগ নিয়েই শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলেন এবং প্রথমেই প্রবোধচন্দ্র সেন মশাইয়ের কাছে এ-বিষয়ে খোঁজ খবর নিলেন। তিনি তো আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। আর অধ্যাপক আইয়ুবের সঙ্গেও তাঁর ভাল পরিচয় হয়েছিল। তিনি বাবাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, এ-নিয়ে দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। এই অধ্যাপকের সঙ্গে মেলামেশা করলেও কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

এরপর একদিন দেখতে পেলাম যে পিতা আমার অধ্যাপকের সঙ্গে বসে কথা বলছেন লাইব্রেরির সামনে। Philosophy East and West সম্পাদনার সময় তাঁদের মধ্যে আগেই চিঠিপত্রে আলাপ হয়েছিল। তখন তাঁরা কী নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন ভেবে বুক দুরু দুরু করছিল। কিন্তু পরে অধ্যাপক নিশ্চিন্ত করে বলেছিলেন যে কোনও অপ্রিয় আলোচনা হয়নি। এবং আমার প্রসঙ্গ ওঠেইনি।

ক'দিনের মধ্যেই প্রবোধ সেন মশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি স্থির করলেন যে তাঁকে যেহেতু বছর খানিকের জন্য আমেরিকা যেতে হচ্ছে 'ভিজিটিং প্রফেসরশিপ' নিয়ে, তাই পাটনার বাড়ি বন্ধ করে দিয়ে গৃহিণী ও ছোট চারটি মেয়েকে শান্তিনিকেতনেই নিয়ে আসবেন।

অতএব আমাকে পরামর্শ দিলেন তাড়াতাড়ি একটা বাড়ি খুঁজে বার করতে, ক্যাম্পাসের মধ্যে হলেই সবচেয়ে ভাল হয়। মেয়েদের সুরক্ষা সম্বন্ধে তাঁর তাহলে আর কোনও ভাবনা থাকে না।

আমার অধ্যাপক সম্বন্ধে আমাকে তিনি কোনোও কিছু না বলেই দিন কয়েকের মধ্যেই পাটনা ফিরে গেলেন।

এর মধ্যে দিন সাতেক পরে এক্সকার্সন থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের আনন্দের ঝুলি ভরে নিয়ে ফিরে এল। প্রায় শূন্য আশ্রমে আমারও যে খুব নিরানন্দ কেটেছিল এমন নয়। বার কয়েক তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, গল্পও হয়েছিল।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, আবার আমরা যেন কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। সাম্প্রতিক যে ঘনিষ্ঠতাটুকু ঘটেছিল, সেটাকে এরপর বহুদিন ধরে কল্পনায় ও ভাবনায় লালন করে চললাম, যেন বহু মূল্যবান এবং সযত্নে লুকিয়ে রাখার মতো কোনও সম্পদ।

বন্ধুদের কয়েক জনের সাহায্যে এবার বাড়ি খোঁজা শুরু হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে অত্যন্ত সুন্দর একটি বাড়ি ক'দিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। ধীরানন্দ রায়ের সৌজন্যে। শালবীথির পূর্বপ্রান্তে ছিল ছাদিক ভবন। আর পশ্চিমপ্রান্তে ছিল শ্রীপল্লীর ওই বাড়িটি। সঙ্গীতভবনের একেবারে পাশেই। শালবীথি গড়িয়ে গড়িয়ে আমাদের সামনের বারান্দার সিঁড়িতে এসে থামত। সেই খোলা বারান্দায় বসে শান্তিনিকেতনের অন্তরটি যেন দেখতে পাওয়া যেত।

জানুয়ারি মাসেই বাবুসো-পাঁটরা ও চারটি কন্যা নিয়ে মা এসে পৌঁছলেন। ততদিনে আমি তো শান্তিনিকেতনের পাকাপোক্ত অধিবাসী হয়ে গেছি। তাই পাঠভবনে বোনেদের ভর্তি করানো

এবং শান্তিনিকেতনে সংসার পেতে বসতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। তা ছাড়া আমাদের আসবাবপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ ছিল যৎসামান্য।

আমি তো শ্রীভবন ছেড়ে বাড়ি চলে এলাম। তাই পুরনো বন্ধুত্বও রইল এবং নতুন পরিচিতের বৃত্ত প্রসারিত হল। শ্রীভবনের মেয়েরা সব সময় আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতে লাগল। বিশেষ করে গ্রীষ্মের জলাভাবের সময় আমাদের কুয়োর জলে স্নানার্থীও অনেকেই চলে আসত।

মাকে বাবা সে সময় কিছু বলেছিলেন কি না জানি না। মাও আমার প্রিয় অধ্যাপক সম্বন্ধে অন্য কোনও সূত্রে কিছু তখনই জেনেছিলেন বলে মনে হয় না। বরং বাড়িতে আসার ফলে আমার স্বাধীনতা আরও বেড়ে গেল। রাত্রে খাওয়ার পরে এটাদির সঙ্গে বা মাদমোয়াজেল বুর্দার সঙ্গে বেড়াতে গেলে মা কোনও দিন আপত্তি করেননি। কত রাত্রে লাল বাঁধের ধারে কাঁকরের উপরে শুয়ে শুয়ে জ্যোৎস্নারাতে মাদমোয়াজেলের সঙ্গে গল্প করেছি।

মাদমোয়াজেল বুর্দার সঙ্গে আমার অধ্যাপকের যদিও আলাপ পরিচয় তেমন জমেনি, আমার সঙ্গে কিন্তু তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে আমরা কয়েকজন ফরাসি ভাষার পাঠ নিতে যেতাম। রেবাদি এবং মধুশ্রী রায় আমার সহপাঠিনী ছিল। মধুশ্রী তখন স্কুলের মেয়ে। তাঁর ব্যবহার এবং তাঁর গান মাদমোয়াজেল খুব পছন্দ করতেন। তাঁর নামের অর্থ জেনে নিয়ে তাঁর ফরাসি নামকরণ করেছিলেন Beaute de printeau (বসন্তের সৌন্দর্য)। এই পাঠ নিতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। তাঁর ভাঙা ভাঙা ইংরেজি আমাদের কিছু দুর্বোধ্য লাগত না। আমি নিজেও কিছু আহামরি ইংরেজি বলতাম না। হিন্দিভবনে ক্লাস নেবার পরে তাঁকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা টাটা বিল্ডিং-এর কাছাকাছি স্কলারস ব্লকে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। কিন্তু এর পরেও অনেক দিনই রাত্রে খাওয়ার পরে একটা টর্চ হাতে আমাদের বাড়ি এসে পৌঁছতেন। এ বাড়িতে যেহেতু কোনও পুরুষ অভিভাবক ছিলেন না, তাই বোধহয় ওই অসময়ে আসার ব্যাপারে অনেকটা সহজ বোধ করতেন।

ততক্ষণে আশ্রমের ইলেকট্রিক লাইটও প্রায় নিভিয়ে দেওয়া হয়। তখন আমাদের প্রিয় গন্তব্য ছিল লালবাঁধের ধারে খোয়াই — রেবাদিদের বাড়ির পেছন দিকে। সেই খোয়াইয়ে শুয়ে শুয়ে আমরা কত যে গল্প করতাম, ভাবলে অবাক লাগে। অথচ দু-পক্ষেরই ভাষার অপ্রতুলতা ছিল, কিংবা আমার ভাষাও উনি কতটুকু বুঝতেন জানি না। তবে তাঁর একটি উচ্ছ্বসিত উক্তি মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। জ্যোৎস্নালোকিত রাতে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠছেন: Ci bleau ci clare!' (So blue So clear)।

কিছুকালের মধ্যেই তিনি দেশে ফিরে যান। মনে হয় তাঁর গবেষণার কাজ বিশেষ অগ্রসর হচ্ছিল না। সেখান থেকে দেশে ফিরে গিয়েও বার কয়েক চিঠি লিখেছিলেন — অবশ্যই অতি সুন্দর ফরাসিতে। আমি ভাঙাচোরা ইংরেজির সঙ্গে দু-চারটে ফরাসি মিশিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু এই বন্ধুত্বকে রক্ষা করা যায়নি। কিন্তু অনেকগুলি রজনী গভীর হওয়া পর্যন্ত আমরা খোয়াই-এ শুয়ে কী দারুণ উপভোগ করেছিলাম। আমার কী ভাগ্য ওই সময়ে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে আমার মা কোনও বাধা দেননি।

সে সময় অনেকদিন সন্ধ্যাটাও গড়িয়ে রাত হত যখন ছান্দসিক-কন্যা রেবাদি আর আমি গল্প করতে করতে পরস্পরকে বাড়ি পৌঁছতে থাকতাম। একবার সে আমাকে পৌঁছতে এসে আমাদের বারান্দায় দু-চারটে কথা বলার পর আবার আমি যেতাম তাকে পৌঁছতে। এই চলত আর কী!

অধ্যাপকের কাছে সন্ধ্যার পরে যাওয়ার সাহস আমার যদি বা ছিল, তাঁর দিক দিয়ে প্রশ্রয় দেবার সাহস একেবারেই ছিল না। মাত্র একদিন তিনি বাড়ি নেই দেখে তাঁর একটা জানালার ভিতর দিকে কিছু ফুল রেখে চলে এসেছিলাম। তাতে আমার নির্বুদ্ধিতাকে অত্যন্ত নিন্দা করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমি কখন এসেছি, কখন ফিরে যাচ্ছি, তিনি বাড়িতে ছিলেন কি ছিলেন না, সেটা হয়ত কেউ লক্ষ করেনি। কিন্তু কেউ কেউ দেখেছে, আমি তাঁর বাড়ির দিকে যাচ্ছি। অন্য কেউ হয়ত দেখেছে, আমি তাঁর বাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছি। আমি কতক্ষণ তাঁর কাছে ছিলাম, সে বিষয়েও যাঁর যা ইচ্ছে অনুমান করে নেবেন। এই রকম নির্বোধের মতো অপবাদ কুড়নোর কোনও প্রয়োজন আছে কি?

আমাদের নিজেদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এবং আমেরিকার জন্য যাত্রা করার আগে বাবা ক'দিনের জন্য আবার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। ক'দিনেই আমাদের জীবনযাত্রার ধরনধারন দেখে তিনি তো অবাক। এমনকী তাঁর গৃহবন্দিনী গৃহিণীও যেন নতুন করে কী এক মুক্তির আশ্বাস পেয়েছেন। খানিকটা অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'এখানে কী একটা ঘূর্ণি হাওয়া আছে, এদের সবাইকেই সেই ঘূর্ণি হাওয়ায় পেয়েছে। কেবল দেখি বাড়ি আসে আর যায়।'

কথাটা নেহাত ভুল ছিল না। আমরা পাঁচ বোনেই একেবারে সকাল বেলায় ক্লাস করতে চলে যেতাম। তারপর দুপুরে বাড়ি ফিরে হুড়মুড় করে সংসারের কাজ কিছু সেরে এবং খেয়ে দেয়ে আবার শালবীথির পথে উধাও হতাম। ক্লাস সেরে ফিরতে বিকেল চারটে হয়ে যেত। তারপর প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই থাকত কোনও না কোনও ভবনের এবং পাঠভবনের হয় আদ্য, নয় মধ্য, নয় অন্ত বিভাগের সভা বা নাচ-গান-অভিনয়। মা রাতের

রান্না বিকেলেই সেরে ফেলে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতেন। সেগুলি বেশির ভাগই তখন লাইব্রেরির বারান্দায় হত।

বাবা কয়েক দিনেই যা দেখে গেলেন, তাতে ওঁর মনে হল, এদের শান্তিনিকেতনে আসা ব্যর্থ হয়নি।

• • •

জানুয়ারির মাঝামাঝি আবার যথারীতি পড়াশুনা শুরু হয়ে গেল। মার্চের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন ইংরেজি ক্লাস হয়ে গেলে হীরেনদা আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'গৌরী, আইয়ুব সাহেব তোমাকে একবার ডেকেছেন। তাঁর শরীরটা ভাল নেই।'

আমি বিচলিতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী হয়েছে ওঁর?'

উনি একই ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিলেন, 'ওই যা তাঁর হয় আর কী, খুব ভাবনা করার মতো কিছু নয়।'

উনি চলে গেলে আমি আর পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করলাম না। তখন হয়ত বেলা সাড়ে এগারোটা। আমি কাউকে কিছু না বলেই ওঁর বাড়িতে চলে গেলাম। আমি ঠিক মনে করতে পারছিলাম যে ওঁর কী হয় যার জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। তাই আমার খুবই দুর্ভাবনা হচ্ছিল।

আইয়ুব দরজা খুলে দিলে চোখে পড়ল যে তাঁর বেশ-বাস ও চুল খানিকটা অবিন্যস্ত। উনি ওঁর শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমিও পিছন পিছন গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

উনি খাটের পাশে দাঁড়িয়ে একটা হাতে মশারি বাঁধবার দণ্ডটি ধরে বললেন, 'কাল রাত থেকে আমার হেমপটিসিস হচ্ছে।'

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কী?

উনি বিছানায় বসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বললেন। আমি দুই হাতে আমার বই-খাতা-আসন জাপটে ধরে শুনতে লাগলাম। মাথা ঝিম ঝিম করছিল। মুখ হয়ত ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

উনি তখন বললেন, 'তুমি অত ঘাবড়ে যেও না। টিউবারকিউলোসিসের আর কোনও সিম্‌টম এখনও নেই। তবে কয়েক দিন বিশ্রাম করে কলকাতা গিয়ে একটা থরো চেক আপ করা দরকার। তোমাকে আসল কারণটাই বললাম, যেন তোমার মনটা প্রস্তুত থাকে। আর সবাইকে সব কথা বলবার দরকার নেই। শুধু ভেবে দেখ, তোমার কোনও বন্ধু আমাকে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যেতে পারবে কি না।

আমি তাঁর বাড়ি থেকে এসে কিছুক্ষণ ছাতিমতলায় চুপচাপ বসে রইলাম। আবার ঘণ্টা পড়লে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। তবে বাড়ি যাওয়ার পথে কিচেনে একটু খোঁজ করে গেলাম, দামু আছে কি না।

অল্প একটু অপেক্ষা করার পরেই সদাপ্রসন্ন দীর্ঘাঙ্গ পুরুষটিকে দেখতে পেয়ে বললাম, 'দামু, তুমি খাওয়া-দাওয়ার পর একটু আমাদের বাড়ি এসো।'

সেদিন দামোদর রেড্ডিকেই সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু মনে হয়েছিল।

• • •

তখন জলকষ্টের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি হত পয়লা বৈশাখের রবীন্দ্রজন্মোৎসব সেরে নিয়ে। অধ্যাপক ছুটি হবার কিছু আগেই দামোদর রেড্ডিকে সঙ্গে করে কলকাতা চলে গেলেন। আমি ভেবেছিলাম, হয়ত বা ছুটির আগেই আর একবার ফিরে আসবেন। কিন্তু দামু তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসে বলেছিল, তার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ অসুখ সংক্রান্ত সমস্ত অনুসন্ধান এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। মনটা একটু দমে গিয়েছিল। যাই হোক, দামু খুব উৎসাহের সঙ্গে অধ্যাপকের বাড়িতে একদিন কাটাবার গল্প শোনাল।

এরপর গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হতেই আশ্রম একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। এবার শূন্যতাটা আরও যেন বুকে চেপে বসল। কিন্তু ক'দিন পরেই দেখা গেল আশ্রমের এই নিরিবিলি অবসরের অন্য এক গভীর আনন্দ রয়েছে। তখন স্থায়ী আশ্রমিকদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্ভব হত।

আমার তখনও আশা ছিল যে গরমের ছুটি শেষ হতেই উনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবেন। কিন্তু দেখা গেল ডাক্তারদের বিধান হল অন্যরকম। তাঁকে আরও মাস খানিক বিশ্রাম করে ফিরবার অনুমতি তাঁরা দিয়েছিলেন এই শর্তে যে খুব বেশি পরিশ্রম করবেন না। ওঁর অনুপস্থিতির সময় তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে আলো জ্বলত, যখন তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে কলকাতার বন্ধুরা কেউ বেড়াতে যেতেন। একবার তো এক বন্ধু একশো পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বালিয়ে রেখেই ফিরে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে প্রতিবেশীরা বুঝতে পারলেন যে বাড়িতে মানুষ নেই, কিন্তু দিবারাত্রি আলো জ্বলছে। তখন মেইনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এসে মেন সুইচ বন্ধ করে আলো নেভাল।

উনি কলকাতায় চলে যাবার আগেও মাঝে মাঝেই কলকাতা থেকে বন্ধুবান্ধবীরা বেড়াতে যেতেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার, মাধবীর এবং আমাদের আরও কোনও কোনও বন্ধুর আলাপও করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সবান্ধব অরুণ ও মানসী দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা প্রতিমা দাশগুপ্ত (পরে Pratima Bowes)। শান্তিনিকেতনে তাঁদের নিয়ে ঘুরে দেখাবার কাজটা আমরাই মাঝে মাঝে করতাম।

যদিও শান্তিনিকেতনে একটানা বাস করার সুযোগ আইয়ুব খুব বেশিদিন পাননি, তবু ওই অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকজনের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক হয়েছিল।

হীরেনদা এবং প্রবোধদার কথা তো আগেই বলেছি। মাঝে মাঝে নন্দলাল বসুর (মাস্টারমশাই) সঙ্গে বসে চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মাস্টারমশাই সাগ্রহে তাঁর নানা পর্যায়ের ছবি দেখিয়েছিলেন। সে বিষয়ে আইয়ুবের মতামতও জানতে চেয়েছিলেন।

আরও একজনের সঙ্গে তাঁর মাঝেমাঝেই দেখাসাক্ষাৎ হত, তিনি ক্ষিতিমোহন সেন। তাঁর বাড়িতে যত না যেতেন, বিদ্যাভবনে তাঁর যে বিশেষ কক্ষ ছিল সেখানে বসে মধ্যযুগের সাহিত্য, বিশেষ করে মীরার ভজন নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল। মীরার কোনও কোনও ভজন আইয়ুবের সমস্ত জীবনকেই একটি বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছিল। যখন অসুস্থ অবস্থায় তাঁর পড়াশুনা করার ক্ষমতা ছিল না, শুভলক্ষ্মীর রেকর্ড তিনি দিনের পর দিন বাজিয়ে শুনতেন। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ভজন ছিল, 'শুনি ম্যায় হরি আওন কি আওয়াজ....।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী তখন বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। এবং সেই সুবাদে আইয়ুবের সাক্ষাৎ-সম্পর্ক ছিল তাঁরই সঙ্গে। এই শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মানুষটি আইয়ুবকে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যত্নেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। এঁর সঙ্গে অবশ্য 'পরিচয়'-এর যুগ থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল।

মাঝেমাঝেই অনিল চন্দ ও রাণী চন্দের সঙ্গেও সুন্দর কিছু সন্ধ্যা কাটিয়েছেন। রাণীদির সরস গল্প এবং গুরুদেবের স্মৃতিচারণ তাঁদের কোনার্ক বাড়ির বারান্দায় বসে শুনে আসতেন।

বাংলা এবং উড়িষ্যার নানা মন্দিরের প্রাচীরে সোদাই করা মূর্তির প্রকৃতিকি কী করে তাঁরা সংগ্রহ করতেন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে, সেই সব গল্প শুনে এসে আমাদেরও শুনিয়েছিলেন।

গরমের ছুটি কেটে গেল, তবু তিনি ফিরলেন না দেখে মনটা একটু বিমর্ষ হয়েছিল। কিন্তু একমাস পরে তাঁর বৌদি এবং বৌদির সঙ্গে ফুটফুটে একটি নাতনি সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। তখন তাঁদের দেখভাল করার দায়িত্ব পেয়ে আমি তো বর্তে গেলাম। বিশেষ করে ছোট্ট শিশু রীনার। অবশ্য বৌদির দেখভাল করার খুব প্রয়োজন হত না। তিনি অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েই পরিচয় করে নিয়েছিলেন। তিনি অসঙ্কোচে 'আমি আইয়ুবের বৌদি' বলে চমৎকার ভাব করে নিতে পারতেন। একদিন আমাদের বাড়িতেও তাঁকে নিয়ে এলাম।

ছোট্ট রীনার সঙ্গে তখন থেকেই আমার হিন্দুস্থানি (হিন্দি ও উর্দুর মিশ্রণ) ভাষায় কথাবার্তা হত, কারণ বৌদি সেটাতেই উৎসাহ দিচ্ছিলেন এবং আইয়ুবও এই কারণে সমর্থন করছিলেন যে বালিকাটি কলকাতাই উর্দুভাষাতে কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত ছিল এবং আমি হিন্দি জানতাম। তাই মাঝামাঝি রফা করা গিয়েছিল হিন্দুস্থানিতে। ছেচল্লিশ বছর ধরে এই ভাষাতেই আমরা কথা বলে আসছি, যদিও অনেকেই তাতে কৌতুক বোধ করে। রীনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কোন গভীরে পৌঁছে গেছে, তা শুধু আমাদের মনই জানে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক মতন গুছিয়ে বসতে না বসতেই আইয়ুব আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবং আবার দীর্ঘ ছুটির দরখাস্ত করে তাঁকে ফিরে যেতে হল।

কিছুদিন পর্যন্ত খুব দিশেহারা লাগছিল। কিন্তু চিঠির আদান-প্রদান আমাকে কিছুটা নতুন সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করল। আমরা মোটামুটি ধরেই নিলাম যে এভাবে চাকরি করা তাঁর আর চলবে না। কারণ নানা রকম কঠিন চিকিৎসার নির্দেশ আসতে লাগল। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। একবার শোনা গেল Lobectomy করতে হবে। আর একবার ডাক্তারেরা বিধান দিলেন, থোরাকোপ্লাস্টি করতে হবে। তিনি নিজেও যতখানি উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ বোধ করতেন, আমি তো তাঁর চেয়ে কম করতাম না, কিন্তু কী করে তাঁকে কলকাতায় দেখতে আসব?

নিজের চশমা ভেঙে চশমা সারাবার অজুহাত সৃষ্টি করে (বোলপুরে তখনও তার ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না) কলকাতা আসবার সুযোগ পেলাম। মার কাছ থেকে তার অনুমতি পাবার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে খবর দিলাম যে দু-তিন দিনের জন্য কলকাতা যাব, এবং পার্ক স্ট্রিটে আমার মামাবাড়িতে থাকব। উনি পত্রপাঠ জানালেন, কীভাবে সেখান থেকে এইট-বি বাস ধরে যাদবপুর টার্মিনাসে পৌঁছে খানিকটা পায়ে হেঁটে কে.এস. রায় হসপিটালে পৌঁছতে পারব।

সত্যিই গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম। ভিজিটিং আওয়ার শুরু হতে না হতেই তিনি দোতলায় তাঁর ঘরের জানালায় বসেছিলেন গেটের দিকে তাকিয়ে।

জীবনে সেও এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যে দু'তিন দিন থাকা সম্ভব হয়েছিল, প্রত্যেক দিনই ভিজিটিং আওয়ারটুকু তাঁর সঙ্গে কাটাতে পেরেছিলাম। শেষ দিনে চলে আসার সময়ে সত্যিই দিশেহারা বোধ করেছিলাম যে আর কি কখনও আমাদের আবার দেখা হবে? উনি নিজে তো ধরেই নিয়েছিলেন যে ওই রকম আসুরিক চিকিৎসা হলে তিনি আর বাঁচবেন না।

এরপর নানা দিক থেকে তাঁর লাংস-এর এক্স-রে করেও নিশ্চিতভাবে ঠাহর করা গেল না যে ক্ষতটির অবস্থান ঠিক কোথায়। সম্ভবত কোনও পাঁজরার হাড়ের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল, তাই এক্স-রেতে ধরা যাচ্ছিল না। আর নানা রকম জটিল চিকিৎসার কথায় রোগী যে দ্রুত আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এবং প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা লক্ষ করে প্রধান চিকিৎসক ডা. পি. কে. সেন অবশেষে স্থির করলেন যে অপারেশন না করাই ভাল, অন্য যা কিছু

চিকিৎসা তাই চলতে থাকুক বাড়িতে বিশ্রামে রেখে। অতএব তিনি বাড়ি ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

তখনও নিশ্চিত করে ভাবিনি তিনি আর কোনও দিনই শান্তিনিকেতনে ফিরবেন না। ক্রমে সে সত্যটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। নানা অছিলায় দু-এক দিনের জন্য কলকাতায় এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া ছাড়া দেখা সাক্ষাতের আর কোনও পথ রইল না। উনি অবশ্য চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

ওঁর অনুপস্থিতির সময় সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা হল সাহিত্যমেলা। সেটা ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। তত দিনে অন্নদাশঙ্কর রায় চাকরি থেকে আগে ভাগেই অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে বসবাস করছিলেন মন দিয়ে লেখালেখি করার জন্য।

সে সময় শান্তিনিকেতনে অন্নদাশঙ্কর রায় এবং লীলা রায়ের সংসারটি সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্যশ্লোক তো আগেই এসে বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছিল। এবার ছোট তিনটি সন্তানও সেখানকার ছাত্রছাত্রী হল। ওঁদের সংসারটি আর পাঁচটি সংসারের মতো ছিল না। সন্তানদের তাঁরা অপরিমিত স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ করেছিলেন। তাই ওরা কে কখন কোথায় কী করছে, তার খবরও সব সময় তাঁরা পেতেন না। কিন্তু ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে ব্যাকুল মা তাদের সন্ধানে বেরতেন। কতদিন দেখা যেত কনিষ্ঠা কন্যা তৃপ্তিকে কোলে করে মা বাড়ি ফিরছেন। কোথাও ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। সে কিন্তু তখন মোটেই কোলের শিশুটি ছিল না। লীলা রায় তাঁর বিচিত্র সংসারটি পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের লেখাপড়াও যেমন করতেন, তেমনই স্বামীকেও নানা ভাবে সাহায্য করতেন। স্বামী যে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে আছেন, এবং তাঁকে নানা ভাবে সুযোগ দেওয়া দরকার, এ বিষয়ে মাসিমার মতো সদা যত্নশীল আরও একজনকেই দেখেছিলাম, তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী এলেন রায়। অবশ্য তাঁকে যখন দেখেছি তখন তাঁর স্বামী গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর আরব্ধ কাজ যেভাবে তিনি দু-হাতে করে চলেছিলেন, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে স্বামী যখন বর্তমান ছিলেন তখন তাঁকে এবং তাঁর কাজকর্মকে কীভাবে লালন করতেন তিনি। আইয়ুব এবং আরও বহু ব্যক্তির কাছে সেইসব কথা শুনেছিলাম। ইদানীং প্রায়ই ভারতীয় মহিলাদের পাতিব্রত্য নিয়ে উষ্মাস শুনতে পাই। কিন্তু এই দুই বিদেশিনী মহিলার যে নিঃস্বার্থ স্বামীপরায়ণতা দেখেছিলাম, তেমনটা আমি আমার দেশের কোনও সতী-সাধ্বীকে দেখিনি।

সে সময় নিমাই চট্টোপাধ্যায় নামে একজন অনেকের সুপরিচিত কৃতী কিন্তু পরীক্ষাবিমুখ ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে জুটেছিল কাজের সন্ধানে। সে বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি-র সম্পাদক ক্ষিতীশ রায়ের সহকারী নিযুক্ত হয়ে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি 'তিন সঙ্গী'তে থাকত। অল্প দিনেই সে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এবং আমার সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। আর অন্নদাশঙ্কর রায়-দম্পতির সঙ্গে তার অনেক আগে থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল পুণ্যশ্লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে। তবে সে যখন শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে এল, ততদিনে পুণ্যশ্লোক বিশ্বভারতী থেকে বি.এ-তে ভাল রেজাল্ট করে সরাসরি পি-এইচ.ডি. করবার জন্য জার্মানির গ্যাটিংগান বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গিয়েছিল। তাই পুত্রপ্রতিম নিমাই অন্নদাশঙ্কর এবং লীলা মাসিমার ঘরের ছেলের মতো ছিল।

অন্নদাশঙ্কর রায় এবং নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পিত 'সাহিত্যমেলা' যে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতেই করা হচ্ছিল, সেকথা কাউকেই ঘুণাক্ষরেও জানানো হয়নি, পাছে পাকিস্তানি সরকারের প্রতিকূলতায় সেখান থেকে কোনও সাহিত্যিককেই 'সাহিত্যমেলা'য় যোগ দেবার জন্য নেতে অসুবিধা হয়।

'সাহিত্যমেলা' সুপরিচালনার জন্য শান্তিনিকেতনে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছিল। কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। দু-জন সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিল: নিমাই চট্টোপাধ্যায় আর গৌরী দত্ত।

পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির মানচিত্রটি ছিল নিমাইয়ের নখদর্পণে। আর আমি ছিলাম সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। পাটনায় বড় হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আমার যোগ প্রায় ঘটেইনি। শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেই ক্রমে সেই জগৎটাকে আবিষ্কার করলাম। আর 'সাহিত্যমেলা'-র জন্য কাজ করতে এসেই তা সত্যিকারের জানা হল।

মেলাটা যে দুই বাংলার সাহিত্যিকদের মেলামেশার সুযোগ করার জন্যই বিশেষ করে আহ্বান করা হচ্ছে, সেইটে যোগদানকারীদের এবং শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। গতানুগতিক সেমিনার কি কনফারেন্স না হলেও যোগদানকারীদের অনুরোধ করা হয়েছিল যেন তাঁরা সাহিত্যের এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে কোথায় কী সৃষ্টি হয়েছে তার একটা পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। কবিতা, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন বাংলা থেকে কাকে কাকে আহ্বান করা হবে, তার তালিকা যখন নিমাইয়ের সাহায্যে অন্নদাশঙ্কর করছিলেন, আমি বাংলা সাহিত্যের জগৎটাকে জানবার সুযোগ পাচ্ছিলাম। এমনকী কারা প্রগতিশীল সাহিত্যিক আর কারা নয়, তাও তখন আমার জানা ছিল না।

প্রতিদিনই অন্নদাশঙ্কর রায় ও নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বসে সভার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকল্পনা করছিলাম। বিশেষ করে

কীভাবে টাকা তোলা হবে, তার পরিকল্পনা। কারণ বিশ্বভারতী অন্য বিষয়ে আনুকূল্য দিলেও তার কাছ থেকে অর্থসাহায্য পাওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তার নিজেরই আর্থিক অনটন প্রবাদতুল্য ছিল। অবশ্য অল্প দিন পরেই বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা এবং আর্থিক-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছিল।

আমরা ছাত্রছাত্রীরা কয়েকজন ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। এবং বেশ ভাল সাড়া পেয়েছিলাম। তাই আমরা অন্তত পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধিদের পাথেয়টুকু দিতে পেরেছিলাম।

তখন অবশ্য সময় আর হাতে খুব বেশি ছিল না। সেজন্য অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঠাও সম্ভব হয়নি। যাই হোক, আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেই বেশ সমারোহের সঙ্গে মেলা অনুষ্ঠিত হল। আমন্ত্রিত অতিথি-সাহিত্যিকদের আতিথ্যও দেওয়া সম্ভব হল। কারণ অনেকে তাঁদের বাড়িতেই এই অতিথিদের রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তা ছাড়া বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষও আতিথ্য দিলেন বিশিষ্ট কয়েকজন অতিথিকে।

জনাকয়েক পূর্ব বাংলার সাহিত্যিককে পেয়েই সবার আগ্রহ অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। আসতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, হারানিধি-খ্যাত মহম্মদ মনসুরউদ্দিন, শামসুর রাহমান এবং কায়সুল হক। শামসুর রাহমান তখন অবশ্য তরুণ এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি বলেই পরিচিত হয়েছিলেন। ওঁদের বিশেষভাবে দেখাশুনো করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এ বাংলার কাজী আবদুল ওদুদ।

চার দিন পর মেলা যখন ভাঙল, তখন আমাদের মনের অবস্থা বিজয়া দশমীর বিসর্জন শেষের মতো।

এত বড় আনন্দানুষ্ঠান হয়ে গেল, কিন্তু আইয়ুবের তাতে কোনও ভূমিকাই ছিল না, এটা আমার মনের মধ্যে অহরহ বিঁধছিল। তিনি রোগশয্যায় শুয়েও কয়েকটি চিঠিতে বেদনা প্রকাশ করেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলার মতো ঘটনাটি ঘটে গেল, কিন্তু তিনি তার কিছু আভাসটুকুও পেলেন না। সত্যি কথা বলতে কি, সে সময়ে আমার মনের একটা কোণে মেঘ জমে থাকত বিশেষ করে এই কারণেই যে, যে-মানুষটি শান্তিনিকেতনকে এবং আমাকেও এতখানি দিতে পারতেন, তার কিছুই দিতে পারলেন না তাঁর নির্মম ভাগ্যের প্রতিকূলতায়।

আমি বি.এ. পাশ করার পরেও বিশ্বভারতীতে আরও এক বছর ছিলাম বিনয় ভবনে বি.টি. পড়বার জন্য। কারণ ততদিনে আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে আমার হার্দিক ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা আমার পিতা ভালভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। যদিও বিশ্বভারতীতে দর্শনে এম.এ. পড়ার কোনও সুযোগ ছিল না, এবং পড়তে হলে কলকাতাতেই আসতে হত, তবু আমাকে কলকাতায় পাঠাতে তিনি একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন।

তিনি উৎসাহ দিলেন যেন আমি ওখানেই শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগে ভর্তি হই। আমিও তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য স্কুলে চাকরি করতে পারব আশা করে বিনয় ভবনে ভর্তি হতে রাজি হয়ে গেলাম।

তবে এক বছরের ট্রেনিং শেষ হলে দেখা গেল আমার পিতার পরিকল্পনাটা অন্য রকম ছিল। তিনি আমাকে এরপর লন্ডনে পাঠাতে চাইলেন টিচার্স ডিপ্লোমা নেবার জন্য। এবং তার মস্ত বড় আর্থিক দায়িত্বও বহন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

অবশ্য রাজনীতি থেকে যত সহজে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে পেরেছিলেন, প্রেম থেকে সরিয়ে তেমন করে বিলেত পাঠাতে পারলেন না। ফলে তাঁর সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল।

বি.টি. পরীক্ষার ফল বার হওয়ার পরে আর যে ক'টা দিন বাড়িতে ছিলাম, তখন আমেরিকা থেকে ফিরে বাবাও সেখানে ছিলেন। প্রায় প্রত্যেকটি সন্ধ্যা আমার সঙ্গে বসে তিনি কথা বলতেন, যখন বাড়ির অন্যেরা নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আত্মীয়ের দিকে চলে যেত।

চাপা গলায় তর্জন করে বলতেন, আমার যে এতটা অধঃপতন হবে, তিনি তা কল্পনাও করতে পারেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে কিছুকাল আগে তাঁর কাছে গবেষণারত ছাত্রীর প্রেম নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সে বিষয়ে তির্যক উল্লেখ করে বলেছিলেন, অধ্যাপকরা অসংযত হলে কী নিদারুণ লজ্জার ব্যাপার ঘটে! অধ্যাপক — গুরু, পিতৃতুল্য কন্যাসমা ছাত্রীর সঙ্গে এরকম আচরণ ক্ষমা করা যায় না।

যাই হোক তিনি আবার জানিয়ে দিলেন যে কলকাতায় গিয়ে এম.এ. পড়তে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁর সম্মতিও নেই এবং সাহায্যও থাকবে না।

ওই সময়ে শান্তিনিকেতনেও একটা ঝড় উঠেছিল। সে বিষয়ে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'তোমরাই তো দেখি এই ঘটনার নিন্দা কর, তাহলে তুমি কী করে এমন অশালীন আচরণ করতে পারলে?'

তখন ভাগ্যক্রমে আসানসোলের কাছে উখাগ্রামে একটা মেথডিস্ট মিশন স্কুলে চাকরির প্রস্তাব এল। আমি তো এক বাক্যে রাজি। পিতাও শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল, আমি তাহলে আরও দূরে চলে যেতে বাধ্য হব — কলকাতা থেকে নিরানব্বই মাইলের পরিবর্তে একশো পঞ্চান্ন মাইল দূরে মিশনারি কড়াকড়ির মধ্যে।

আমিও বেশ শান্ত এবং সহযোগী পরিবেশে আমাদের সংসার ছেড়ে রওনা দিলাম। শান্তিনিকেতনে আসার সময় পাটনাতে

মা যেমন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়েছিলেন, এবারও তেমনই দিলেন। গরমের দিনের উপযুক্ত অল্পস্বল্প জিনিসপত্র নিয়ে নিলাম। সবাই ভাবছিল, এ ছাড়া আর যা প্রয়োজন হবে তখন শান্তিনিকেতন এসে নিয়ে যাব।

এ ভাবেই শান্তিনিকেতনের কয়েক বছরের শিক্ষাজীবনের সীমা দ্রুত ফুরিয়ে গেল। সেখান থেকে উখাগ্রাম যাওয়ার সময় স্বপ্নেও ভাবিনি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কলকাতা এসে আইয়ুবের সঙ্গে ঘর-সংসার শুরু করতে পারব। □

অনুলিখন : কামাল হোসেন

[এই লেখাটি গৌরী আইয়ুবের জীবনের অন্তিম পর্বে অসুস্থ অবস্থায় লেখা অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা 'আমাদের দুজনের কথা'-র অংশ। চতুরঙ্গে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শান্তিনিকেতন পর্যায়ের পর্বটি এ-সংখ্যাতেই শেষ হল। — সম্পাদক]

চতুরঙ্গ-এ গৌরী আইয়ুবের লেখ-সূচি

কাবিল নামহ থেকে বসুধারা : অসম্পূর্ণ পরিচয়ের সূত্রে ৪৫ বর্ষ, ১৩৯১ ভা-আ, ৫ম সং, পৃ: ৪১২–২২।

জাহানারা ইমাম : আশ্চর্য এক অন্য জীবন ৪৭ বর্ষ, ১৩৯৩-মা, ১০ম সং, পৃ: ৮১১–১৬।

হিন্দু মুসলমান বিরোধ — রবীন্দ্রনাথের চোখে ৪৮ বর্ষ, ১৩৯৪ — পৌ, ৯ম সং, পৃ: ৭৭৭–৯০।

কবন্ধ (গল্প) ৪৯ বর্ষ, ১৩৯৫ — অ, ৮ম সং, পৃ: ৬৭৬–৮৪।

রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ৫০ বর্ষ, ১৩৯৬ — আষাঢ়, ৩য় সং, পৃ: ১৯৭–২০৬।

সৈয়দ সাদত আবুল মাসুদ ৫১ বর্ষ, ১৩৯৭ — মা, ১০ম সং, পৃ: ৮০৭–১৩।

রবীন্দ্র গবেষণার একটি অভিনব ধারা ৫২ বর্ষ, ১৩৯৮ — জৈ, ২য় সং, পৃ: ১১১–২০

রবীন্দ্র গবেষণার একটি অভিনব ধারা ৫২ বর্ষ, ১৩৯৮ — আষাঢ়, ৩য় সং, পৃ: ২২২–২৯।

রবীন্দ্র গবেষণার অভিনব ধারা প্রবর্তিকার সমালোচনার জবাবে ৫২ বর্ষ, ১৩৯৮ — পৌ, ৯ম সং, পৃ: ৭৩৪–৪০।

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ ৫৪ বর্ষ, ১৪০০ — শরৎ, ২য় সং, পৃ: ১২৪–২৮।

সৈয়দ মুজতবা আলী বন্ধুবরেষু ৫৭ বর্ষ, ১৪০৪ কা-পৌ, ৩য় সং, পৃ: ২৪০–৪৫

শান্তিনিকেতনের দিনগুলি — (ধারাবাহিক) ৫৮ বর্ষ, ১৪০৫ শ্রা-আ, ২য় সং, পৃ: ১২২ — ২৮।

৫৮ বর্ষ, ১৪০৫ কা-পৌ, ৩য় সং, পৃ: ২১২–১৬।

৫৮ বর্ষ, ১৪০৫ মা-চৈ, ৪র্থ সং, পৃ: ২৭৪–২৮১

সংকলন — তপন ঘোষ

চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

১। প্রকাশ-স্থান : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩

২। প্রকাশের ব্যবধানকাল : ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩

৪। প্রকাশক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়

৫। সম্পাদক : আবদুর রউফ, জাতীয়তা : ভারতীয়

৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম-ঠিকানা : নীরা রহমান, ৩৪/১ বন্ডেল রোড, ফ্ল্যাট-১/সি, কলকাতা-৭০০০১৯

আমি নীরা রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

নীরা রহমান

বঙ্গসংহার এবং

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দেশ ভাগ হতে চলেছে। কলকাতায় মুসলমানেরা আক্রান্ত হচ্ছেন। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে গান্ধীজি চলে এলেন সোদপুরে। মুর্শিদাবাদ থেকে আবদুল্লাও একদিন নোয়াখালি চলে এলেন। গান্ধীজি তাঁকে দেখে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন, "সেকি, তুমি অপসন দিয়ে পাকিস্তান যাওনি ?" আবদুল্লা গান্ধীজিকে বললেন, তাঁর পাকিস্তান যাওয়ার ইচ্ছা নেই। তিনি কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। গান্ধীজির নির্দেশ নিতে তাই তিনি এসেছেন। গান্ধীজি তাঁকে বললেন, তুমি পাকিস্তানে অপশন দাও। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে তোমার মতো অফিসারের প্রয়োজন আছে। সেখানে আজ হিন্দু সংখ্যালঘুরা আবার নিজেদের বিপন্ন বোধ করছে। তুমি তাদের সেবা ও সাহায্য করতে পারবে। আবদুল্লা গান্ধীজির অনুমতি নিয়ে পাকিস্তানে অপসন দিয়ে চলে গেলেন। এরপর গান্ধীজির সঙ্গে আবদুল্লার আর দেখা হয়নি। প্যারেলাল তাঁর 'গান্ধী দি লাস্ট ফেজ' গ্রন্থে লিখেছেন— "গান্ধীজি হত্যার পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য যে জাতীয় তহবিল গড়ে তোলা হল, সেই তহবিলে এক হাজার এক টাকার প্রথম যে মানিঅর্ডারটি এসেছিল, সেটি ঢাকা থেকে আসা এস. এম. আবদুল্লার।"

গান্ধীজির কাছে ওই দিনগুলি ছিল হারানোর ও হেরে যাওয়ার। তিনি নোয়াখালি থেকে বিহার রওনা হলেন। ফেনি থেকে ডাউন চিটাগং এক্সপ্রেস ধরে সোদপুর স্টেশনে নামলেন (৩ মার্চ ১৯৪৭)। সোদপুর আশ্রমে পৌঁছে দেখলেন তাঁর একটি ব্যক্তিগত ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না। খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন গান্ধীজি। ফেনি থেকে চাঁদপুর, সেখান থেকে গোয়ালন্দ এবং গোয়ালন্দ থেকে সোদপুরের দীর্ঘ যাত্রাপথে গান্ধীজিকে ট্রেনে, স্টিমারে, আবার ট্রেনে উঠতে হয়েছিল। এই সমস্ত জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি লোকেরা ফাইলটির সন্ধান করলেন। কিন্তু লাল মলাটের সেই ফাইলটি পাওয়া গেল না। এই সময় বিহারে দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষের ভিড়ের মধ্যে তাঁর ট্যাঁকঘড়িটিও হারিয়ে গিয়েছিল। আর পাটনা থেকে দিল্লি পৌঁছে সে যাত্রায় গান্ধীজি বুঝতে পারলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ অবিভক্ত ভারতবর্ষ হারিয়ে যাওয়ার পথে।

গান্ধীজি নোয়াখালি থেকে বিহার যাওয়ার প্রায় দেড় মাস পরে বাংলা প্রাদেশিক সরকারের হোম পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি পি ডি মার্টিন, আই সি এস ২৩ এপ্রিল (১৯৪৭) কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে একটি চিঠি পাঠালেন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার উইলিয়াম ব্যারেট, আই সি এসকে। এই চিঠিতে মার্টিন সাহেব বিভাগীয় কমিশনার ব্যারেট সাহেবের কাছে জানতে চাইলেন যে কেন নোয়াখালির বিপর্যয় প্রতিরোধ করা গেল না। কেনই বা দাঙ্গার আগাম সংবাদ সংগ্রহে পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্যর্থ হল। এর তদন্ত করে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য হোম ডিপার্টমেন্ট বিভাগীয় কমিশনারকে নির্দেশ দিলেন। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ব্যারেট সাহেব ১১ মে (১৯৪৭) তারিখে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে যে রিপোর্টটি পাঠান, সেটি হল নিম্নরূপ :

Confidential official report about the condition of Noakhali, in May 1947
Office of the Commissioner, Chittagong Division,
Top Secret

To
P. D. Martyn, C.I.E. O.B.E., I.C.S.
Additional Secretary to the Government of Bengal,
Home (Political) Department, Calcutta,

Memorandum No. 457/C,

Dated, Chittagong, the 13th May, 1947.

Subject: *Noakhali Situation.*

Reference your Memo No. 647-PS,dated the 23rd April, 1947. I spent the 27th to the 30th of April

in Noakhali and visited Ramganj, Begamganj and Lakshmipur Thanas. I met leading Muslims and Hindus of all classes including office-bearers of the League, politicians, merchants, agriculturists, school-masters, doctors, relief workers, volunteers and Presidents and Members of Union Boards and interviewed them individually except in cases where they specially asked me to be heard in groups. Before leaving, I received a deputation of Hindus of all political persuasions and another deputation of Muslims including a non-Leaguer. I also had talks with the district Magistrate, the Superintendent of Police and the sub-divisional Officers of Sadar and Feni. I now give my report.

Analysis of Situation

2. *Present Condition:* The situation in Noakhali District is complex and has many facets, political, communal, economic and psychological. To the casual observer, the District seems normal enough. Most of the fields are green with aus paddy and jute, and the remainder are being ploughed. The bazaars and hats are functioning normally and both Hindus and Muslims may be seen moving about freely and without any apparent apprehension. Under the surface, however, there is definitely tension, and among Hindus, a sense of insecurity. In many areas in the interior, away from the more populous centres, this tension manifests itself in the form of abuse and petty harassment of the Hindu minority. The harassment is, of course, magnified by the Hindus, and belittled or denied by the Muslims. In fact, everywhere one is met by lies and counter-lies and it is not easy to get at the truth.

3. *The Hindus:* The number of Hindus in the District according to the last census is 4 lacs while the number of Muslims is 18 lakhs. The ratio of Muslims to Hindus is therefore nearly $4^1/_2$: 1. The Hindus, especiallly *bhadralog* class,had a bad shaking during the October disturbances, and have not yet recovered their morale. They are apprehensive and suspecious. They do not want to leave the District because, for most of them, that would mean sacrificing their all, and though many of them are kept in a state of fear by open threats and petty persecution and molestation at the hands of the Muslims, they will not report these cases to the Thanas or the local officers for fear that if it became known that they had done so, worse things would befall them. Sometimes, however, they do report them to the local political relief workers (usually in exaggerated form), but if official enquiries are then made, they will more often than not deny that the incidents they reported ever occurred or that they brought them to notice. In many cases of this kind, it is well known that the incidents actually took place and there are Muslims who know of them and will admit it. All that the Hindus succeed in doing by adopting this attitude of secret report and subsequent denial of the facts is to impeach their own credit. But such is the state of their demoralisation. The credit of the Hindus had also suffered because, in some cases, members of their community named in the F.I.R's' Muslims who were not present in the scene of disturbances or who had actually gone out of their way to protect Hindus. This naturally caused much resentment among Muslims.

4. *The Muslims:* The Muslims of the District may be divided into three distinct categories. Firstly, there are those who generally abhor the communal war of nerves that is now in progress and want to live in peace with their Hindu neighbours as they used to do in the past. Many of this class have Hindu friends, and gave shelter to, and even protected Hindus during the disturbances at considerable risk to themselves. They would do the same again, and they provide a definite influence for good, unfortunately, their number is not large. The majority of Muslims fall in the second category. This class, while strongly pro-Muslim (League ?), and anxious to oust the Hindus from their present position in the District, does not favour violence as a means to attain that end. It sees no objection, however, to petty persecution of the Hindus, and if the persucution is somewhat extreme, it is ready to turn a blind eye to the fact,when not to do so might lead to unpleasantness or even unpopularity. This section will give lip service to communal harmony and peace, and will often be outwardly friendly to Hindus. It will not however take any

part in preventing disturbances or protecting the Hindus and may, even under the influence of rumour and excitement of the hour, take part in disturbances and encourage others to do so. Many members of Union Boards belong to this class. The third category is the most dangerous. To this class belong those Muslims who, for resons of religious zeal, economic jealousy or personal enmity, hate the Hindu and want to see him wiped out. This class would not ordinarily be powerful, but circumstances have combined to make it so today and it has the advantage of having attracted to its side the goonda element of the District, which sees in disturbances the prospect of the easy acquisition of wealth and power. Many persons who fall in this category are able,if violent, speakers and can work up a mob into a state of frenzied anger. To this class belong Abul Kasem and Ali Akbar, the two most important absconders.

5. *The Goonda Problem:* In the last paragraph mention has been made of goondas. There has been a large addition to the number of bad characters in recent years. The reason of this is probably largly economic. In 1911, the area of the District was computed 1,644 sq. miles and the population 11,74,728, giving a density of 694 persons per square mile. Today the area of the District is 1,658 sq. miles and the population 22,17,402, giving a density of 1338 persons per square mile. The pressure on land must therefore be wellnigh intolerable, and the inevitable result has been that the weaklings have gone to the wall and taken to crime. All parties were agreed that the number of goondas had increased enormously since the war, and a further accession of strength has been lent to this class by the gradual return of disgruntled ex-servicemen in the last eighteen months; over 56,000 men of this District joined the services during the war. They became accustomed to a standard of living much above that of their village compeers and are disillusioned and discontented now that they have returned and find that they cannot maintain that standard. What more natural than that many of them should take the easy path of crime, especially when the present disturbed conditions afford such little chance of detection. These goondas are no respectors of persons when their need is sufficiently pressing and many Muslims are uneasy at their growing strength and increasing depredations. Not a few said plainly that if their activities remained unchecked, gangster rule would soon be the order of the day. Their fears are justified. It is more than possible that the present phase of communal warfare will be followed by one of goonda domination in which goondas of both communities will combine to enrich themselves at the expense of the public generally.

6. *Crime:* The growth of the goonda element has narurally led to an increase of crime in the District. The extent of this increase can be best shown by the number of reported cases during the first three months of 1946 and the first three months of 1947.

Offences	...	*1946*	*1947*
Dacoity	...	5	26
Arson	...	6	43
Robbery	...	5	12
Murder	...	4	6
Burglary	...	436	456
Theft	...	176	220

Arson of course has always been a common offence to this District. According to the District Gazetteer, it was prevalent as far back as 1911, but it has never been as widespread as it is today.

Both local Muslims and the Police have been at pains to explain that in the increase of crime which has taken place this year, the Muslims have been sufferers equally with the Hindus, and that the increase has no communal colour. This is palpably untrue. Although the Hindus are outnumbered in the District the $4^1/_2$:1, the crime took place for the most part in Hindu houses. In the case of arson, the number of houses affected in the last eight weeks alone was 3 Hindu to 1 Muslim. In other words, allowing for the disproportion in population, the true ratio of Hindu and Muslim victims was $13^1/_2$:1. Similarly in the case of dacoity, the ratio of houses affected works out to 9 Hindus to 1 Muslim. It is true, of course, that many of the Hindus are better off than the Muslims, and economically it is therefore often more profitable to rob a Hindu house than a Muslim one, but there is little room for doubt that most of the arson commited was for communal reason and that in many of the other cases, Hindu houses were selected in preference to Muslim ones because the owners were Hindus and because for that reason, the offence would be regarded as venial. The brunt of the crime wave has fallen on them because they are Hindus and if further argument is needed to support their contention it will be found in the fact that, during the last eight weeks there have been no less than five cases involving desecration of Hindu holy places.

7. *Hindu persecution:* Apart from being the main victim of the crime wave, the Hindus are being persecuted in many more subtle ways. The extent and intensity of this persecution varies, of course, from area to area, and in some areas, it is entirely absent. The persecution does not take the form of economic boycott (though this is still advocated by the more extreme Muslim leaders), because the cultivating class cannot afford to allow any land to go untilled or to lose the returns which the cultivation of that land would bring them. What is happening is that a section of Muslims is taking advantage of the demoralised condition of the Hindus to insult, threaten and cow them down into a state of resigned submission, after which they fatten on their property and treat them as an inferior race. It is quite usual for Hindus while moving about to be addressed as *malaun or Kafir.* Sometimes they are searched by parties of Muslims and deprived of anything the latter fancy. Cases have occurred of Hindus returning to their houses with their daily bazaar and having their purchases snatched away; the removal of coconuts and betelnuts from the gardens of Hindu homesteads is a common occurence, corrugated iron sheets and timber are often taken from Hindu houses with the frightened consent of the inmates; cattle belonging to Hindu households have developed a habit of freeing themselves from their tethers and disappearing, the paddy plants of Hindus have been up rooted and thrown away. If an aggrieved Hindu reports these occurences to the Thana, his sufferings are increased, and there have been cases in which such reports had led to the burning of the victims' huts; efforts are being made to have Hindu owned cinema houses closed, and although the vast majority of weavers in the District are Hindus (Naths), the demands are beeing made that 50% of the loom licences should go to Muslims. There is a move to rid the Bazaars of Hindu merchants and one of the larger Hindu merchants told me that he and many others had been receiving threatening letters. Long established Hindu shopkeepers are being ousted from the markets to make way for Muslims. Hindus who have rebuilt their houses (including even women) have been told that they will not be allowed to live in them and that it will be better for them to leave the District. There is reason to believe that complainants in cases arising out of the disturbances are being threatened by Muslims and compelled to agree to their cases being compromised. Much of this persecution is comparatively petty, but it is lawlessness none the less and it shows that the virus which was injected into the District before the October disturbances has not yet been eradicated. The danger now is that the war of nerves which is in progress may lead to more trouble if positive steps are not taken to bring it to an end. In some areas,even an indiscreet speech by an All-India leader, or a persistant rumour of Muslims being persecuted, might at present be sufficient to start fresh rioting.

This happened in Feni, but is mentioned as being indicative of the state of Muslim feeling.

8. *Rehabilitation:* considering the unsettled state of the affected Thanas, the progress of rehabilitation has not been unsatisfactory. According to the figures furnished to me by the District Relief Officer, 7,710 families have received house building grants, and of this number 2,774 families have been provided with building material by Government. As against these figures, 3,496 families have rebuilt their homes, 1,519 with materials supplied by the Government and 1,977 with partially burnt materials or materials obtained from other sources. The District Magistrate states that there is still a number of families who have received building materials from the Government and who will be using them

as they feel sufficiently secure.

Owing presumably to the shortness of building materials, less than 50% of those who have received house-building grants have been provided with building materials by Government. Such materials can only be obtained from the local market at fantastic prices, and there is no doubt that if adequate supplies were made available by Government, the process of rehabilitation would be accelerated. Stories have been put about that Hindu families which have been provided with house building materials by government have sold the materials in the black market. Such cases may have occured, and that risk must be taken.In point of fact, I am assured that the number of such cases is negligible similarly an allegation that is frequently made by Muslims in Noakhali, is that Hindus have been burning their own houses in order to implicate Muslims and to secure house building grants. Such allegations must be heavily discounted. The morale of the Hindus is too low for them to dare risk the consequence of such an action, it is most unlikely that grants made would be sufficient to cover the extent of the damage.

An interesting point is that of 22,066 artisans affected by the disturbances, 17,853 families have received rehabilitation grants and 13,602 families have now resumed their occupations. Most of these artisan families are weavers (cf. para 7), 4,121 agricultural families were affected by the disturbances and of these 3,275 have returned to their holding and resettled.

9. *Volunteers:* The number of volunteers in the District does not appear to be large and very few are doing anything of value in the matter of relief and rehabilitation. There is a feeling among influential Muslims that most of these volunteers (including members of the Gandhi Camp) are not only making no attempt to bring the two communities together, but are acting in such a way as to keep open the breach that has existed between them since last October. There is much truth in this. The members of the Gandhi Camp and certainly other volunteers seem to be much more interested in cataloguing the woes of the Hindus than in attempting to bring those woes to an end by meeting and discussing matters with the leading Muslims of the locality concerned and generally trying to bring about a reconciliation. There is in fact no contact between those volunteers and the Muslims and there is a wall of suspicion between them. Most of the time of the Gandhi Camp is spent in receiving reports, some directly and some indirectly, from aggrieved Hindus which, without any form of check or verification, they either pass on to Government or publish in the Press. This in itself is irritating to the local people and serves no useful purpose except that, in the absence of information from the Police, it may give the District Magistrate a line of enquiry. The publication of the 'Shanti Mission Dinalipi', a cyclostyled news sheet, is particularly harmful as this paper publishes the most trifling incidents and gives them a communal colour which may or may not be correct. There is no doubt that the Gandhi Camp members and other volunteers are encouraging the Hindus in their distrust of the administration and their desire to avoid going to the Police or to the local authorities for the redress of their grievances.

10. *The Riot Cases:* One thing which, more than anything other, had served to increase the demoralisation of the Hindus and the turbulence and aggressiveness of the Muslims is the way in which the cases arising out of the October disturbance have been handled. The figures below give at a glance the position of these cases as on the 15th April:

1. Cases started on regular *ejahar* (deposition)	1529
2. Number of persons involved	13539*
3. Number of persons arrested	1074
4. Number of accused still at large	566
5. Number of persons discharged for want of evidence	397
6. Number of persons released on bail	627
7. Number of persons detained in custody	50
8. Number of charge sheets submitted	164
9. Number of final reports submitted	862

* This figure is inflated as many persons have been mentioned in more than one *ejahar.*

The points which stand out from these figures are, (1) that out of 1529 cases no less than 862 have remitted in final reports, and that only 164 in charge sheets; (2) that no less than 566 accused are still at large, including several of the most dangerous ring-leaders, and (3) that out of 677 arrested accused only 50 are now in custody. In the nature of things, a large number of cases must end in final reports and the high proportion of such cases would have eased apprehension to the Hindus and anxiety to the cvil administration, had all the ring-leaders and those known to have committed murder been arrested, and had it been that the cases against these persons would be reigorously prosecuted. This is not the case, and the Hindus now feel that the Police are not serious in their attempts to track down the culprits and bring them to book, while the Muslims, who were told that they would be immune from prosecution, are confident that retribution will not overtake them. The two leading absconders—Abul Kasem and Ali Akbar—are still known to be visiting the District and even holding meetings. In fact that they are still at large and are able to make these statements is demoralising the Hindus in one way and the Muslims in another, and though the bulk of the Muslim population, either through fear or sympathy, will not give any information about their movements, there is nb doubt that both these men could have been arrested weeks ago. The lack of confidence engendered by these aspects of the situation has been increased by laxity on the part of the magistracy in releasing persons on bail owing to political pressure, and the failure of the Police to keep a tag on those released on bail and press for the cancellation of the bail bonds of those believed to the interfering with witnesses. Only three bail bonds have been cancelled up to the end of 30th of April. To anyone in touch with the situation in the District such a figure is preposterous. If any degree of confidence is to be restored it is of paramount importance that these matters should be set right.

11. *The Police:* A sign of weakness in the Police Administration is the fact that the Police are not receiving information of what is going on in the interior of the District, and they appear to be making no attempt to obtain such information. The District Intelligence Branch is either paralysed or intentionally dormant, and the lack of information is so remarkable that one cannot but suspect that when information does come within the grasp of the Police, they shut their eyes to it. This virtual suppression of information is embarrassing to the District Magistrate, as it means that he must use his Relief and other officers to keep him informed of the situation supplied by the Gandhi Camp. The reason for this state of affairs is not clear, that incidents involving interference with Hindus should be suppressed and supression lends colour to the frequently stated opinion of the Superintendent of Police that conditions in the District are satisfactory. It was complacency of this kind which led to the holocaust in October last, and which may yet result in a repetition of that disaster.

বঙ্গ রাজনীতি : ফজলুল হক—শরৎ বসু—কিরণশঙ্কর—শ্যামাপ্রসাদ

১৯২০ সাল থেকে বঙ্গ রাজনীতি সামগ্রিকভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। কিন্তু ১৯২২ সালে বঙ্গীয় আইনসভার প্রথম নির্বাচন (যা 'কাউন্সিল এক্টি' নামে বঙ্গ রাজনীতিতে সমধিক পরিচিত) দেশবন্ধুর প্রভাবের বাইরে থেকে গ্রামবাংলাকে উচ্চরবে শহরে রাজনীতিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন একজন লোক। ইনি হলেন বরিশালের আবুল কাশেম ফজলুল হক। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এবং আইন ব্যবসা ও শিক্ষাজগতে স্যার আশুতোষের ঘরানার মানুষ। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর প্রস্থানের পর ফজলুল হক এক প্রচণ্ড স্বাজাত্যাভিমান, আকাশের মতো বড় হৃদয়, প্রাণবন্ত আন্তরিকতা, সারল্য ও আবেগ নিয়ে প্রায় পঁচিশ বছর বঙ্গ রাজনীতিতে এক নতুন ঘরানা সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে অনায়াসে 'ফজলুলি ঘরানা' বলা চলে। ১৯৩৫ সালের ভারত সংস্কার আইনে দেশের প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন (Provincial Autonomy) দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বঙ্গ প্রদেশেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ওই সময় প্রাদেশিক আইনসভার আসন সংখ্যা স্থির করা হয়েছিল ২৩৮। এর মধ্যে দেশীয় জমিদার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বণিকসভা, ইউরোপীয়ান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রিস্টান সহ বিভিন্ন

ধর্ম ও জনগোষ্ঠীর মনোনীত সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় শ'খানেক। ভোট হয়েছিল ১৪৫টির মতো আসনে। এই নির্বাচনে ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলের পত্তন করেন। বাংলায় মুসলিম লিগের প্রবল প্রতিপত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফজলুল তাঁর একক ব্যক্তিত্বের জোরে আইনসভায় ৩৯টি আসন পেলেন। মুসলিম লিগ পেল ৪০টি আসন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৬০টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। ফজলুল হক বাংলার রাজনীতি থেকে মুসলিম লিগের ধর্মীয় রাজনীতিকে চূর্ণ করার জন্য কংগ্রেসের সাহায্যে সরকার গঠনের উদ্যোগ নিলেন। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। এই দুই ভাইকে ফজলুল হক স্নেহের সঙ্গে 'তুই' বলে ডাকতেন। সুভাষচন্দ্র ও শরৎবাবু তাঁকে সম্বোধন করতেন 'হক সাহেব' বলে। কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য হক সাহেবের উদ্যোগ সম্পর্কে ফজলুল হকের একনিষ্ঠ অনুগত মুর্শিদাবাদের সৈয়দ বদরুদ্দোজার বয়ান হল এই: শরৎ আমার সহপাঠী। রাজনীতিতে আলাদা থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্কে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। যেহেতু সুভাষের উপর তাঁর 'মেজদা'-র প্রভাব ছিল অপরিসীম, সেহেতু হক সাহেব আমাকে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের আলোচনার সূত্রপাত করার দায়িত্ব দিলেন। বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অবস্থা অনুযায়ী মুসলিম লিগকে সরকারি ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। আমি উডবার্ন পার্কে শরতের বাড়ি গেলাম। শরৎ আমার মারফৎ হক সাহেবের প্রস্তাব শুনল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শরৎ বলল, ব্যক্তিগতভাবে এই পুরো ব্যাপারটায় সে আমার সঙ্গে একমত। একদিকে সুভাষ ও অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী। এদিকে কংগ্রেস কোনও প্রদেশেই কারওর সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে যাবে না বলে ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। শরতের সঙ্গে আমার বার তিনেক কথা হয়েছে। আমার সঙ্গে প্রথম দিনের কথার পর আমার মনে হয় শরৎ সুভাষের সঙ্গে আলোচনা করেছিল। পরের দিনগুলিতে শরৎ আমাকে বলল, তাঁর পক্ষে হক সাহেবের প্রস্তাব নিয়ে আর এগোনো সম্ভব নয়। ওরা আমার সঙ্গে একমত নয়। 'ওরা' বলতে আমার ধারণা শরৎ গান্ধীজি ও সুভাষকেই বুঝিয়েছিল। আমি তখন অনেকটা আবেগের সঙ্গেই বলেছিলাম, শরৎ তুমি ইতিহাসে এমন একটা নজির দেখাতে পার যেখানে দুজন বড় ব্যক্তিত্ব কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন? ডিড রোবসপিয়ার এগ্রি উইদ্ নেপোলিয়ান? শরৎ আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, তোমাকে আমার জায়গায় বসিয়ে দ্যাখো যে তুমি একই সঙ্গে গান্ধীজি ও সুভাষকে অমান্য করতে পার কিনা? খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে বদরুদ্দোজা সাহেব কপালে হাত রেখে বললেন, কপালের লিখন, কে কবে খণ্ডন!' *(ক্রমশঃ)*

• ১৯৫৮ সালে এম.এল.এ. সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবের সঙ্গে বিধানসভার লবিতে লেখকের কথোপকথনের একাংশ।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক বাঙালি মধ্যবিত্ত-মন

অরুণ মজুমদার

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী সম্পর্কে সমসাময়িক বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ কেন উদাসীন ছিল, এর অনেক তাৎক্ষণিক কারণ সহজেই অনুমেয়। সবচেয়ে বড় কারণ নিশ্চিহ্নই ছিল প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতার ঘোষিত লক্ষ্য ও কর্মধারার প্রকৃতি এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র আকৃতি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান সমসাময়িক মধ্যবিত্ত সমাজের জীবিকার্জনের সমস্যাকে বড় করে দেখেনি, বড় করে দেখেছিল ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার মাধ্যমে বিদেশি শাসন যে কৃশিক্ষা আমদানি করছিল তার হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য মানুষ প্রজাতির অন্তরের ধর্ম থেকে উৎসারিত মানবিকতাবাদী শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তৃতি। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ওই শিক্ষার প্রচলন করতে চেয়েছিল জাতির মধ্যবিত্ত অংশের তৃণমূল স্তর থেকে, অবশ্যই তা ছিল ব্যাপক ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার সমুদ্রে বারিবিন্দুর মতো। তার উপর আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তর ছিল এনট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি অবধি। আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসতে হত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞানপত্র সংগ্রহ করবার জন্য। আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিশ্রুত শিক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রসমালোচিত বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থার উপরোক্ত আপোষ-রফার জন্যই আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাকে বাঙালি মধ্যবিত্ত মন কবি মনের রোমান্টিকতা বলে মনে করত। যে-অভিভাবকেরা আশ্রম বিদ্যালয়ে সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য পাঠাতেন, তাঁরা কয়েক বৎসর সন্তানদের মুক্ত প্রকৃতি ও আদর্শনিষ্ঠ পরিবেশে 'মানুষ' করে, রবীন্দ্রনিন্দিত অমানবিক শিক্ষাব্যবস্থার জঠরে ঢোকানোর জন্য তাঁদের আশ্রম থেকে প্রত্যাহার করে নিতেন। কারণ মানুষী শিক্ষার সকল উৎস উপকরণ আশ্রম বিদ্যালয়ের অল্পবয়সী ছাত্রগণ যতটুকু আহরণ করুন না কেন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চতর স্তরগুলোর মধ্য দিয়ে না গেলে তাঁরা যে জীবিকার্জনের 'উপযুক্ত' পাথেয় সংগ্রহ করতে পারবেন না, একথা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে পারতেন না। ফলে ১৯১২–১৯১৫ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্তত নিজের উপলব্ধিতে আশ্রম বিদ্যালয়ের ঘোষিত উদ্দেশ্যের চেয়ে প্রকৃত মানুষ গড়ার কাজে উপযুক্ত শিক্ষককুল তৈরি হয়ে ওঠার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যালয়কে দেখতে আরম্ভ করেন। ওই পরিবর্তনের সাক্ষ্য শুধু মাত্র প্রচলিত কলেজীয় শিক্ষার অবাস্তবতা তুলে ধরার প্রসঙ্গে রাজনীতিতে আসক্ত দেশসেবকদের ভারতবর্ষের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পরম্পরা গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বানই নয়, ওই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় অজিতকুমার চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এবং মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর চিঠিগুলোয়।[১] তিনি সুস্পষ্ট বলছেন, শিক্ষকদের প্রধান কাজ মানুষ গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষার্থীদের নিছক পুঁথিগত বিদ্যাদান করা নয়।

শিক্ষাসম্পর্কিত বিভিন্ন লেখায় রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি বক্তব্য বারংবার উচ্চারিত হয়েছে তা হচ্ছে—

প্রথমত, গ্রামসমাজে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূরীকরণের এবং কৃশিক্ষায় নিমজ্জিত 'শিক্ষিত' মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষদের মানবিক ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মের দ্বারা যথার্থ শিক্ষিত করে তোলার কাজ, দেশসেবার জরুরি কাজ। ওই কাজের

জন্য বিদেশি প্রশাসনের কাছে আবেদন-নিবেদন করা বুদ্ধিবিভ্রমের নামান্তর মাত্র, এ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা কুশিক্ষার জন্মদাতার উদ্দেশ্য বুঝত না চাওয়া। ইংরেজ সরকার প্রচলিত কুশিক্ষার বদলে মানবধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রয়োজন মেটানো যায় এমন ধরনের শিক্ষার দায়িত্ব সচেতন ও হৃদয়বান মানুষদের নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, দেশের বৃহত্তর সমাজ যা পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত, ওই সমাজের কল্যাণপ্রয়াসে উৎসর্গীকৃত নানা ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক বৃত্তিশিক্ষা এবং মানবিক ধর্মে দীপ্ত শিক্ষার ব্যাপ্তির জন্য গোটা দেশে প্রয়োজনীয় কর্মী-শিক্ষক পরম্পরা গড়ে তুলতে হবে। ওই কাজ নিছক ইংরেজ প্রশাসন বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব নয়। উপরোক্ত শিক্ষার বিকিরণে ত্যাগ ও তিতিক্ষায় দীক্ষিত সচেতন মানুষদের প্রচেষ্টা নিছক স্বরাজ সাধনের আন্দোলনের তুলনায় অনেক বেশি জরুরি।

তৃতীয়ত, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে দেশের তথাকথিত 'শিক্ষিত' এবং 'অশিক্ষিত'দের মধ্যে যে ধরনের নিন্দনীয় শ্রেণীবিভাগ প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকজনদের মধ্যে একদিকে ইংরেজ রাজপুরুষদের সমকক্ষ হবার দাবিকে সোচ্চার এবং অন্যদিকে পল্লী অঞ্চলের বা শহরাঞ্চলের অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের মনোভাবকে ব্যাপক করে তুলেছে, সেখানে নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন দেশের প্রকৃত মুক্তি বা স্বাধীনতা নিয়ে আসতে পারে না। প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে রবীন্দ্রনাথ দেশের বৃহত্তর অংশের জনসাধারণের জীবিকা ও মনন, সামবায়িক আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদা বোধে গতিময় হয়ে ওঠাকে বুঝিয়েছেন। উক্ত স্বাধীনতা নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। মানবিক শিক্ষার বিস্তার এবং সামবায়িক কর্মোদ্যোগের প্রসারণ দেশকে যথার্থ স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাবে। তা না হলে নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু ভাবাবেগকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় এমন নয়, রাজনৈতিক নেতাদের লেজুড়বৃত্তিতে পর্যবসিত হয়ে বৃহত্তর সমাজের অর্থাৎ পল্লীবাসী শ্রমজীবী মানুষদের বিচারবোধকেও পঙ্গু করে ফেলে। বিদেশি শ্বেতাঙ্গের বদলে এদেশি কৃষ্ণাঙ্গের রাজত্বের প্রশ্নটাই তখন স্বাধীনতার একমাত্র অর্থ হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থত, একদিকে যেমন প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান, চারুকলা সঙ্গীত অর্থাৎ মানবজাতির যে কোনও অংশের মানবিক বা মননশীল সম্পদ আহরণ করে যে মানবিক শিক্ষার উন্মেষ তা কোনও ভৌগোলিক গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারে না, অন্যদিকে যে কোনও দেশ বা জাতির নিজস্ব সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক সম্পদের অতীত ও বর্তমানের মধ্যেই যথার্থ মানবিক শিক্ষার উপকরণ সুপ্ত থাকে। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষ প্রজাতির বিচিত্র সাধানায় সৃষ্টিশীল দেওয়া নেওয়া।

উপরোক্ত চারটি বক্তব্যের শুধুমাত্র একটি মূল্যবান দিকই অর্থাৎ ত্যাগব্রতী শিক্ষক পরম্পরা গড়ে তোলার কাজ নিয়েই আশ্রম বিদ্যালয় শেষ অবধি দাঁড়িয়েছিল। আর বিশ্বভারতী ত্যাগব্রতী শিক্ষক পরম্পরার সঙ্গে বিদ্যা উৎপাদন পরম্পরা এবং তার পাশের গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় পরম্পরা গড়ে তুলতে চেয়েছিল। বিশ্বভারতী ওই গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনার্থে আত্ম নিয়োগকারী এমন কর্মী পরম্পরা গড়ে তুলতে চেয়েছিল যাঁরা উপচিকীর্ষার বশে গ্রামের কাজ করবেন না, যাঁরা নিজেরাই গ্রামের মানুষদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে একাত্মবোধে দীক্ষিত হয়ে সামবায়িক আত্মশক্তি উদ্বোধনের কাজ করবেন। নিঃসন্দেহে আদর্শ শিক্ষক বা উদারচিত্ত মননশীল বিদ্যা-উৎপাদকের ঐতিহ্য গড়ে তোলা অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের জন্য একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ কর্মীসংগঠক গড়ে তোলা ছিল বিশ্বভারতীর কঠিনতম কার্যসূচি। ওই কঠিনতম কাজের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন একটি মাত্র কারণে — তা হচ্ছে ভারতবর্ষের জৈবিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের উপকরণ থাকে পল্লী অঞ্চলে। পল্লী অঞ্চলকে তার বিপন্ন অবস্থা থেকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে না তুলতে পারলে আদর্শ শিক্ষা বা মননশীল বিদ্যা উৎপাদন অর্থহীন হয়ে পড়ে। শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ওই উপলব্ধির কথা উপর্যুপরি ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে যেমন দেখেছিলেন বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে অনেক ব্যবধান, তেমনই দেখতে পেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর ঘোষিত লক্ষ্য ও সিদ্ধির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

ওই ব্যবধানের কয়েকটি কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সমসাময়িক বাঙালি সমালোচকগণ দেখিয়েছিলেন।

প্রথম কারণ তৎকালীন মধ্যবিত্ত রাজনতিবিদদের মুখে শোনা যায়, তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী-কর্মসূচির প্রয়োগ ক্ষেত্র অতীব ক্ষুদ্র। একটি বিরাট দেশের এক অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ভূখণ্ডে একটি প্রয়োগধর্মী সৃষ্টিশীল রূপকল্প একটি সুমহান সত্যকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টার সূচনা করতেই পারে, তবে দেশব্যাপী প্রতিকূল পরিকাঠামো ও ব্যবস্থার চাপে ওই মহতী প্রচেষ্টার মৃত্যু অনিবার্য।

অন্যান্য যে যে কারণ উল্লিখিত হয়েছে তার অনেকটাই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দৃষ্টান্তের — স্যার যদুনাথ সরকারের বহুউদ্ধৃত সমালোচনা — যা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তথাকথিত 'ডিসিপ্লিন'-এর জয়ধ্বনিতে মুখর। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসন করে বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনীয়তার অভাব বিশ্বভারতীতে। আবার কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের পরিচালন-পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিকতার অভাব বা তাঁর ব্যক্তিগত মানসিক দুর্বলতার

প্রভাবকে বিশ্বভারতীর লক্ষ্য ও সিদ্ধির মধ্যে ব্যবধানের অন্যতম কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। প্রতিটি কারণ আপাতদৃষ্টিতে কিছু কিছু বস্তুগত সত্যকে আশ্রয় করলেও, সামগ্রিক দিক থেকে শুধুমাত্র মিথ্যাই নয়, আসলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জবাবদিহি।

বর্তমান লেখকের মনে হয়েছে, বিশ্বভারতী জন্মলগ্ন থেকেই যে প্রতিকূলতাগুলোর মুখোমুখি হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাকে বিন্দুমাত্র খাটো না করে, সবচেয়ে বেশি যাকে দায়ী করা যায় তা হচ্ছে একদিকে সমসাময়িক বাঙালি মধ্যবিত্তজনের গতি ও প্রকৃতি। অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের সামগ্রিক মানসিক প্রবণতাকে বুঝতে না পারা। সবচেয়ে বেশি ভুল তিনি করেছিলেন এ কল্পনা করে যে সমসমায়িক বাঙালি মধ্যবিত্ত মন ও মনন তাঁর শিল্পকর্মকে যেভাবে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন করেছিল, তাঁর বিশ্বভারতীও ওই একই প্রকার অভিনন্দন পাবে। যে-যদুনাথ আশ্রম বিদ্যালয়ে মাঝে মধ্যে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইতিহাস শিক্ষা দিতেন, তিনি বিশ্বভারতীর জন্মে এত অপ্রত্যাশিতভাবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে আক্রমণ করে বসলেন কেন? বিশ্বভারতী রূপকল্পনায় যদুনাথ যদিও বেশ অস্থিরচিত্ত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠিতে কিন্তু আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বিশ্বভারতী নয়, রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয় সংক্রান্ত চিন্তাধারার বাস্তব ফলশ্রুতি কেন অধিকতর 'শৃঙ্খলিত' বা যান্ত্রিক হল না তা নিয়ে। বিশ্বভারতীর রূপকল্পে পল্লী অঞ্চলের গোপালন, চাষবাস, কাঠের কাজ ইত্যাদি শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে কর্মোদ্যোগের প্রেরণা সৃষ্টি করবে — শহরবাসী এলিটিস্ট পণ্ডিত স্যার যদুনাথ যুক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবার অবকাশ না পেয়ে আশ্রম বিদ্যালয়ের পড়াশুনোর ধরনধারণ নিয়ে সমালোচনা করলেন এবং সম্ভবত ওই কারণেই বিশ্বভারতীর অভিভাবক-মণ্ডলীতে সদস্য হবার আমন্ত্রণপত্র প্রত্যাখ্যান করলেন। যদিও বিশ্বভারতীর কর্মসূচি আশ্রমবিদ্যালয়ের কর্মসূচি অতিক্রম করে ভারতবিদ্যার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যার মিলনসেতু হতে চেয়েছিল, বিশ্বভারতী কেন কলেজীয় শিক্ষার দিকে না গিয়ে নন্ এলিটিস্ট বিদ্যা ও কর্মের দিকে যাচ্ছে — হয়ত যদুনাথের এটাই ছিল প্রচ্ছন্ন অভিযোগ। যদি এ অনুমান সত্য হয় তবে বলা যেতে পারে — এমনতরো অভিযোগ করার পেছনে যুক্তি বা সাহস তাঁর ছিল না।

অনুমান নির্বিশেষে এমন বলা যায় যে যদুনাথ সরকারের চিন্তা সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত-মনের বিশ্বভারতী বিরোধী প্রতিক্রিয়া। ওই প্রতিক্রিয়ার জন্ম বাঙালি মধ্যবিত্ত-মনের বৃহত্তর দেশ অর্থাৎ পল্লীগ্রামের শ্রমজীবী মানুষদের মন থেকে বিচ্যুত এক শহরমুখী সংকীর্ণতার আঁতুড়ঘরে। ওই ধরনের প্রতিক্রিয়া ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তসমাজেই দেখা যায়, স্বাধীন দেশের মধ্যবিত্তসমাজে দেখা যায় না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথও প্রকৃত অর্থে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তবে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা কেন অন্য পথে গিয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাবে প্রথমে আলোচ্য বিষয় হবে বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজের মনের গোড়াপত্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। ওই ইতিবৃত্তের উপসংহারে বাঙালি মধ্যবিত্ত-মনের কোথায় রবীন্দ্রনাথের অবস্থান তা নির্ণয় করা যাবে।

বাঙালি মধ্যবিত্ত-মনের সামাজিক গোড়াপত্তনের ইতিবৃত্ত

আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ সমসাময়িক বাঙালি মধ্যবিত্ত-মনের গতি প্রকৃতি নিয়ে। কারণ সর্বকালে সকল দেশে মধ্যবিত্ত মনকেই নতুন আদর্শ, নতুন কর্মপ্রবাহ, পুরনো ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্যোগ নিতে দেখা যায়।

প্রথমেই যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটা হল যে-কোনও দেশের মধ্যবিত্ত মানুষ বনিক সমাজ বা শ্রমজীবী সমাজের মানুষের মতো মানুষ প্রজাতিরই অংশ। অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যবিত্তের বিত্ত আসে ধনিক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত বা শ্রমজীবী মানুষের পারিশ্রমিক থেকে। তবে মধ্যবিত্তের বিত্ত, যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক না কেন, সাধারণভাবে শ্রমজীবী মানুষদের প্রত্যক্ষ শোষণক্রিয়ায় সম্পত্তির মালিকের পরোক্ষ অনুচর হওয়া ছাড়া মধ্যবিত্ত-মন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে না। সম্পত্তির মালিকের পরোক্ষ অনুচরদের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। কেউ মালিকের অফিসে বড় আমলা, কেউ বা ছোট। তা ছাড়া অনেকেই সামাজিক অর্থনীতিতে বড় বা ছোট ব্যবসায় অথবা রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীন মুন্সেফ দারোগা বা উপরতলার কর্মচারী। আবার কেউ কেউ স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত — যেমন, ইঞ্জিনিয়র, উকিল, ডাক্তার শিক্ষকদের অংশ বিশেষ। সাধারণভাবে শারীরিক শ্রম দিয়ে জীবিকানির্বাহ মধ্যবিত্তের পেশা নয়, তাই কোনও না কোনও স্তরের মানসিক শ্রম এঁদের নেশা। উক্ত মানসিক শ্রমের বণ্টনব্যবস্থা, তার প্রকৃতি বৃহত্তর আর্থসামাজিক ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি। মানসিক শ্রমে অভ্যস্ত বলেই মধ্যবিত্তসমাজের মানুষ কখনও কখনও বিদ্রোহী হয় স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে, এমনকী সমাজ পরিবর্তনের উদ্যোগও তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। মধ্যবিত্তসমাজের অবস্থান তার মধ্যে দ্বৈতভাব নিয়ে আসে, একদিকে কখনও কখনও প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই নতুন সৃষ্টিকর্মে উদ্যোগী হয়, অন্যদিকে প্রচলিত ব্যবস্থাকেই ভেঙে ফেলার কাজে সচেষ্ট হয়।

উপরোক্ত দ্বৈতভাব শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অথবা বিত্তশালী ধনিক সমাজের মধ্যে থাকে না এমন নয়। বস্তুত মানুষপ্রজাতির

মধ্যেই ওই ভাঙাগড়ার প্রবণতা বর্তমান। এই ভাঙার কাজকে আমরা বিশ্লেষণের খাতিরে নেতিবাচক বা ধ্বংসাশ্রয়ী বলে আখ্যা দিতে চাই, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে এই ভাঙার কাজ নিছক নেতিবাচক অথবা গড়ার কাজের পূর্বশর্ত হিসাবে দেখা দিতে পারে। একই অর্থে ক্ষেত্রবিশেষে গড়ার কাজও নিছক অস্তিবাচক হয় না, সঙ্কীর্ণ স্বার্থদুষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তবে ব্যাপক অর্থে গড়ার কাজকে ক্ষেত্রবিশেষে অস্তিবাচক বা নির্মাণধর্মী বলে অভিহিত করা যায়। যেমন ধনিক সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির নির্মাণ কাজে যুক্ত থাকে, যাতে তার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ প্ররোচনা যোগায়। সমাজের অন্যান্য অংশের শ্রম দিয়েই এই নির্মাণ কাজ গড়ে ওঠে। একাজ সামাজিক আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অস্তিবাচক হয়ে দেখা দেয় না। কিন্তু কায়িক শ্রম দিয়ে যাঁরা শারীরিক অস্তিত্ব রক্ষা করেন, উক্ত শ্রম দিয়ে বাস্তব জগৎ গড়ে তোলেন, তাকে সামাজিক দিক থেকে নেতিবাচক বলা কঠিন, জীবিকাকেন্দ্রিক নির্মাণধর্মী কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তাঁরা সামাজিক মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন না। সৃষ্টিধর্মী কাজের সঙ্গে ওই সামাজিক মন বিচ্ছিন্নতাবোধে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এদিক থেকে বিচার করলে তাৎক্ষণিক অর্থে যেমন ধনিক সমাজ ভাঙার কাজকে তাঁর কল্পনাজগতের বাইরে রাখে, শ্রমজীবী সমাজও রাখে। দুই ভিন্ন কারণে, একটি সম্পদ আহরণের জন্য, অন্যটি জীবিকা সংগ্রহ করে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য। শ্রমজীবী সমাজ তাৎক্ষণিকতার অঞ্চল থেকে মুক্ত হতে পারে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাঙার কাজে এগিয়ে যেতে পারে, বিকল্প নির্মাণধর্মী আর্থ-সামাজিক অবয়ব যখন তাঁর চেতনায় মূর্ত হয়।

মানসিক শ্রমজীবী মধ্যবিত্তসমাজ যদিও বাস্তবে ধনিক শ্রেণীর উচ্ছিষ্টে লালিত হয়, তার মানসিক অবকাশ থাকে ভাঙার কাজে বা গড়ার কাজে এগিয়ে যাবার। উক্ত ভাঙা বা গড়ার কাজ মধ্যবিত্তের ব্যক্তি অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হয়। আবার আর্থসামাজিক স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে লিপ্ত হবার মানসিক অবকাশ অর্জন করে একমাত্র তখনই যখন স্থিতাবস্থা তাঁর চেতনার জগতে ভঙ্গুর হয়ে ওঠে।

কিন্তু যে তিনটি সামাজিক বিভাগে কোনও দেশের মানুষকে দেখানো হল, ওই বিভাগের জন্মকাল ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্মের সঙ্গে জড়িত। তাই মধ্যবিত্ত সমাজের আকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন। জমি যখন একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে কোনও সমাজে গণ্য হয়, উক্ত সমাজে শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যাধিক্য বেশি দেখা যায় এবং মধ্যবিত্ত মানুষদের অর্থাৎ উৎপাদন বিযুক্ত মানসিক শ্রমে নিযুক্তদের সংখ্যা খুব কমই থাকে। আবার উৎপাদন-পুঁজি সম্পত্তি বিকাশের যে স্তরে প্রাধান্য লাভ করে, ওই স্তরে শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়, দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা একটু বেড়ে যায় কারণ ওই স্তরে মানুষের শারীরিক শ্রমের বিকল্প হিসাবে যন্ত্রশ্রম সৃষ্ট হয়, ওই স্তরে কোনও না কোনও সামবায়িক শ্রমে নিযুক্ত মধ্যবিত্ত মানুষদের সংখ্যা বেড়ে যায়। আমরা শ্রমজীবী সমাজ বলতে সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত শারীরিক এবং আধা শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত মানুষদের সমাজের কথাই বলছি। মধ্যবিত্ত সমাজও বিচিত্র মানসিক শ্রম করে কিন্তু ওই শ্রম প্রায়শই কোনও সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত শ্রম নয়, বরং মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিক শ্রমের বিশেষ একটি অংশ যে কোনও স্তরের ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামাজিক, দার্শনিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত মানসিক শ্রম। এ কারণেই মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবিকা নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উপরোক্ত শ্রমজীবী মানুষদের যোগসাজসে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ওপর। কিন্তু যেহেতু মধ্যবিত্ত মানুষের অবস্থান উৎপাদনে নিয়োজিত যে কোনও স্তরের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধনিক মালিকের বিপরীত মেরুতে না হলেও স্বতন্ত্র, তাদের মানসিক অবস্থানও প্রথমোক্তদের মানসিক অবস্থান থেকে সাধারণভাবে ভিন্ন চরিত্রের হয়। ওই ভিন্ন চরিত্রের বশেই মধ্যবিত্তসমাজমানসে ধ্বংসাত্মক ও নির্মাণাত্মক প্রবণতার দ্বৈতভাব পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তবে ওই দ্বন্দ্ব নিরসনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় প্রচলিত পরিকাঠামোর অন্তরালে লালিত দর্শনের উত্তরাধিকার। মধ্যবিত্তসমাজমানস ওই উত্তরাধিকারে আচ্ছন্ন থাকলেও বাস্তব অবস্থার কার্যকারণ সম্পর্কে তার কোনও বিপ্লবাত্মক ধারণা সকল অবস্থায় আচ্ছন্ন থাকে না। অন্যদিকে আচ্ছন্ন না থাকলেও মধ্যবিত্ত সমাজের সকলেই ওই ধারণাকে বাস্তব প্রয়োগের পথে এগিয়ে আসে না, অনির্দেশ্য অনিশ্চয়তার পথে ঝাঁপ না দিয়ে স্থিতাবস্থাকেই মেনে নেয়। দার্শনিক কান্ট ওই মেনে নেওয়াকেই মধ্যবিত্তসমাজমানসের নাবালকত্ব (minority) বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইউরোপীয় মধ্যযুগের ওই নাবালকত্বকে জয় করেই মানসিক আলোকবর্তিকা বা এন্‌লাইটন্‌মেন্ট জন্ম নিয়েছিল। কান্টের ভাষায়: 'Enlightenment is the emergence of man from his self-imposed **minority.** His **minority** is [caused by] his incapacity to make use of his own understanding without the guidence of another. This **minority** is self-imposed; if its cause lies not in lack of understanding, but in lack of resolution and courage to make use of what is his without the guidance of another... "Have the courage to make use of your own understanding" is therefore the slogan of enlightenment.

...Laziness and cowardice are the reasons why so great a part of mankind, after nature has released them from alien guidance... are glad to remain minor all their lives and why it becomes so easy for others to set themselves up as their guardians. (বড় হরফ উদ্ধৃতির অংশ)[2]

যদিও কান্টের কথাগুলোর লক্ষ্য ছিল প্রধানত তাঁর সময়ের জার্মান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বা মধ্যবিত্তসমাজ, তিনি পুরো মনুষ্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হিসাবে কথাগুলো ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগের জার্মান জাতির কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে তিনি ব্যক্তির শুভবুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহসী ও শ্রমসাধ্য প্রয়োগকে এন্‌লাইটেনমেন্টের নির্ধারক হিসাবে রেখেছেন।

ইউরোপে যে অর্থে মধ্যযুগের অন্ধকারকে ভেদ করতে তৎকালীন ক্ষুদ্র মধ্যবিত্তসমাজে 'ব্যক্তি' জন্ম নিয়েছিল, ভারতবর্ষে অনুরূপ অর্থে ব্যক্তির জন্ম হয়নি কেন এ প্রশ্ন এসে পড়ে। একই ভাবে ইউরোপের মধ্যবিত্তসমাজ যে গতিময়তায় প্রাণচঞ্চল হয়ে অতীত ইতিহাসের আবর্জনা থেকে মনুষ্যত্বের আলো এবং যুক্তির উত্তরাধিকারকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল, ভারতবর্ষে কেন তা সম্ভব হয়নি — সে প্রশ্নও জরুরি হয়ে দেখা দেয়।

এই জবাব খুঁজতে গেলে ভারতীয় মধ্যবিত্তসমাজের জন্ম বৃত্তান্ত অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। যেহেতু বাঙালাদেশেই সর্বপ্রথম সাম্প্রতিক ইতিহাসের ভারতীয় মধ্যবিত্তসমাজ প্রথম জন্ম নিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ বাস্তব অর্থে বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজের গোড়াপত্তন কীভাবে হয়েছিল কোন কোন দিক থেকে পশ্চিম ইউরোপীয় মধ্যবিত্তসমাজের জন্মসূত্র থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের উৎপত্তির ইতিহাস আলাদা, তা তথ্য ও বিশ্লেষণের আলোয় দেখতে হয়। বর্তমান বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আলোচনা স্বাভাবিক কারণেই সংক্ষিপ্ত হবে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের বাঙালি তথা ভারতীয় মধ্যবিত্তসমাজ বলতে আমরা ইংরেজ শাসন-পরবর্তী ইতিহাসের কথা বলছি। বাঙলা দেশেই এই ইতিহাসের পদসঞ্চার প্রথম দেখা যায়।

আমাদের দেশে ইংরেজ-পূর্ব সমাজের চেহারা খুব ভাল ছিল, এমন মনে করার তথ্যসঙ্গত কোনও কারণ নেই। ব্রিটিশ-পূর্ব হিন্দুস্তানের অন্যতম অংশ বাঙলা দেশে অমৃতের পুত্রকন্যাদের মধ্যে কুসংস্কার ও পৌরাণিক জাতপাতের বৈষম্য সীমাহীন ছিল। এ সবই ঠিক। কিন্তু যাঁরা চাষবাস ও শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের সহজলভ্য প্রকৃতিদত্ত জমি বা পরিশীলিত শ্রমনৈপুণ্য উচু জাতপাতের কোনও প্রকার শাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণে বন্দি না থাকায় সমাজের বা রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় লোকজনও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুদান বা ট্রিবিউটে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য থাকতেন। 'জমিদার' বা তারও আগে 'সামন্ত' নামে অভিহিত যে শ্রেণী পল্লীগ্রামের পঞ্চায়েত থেকে ট্রিবিউট সংগ্রহ করতেন, তাঁর জীবিকার অস্তিত্ব নির্ভর করত ভাল উৎপাদনের ওপর। জমির অধিকার যার উপরেই ন্যস্ত থাকুক না কেন, ফসল উৎপাদনের শাশ্বত অধিকার গ্রামে শ্রমজীবী মানুষদেরই মাত্র ছিল। ফলে জীবিকার স্বার্থেই জমিদার, ব্যবসায়ী এবং পল্লী অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে এক ধরনের অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছিল। জমিদারের পুষ্করিণী খনন বা জলাশয় বা মন্দির নির্মাণ, ব্যবসায়ীর রাস্তাঘাট তৈরি করা আর শ্রমজীবী মানুষদের উৎপাদনের এক অংশ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ট্রিবিউট হিসাবে দেওয়া — সব কিছুই সামাজিক কর্তব্য ছিল। যে মুষ্টিমেয় অংশ আরবি ফারসি শিখে আইন আদালতের কাজ দেখতেন, জমিদারির বা নবাবের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখতেন, তাঁরা এবং চতুষ্পাঠী টোল মক্তব মাদ্রাসায় নিযুক্ত উচু জাতের পণ্ডিতরাও তখন একটি ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। যদিও পদস্থ ক্ষমতাবান বা বিত্তবানদের ইচ্ছায় তালিম দেওয়া বা মেজাজে সুড়সুড়ি দিয়ে রাজা, নবাব ও তাঁর অমাত্যদের মধ্যে মনোবল যোগানো বা হাস্যরস সৃষ্টি করা ওই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম কাজ ছিল, কোনও প্রকৃত অর্থেই তাঁদের ভূমিকা নবাব জায়গিরদার বা জমিদার বনাম গ্রামপঞ্চায়েতের কোনও বিবাদে বানরের পিঠে ভাগের কাহিনীতে দাঁড়িয়ে যায়নি। অর্থাৎ বাংলাদেশে কি মোগল আমলে বা সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ-পূর্ব নবাবি আমলে ক্ষীণকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোনও অর্থেই জমিতে দখলদারি মধ্যস্বত্ব ভোগ করতেন না। ইংরেজপূর্ব যুগে ওই উচ্চবর্ণ বাঙালি মধ্যবিত্তদেরও কঠিন মানসিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হত।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বা তারও একটু আগে আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পূর্বপুরুষগণ জন্ম নিতে আরম্ভ করে ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানিগুলোর দেশি দালাল সংগ্রহের সূত্রে এবং মূলত কোম্পানি আমলের নতুন নতুন অস্থায়ী বা স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থার কল্যাণে। বিশেষ করে বাংলাদেশে। অর্থনীতিবিদ বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির মতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যপুঁজির স্বার্থে ভূমিখাজনার প্রবর্তন বাংলাদেশে নতুন এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত এলিটের জন্ম দেয়। ওই এলিট শ্রেণীর জন্ম ক্ষেত্র হল নতুন গড়ে ওঠা বর্ণ হিন্দুপ্রধান তদানীন্তন বাঙালি মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী।[3]

পল্লী অঞ্চলের ওই জমিদার, তালুকদার বা পত্তনিদার নামে অভিহিত যে সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্থানীয় উদ্বৃত্ত ভূমিজ ফসল লুণ্ঠনের আইনি অধিকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে লাভ করে নতুন একদল মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করেন তাঁরা মার্কসীয় সূত্র অনুযায়ী ইউরোপীয় ভূস্বামীদের সমগোত্রীয় ছিলেন না। কারণ তাঁদের অধিকার ছিল শর্তাধীন। কোম্পানি প্রশাসন কর্তৃক জমির ওপর ধার্য কর ওরা যদি চাষিদের

কাছ থেকে সংগ্রহ করে না দিতে পারতেন তাঁদের জমির ফসলের অর্জিত অধিকারও বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। এর ফলে ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮২৫ সাল অবধি উচ্চবর্ণের অনেক জমিদার, তালুকদার এবং পত্তনিদার কোম্পানির দেওয়া ফসল লুঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নতুন নতুন ধরনের জমিস্বত্ব লাভ করে বাঙালি মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টির সামাজিক অবকাশ তৈরি করে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ওই মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকারের বৈচিত্র্য বেড়ে যায় ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন প্রবর্তনের পরিণামে। প্রশাসন অনুমোদিত জমিদার ও উৎপাদক চাষির মধ্যবর্তী নতুন নতুন মধ্যস্বত্ব সৃষ্ট হওয়ার ফলে অন্তত বাংলাদেশে নবজাত ওই মধ্যবিত্তসমাজ ক্রমাদ্বয়ে স্ফীত হতে থাকে।

বস্তুত জমিতে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অসংখ্য স্তরের একটি বিশেষত্ব ছিল, তা হচ্ছে বিনা কৃষিশ্রমে ফসলের কিছু না কিছু ভাগ পাওয়ার অধিকার অর্জন। আরেকটি বিশেষত্ব ছিল এই যে বাংলাদেশে মধ্যস্বত্বভোগী সমাজ থেকে যে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাদের পনেরো ভাগের অধিক ছিলেন বর্ণহিন্দু পরিবারের লোকজন। ঐতিহাসিক কারণে বাংলা দেশে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে শারীরিক শ্রমের প্রতি কঠোর বিতৃষ্ণা এবং বিমুখতার কুসংস্কার গড়ে উঠেছিল, ফলে বিদেশি শাসনের পরিস্থিতিতে সমৃদ্ধিলাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় বর্ণহিন্দু পরিবারগুলো শুধুমাত্র জমি থেকে মধ্যস্বত্বের আয়ের উপর নির্ভর না করে বিদেশি প্রশাসনের কোনও না কোনও বর্ণের কর্মচারী হিসাবে জীবিকার্জনের অন্যতম উপায় গ্রহণ করতে থাকে। অন্যদিকে যে সকল বর্ণহিন্দু পরিবার যৌথ পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় গ্রামাঞ্চলের মধ্যস্বত্ব থেকে উপযুক্ত পরিমাণ আয় অর্জনে অক্ষম হতেন, ওই পরিবারের তরুণ সদস্যগণ শহরে এসে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞানপত্র সংগ্রহ করে সরকারি বা সওদাগরি অফিসে চাকরি অথবা আইনব্যবস্থায় ও অন্য যে-কোনও স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত হবার চেষ্টা করতেন। বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা মধ্যস্বত্বভোগী পরিবারগুলির সন্তানসন্ততির মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভের বিভিন্ন কারণ ছিল ওইগুলো। ইংরেজ-পূর্ব আমলে বাংলাদেশের বর্ণহিন্দু ও সম্পন্ন মুসলমানদের মধ্যে টোল, চতুষ্পাঠী, মক্তব মাদ্রাসাই শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। তাদের স্থান ইংরেজ আমলে দখল করে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার স্কুল। রমেশ দত্ত বিভারলি সাহেবের ১৮২০ সালের বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আদমশুমারির ভিত্তিতে বাংলা ভাষাভাষী লোকসংখ্যার নিম্নলিখিত সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ দেন:*

উচ্চবর্ণের হিন্দু	২৫ লাখ	শতকরা অংশ	৬.৪৯
উচ্চবর্ণের মুসলমান	৫ লাখ	,,	১.২৯
হিন্দু আদিবাসী	৫০ লাখ	,,	১২.৯৮
অহিন্দু আদিবাসী	৫ লাখ	,,	১.২৯
নিম্নবর্ণের মুসলমান	১৭০ লাখ	,,	৪৪.১৯
নিম্নবর্ণের হিন্দু	১৩০ লাখ	,,	৩৩.৭৬
	৩৮৫ লাখ		১০০.০০

১৯২০ সালের বাংলাদেশের বর্ণভিত্তিক বৃহত্তর সমাজের বর্ণ ও ধর্মাবলম্বী সম্পর্কিত উপরে উল্লিখিত তথ্য শুধুমাত্র পরবর্তীকালের ব্রিটিশ ভারতের প্রথম আদমশুমারি কাল অবধিই অপরিবর্তিত ছিল এমন নয়, ১৯২১ সালের আদমশুমারির কাল অবধি উপরি উক্ত তথ্যচিত্রের বড় রকমের পরিবর্তন দেখা যায়নি। ১৯২১ সালের বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী থেকে উৎপন্ন হচ্ছিল এবং মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বাঙালি বর্ণহিন্দুদের আপেক্ষিক প্রাধান্য বজায় ছিল।*

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালি বর্ণহিন্দু প্রধান মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্তজগতে পরিবর্তন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ওই পরিবর্তনের প্রথম ধাপে ক্ষুদ্রাকৃতি এলিট শ্রেণীর শিক্ষিত উচ্চ বর্ণহিন্দু বাঙালি সমাজ পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও খ্রিস্টীয় মতবাদের প্রভাবে আলোড়িত হতে আরম্ভ করে। ওই আলোড়ন একদিকে যেমন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক অনুশাসনকে প্রশ্ন করে, অন্যদিকে সমাজে ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্ন বড় করে তুলে ধরে। ভারতীয় উপনিষদের চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থান নির্ণয়ে রামমোহন রায়ের ধর্মীয় যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গড়ে তোলা ব্রাহ্মধর্মের সূত্রপাত ওই সময়েই। কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের শিক্ষিত অংশের এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশমাত্র রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে। তার কারণ বাঙালি হিন্দু উচ্চবর্ণের সমাজে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্গত পৌত্তলিকতাবাদ এবং সামাজিক বর্ণভেদের কুসংস্কার বহু যুগ ধরে এতটাই ব্যাপক ও গভীর ছিল যে তাদের মধ্যে রামমোহন প্রচলিত ধর্মীয় যুক্তিবাদ কোনও বিপ্লব আনতে পারেনি। বাঙালি বর্ণহিন্দুদের সংখ্যা যদিও মোট বাঙালি জাতির মাত্র শতকরা ছয়ভাগের বেশি ছিল না এবং রামমোহনের আবেদন বৃহত্তর বাঙালি সমাজের নিম্নবর্ণের প্রমজীবী সমাজের চেতনার রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভে অসমর্থ হয়ে যায়, সামগ্রিকভাবে বাঙালি হিন্দুসমাজের চিত্তজগতে ব্রাহ্মধর্মের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা একটি পাদটীকার মূল্যও পায়নি। বৃহত্তর বাঙালি হিন্দুসমাজের মনে অর্থাৎ নিম্নবর্ণের হিন্দুশ্রমজীবী মানুষদের মনে বর্ণহিন্দুসুলভ সামাজিক কুসংস্কার ব্যাপক ছিল, ঐতিহাসিক দিক থেকে তাও বাস্তব নয়। এদিক থেকে মধ্যযুগের বাঙালি মনে চৈতন্যের ভক্তিবাদী আন্দোলন প্রমজীবী পল্লীবাসীদের মধ্যে যতটা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে সংহত করেছিল, তার মধ্যে

যুক্তিবাদের আবেদন ততটা ছিল না যতটা ছিল ভক্তিবাদের আবেদন। তাই রামমোহনের ধর্মীয় যুক্তিবাদের তুলনায় চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ বৃহত্তর বাঙালি মানসে তিন শতাব্দী আগে অনেক বেশি অনুরণন তুলেছিল। তা ছাড়া চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদের সঙ্গে কালক্রমে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটি আপোষরফা এ কারণেই ঘটেছিল যে চৈতন্যদেব পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ততটা বিদ্রোহ করেননি, যতটা করেছিলেন ভক্তের ভগবানকে আরাধনার মাধ্যম হিসাবে ব্রাহ্মণকে অস্বীকার করে। তাই ব্রাহ্মণের অনুশাসন পীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে চৈতন্যের ভক্তিবাদ যতটা প্রসার লাভ করেছিল, একই ভক্তিবাদ পৌরাণিক ধর্মীয় কুসংস্কারে আবদ্ধ উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে আদৌ ব্যাপকতা লাভ করেনি। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে চৈতন্যদেবের সমযকার আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত উনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিত থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই আলাদা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একটি জায়গায় চিহ্নিত করা যায়। চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদী আন্দোলনের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ছিল ঠিকই, অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তখন নিম্নবর্ণের হিন্দু গৃহস্থ এবং প্রমজীবী মানুষের জীবিকার্জনে সর্বনাশা পরিবর্তন থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু রামমোহনের সময়কার অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক সর্বনাশের প্রস্তুতিকাল।

উনবিংশ শতাব্দীর নিম্নবর্ণের বাঙালি সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রধান বিষয় ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আঘাতে পল্লী অঞ্চলে ছিন্নমূল প্রমজীবী সমাজের মরণবাঁচন লড়াই। প্রাক-কোম্পানি যুগে বাংলাদেশের জমিতে বিদেশি শাসক প্রবর্তিত ইউরোপীয় ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। ফলে জমিতে উৎপন্ন কৃষিদ্রব্যের বা গ্রামীণ শিল্পজাত দ্রব্যের সিংহভাগেই ছিল প্রমজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার। রাজশক্তিকে তাদের নিশ্চয়ই উপঢৌকন দিতে হত। কিন্তু কোম্পানি আমলে বিশেষ করে নতুন ভূমিব্যবস্থায় জমির মালিকানা বাস্তবে চলে গেল কোম্পানি প্রশাসনের হাতে। কারণ বিদেশ থেকে পুঁজি এনে বাংলাদেশের শিল্পজাত দ্রব্য কেনার বদলে নতুন ভূমি-ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় থেকে কোম্পানি তার বাণিজ্যপুঁজির ব্যবস্থা করেছিল। আগেই বলা হয়েছে কোম্পানি প্রশাসন রাজস্ব আদায়ের জন্য নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করল প্রধানত উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু সমাজের এক অংশের মধ্য থেকে এবং নতুন জমিদারকে জমির ওপর আপেক্ষিক মালিকানাস্বত্ব দিয়েছিল একটি শর্তে। শর্তটি হচ্ছে যতক্ষণ জমিদার কোম্পানি প্রশাসনকে চাহিদ ফসল আদায় করে তা থেকে দশভাগের নয় ভাগ দিতে পারবে, ততক্ষণই সে উদ্বৃত্ত ফসলের বাকি অংশের উপর দখলিস্বত্বের অধিকার ভোগ করতে পারবে, অন্যথায় বাঙালি জমিদারের ভূসম্পত্তি নীলামে বিক্রি হবে, সে আর ভূমিস্বত্বের বা উদ্বৃত্ত ফসলের উপর দখলিস্বত্বের অধিকারী থাকবে না। যেহেতু চাষযোগ্য জমি থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ নবাবি আমলের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং জমির আপেক্ষিক মালিকানা কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী নতুন নতুন জমিদারদের হাতে চলে গেল, রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণও প্রমজীবী চাষির ফসল যতটা পরিমাণ উৎপন্ন হত, তার পনেরো আনাই অলুম্ব করে আদায় করতে আরম্ভ করল। কোম্পানিকে খাজনা দিতে জমিদারের পাওনা ফসল বাড়াবার ওইটিই দাঁড়িয়ে গেল প্রচলিত ব্যবস্থা। এতে শুধু প্রমজীবী চাষির জীবনই মাত্র বিপন্ন হয়েছিল এমন নয়, গ্রামীণ শিল্পও গ্রামীণ ক্রেতার অভাবে ধ্বংস হতে আরম্ভ করল। শুধু তাই নয়, বাঙালি শিল্পপ্রমিকের দ্রব্যও কোম্পানির এজেন্টগণ স্বল্প মূল্যে বা জবরদস্তি করে বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল কোম্পানির বহির্বাণিজ্য এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যের স্বার্থে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মধ্য দিয়ে পল্লী অঞ্চলের বাঙালি চাষি প্রমিক ও শিল্পপ্রমিক মরণপণ লড়াই আরম্ভ করল বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশি প্রশাসন ও তার দেশি অনুচরদের বিরুদ্ধে। ওই সময়ের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অসংখ্য স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহের আগুন প্রমজীবী হিন্দু-মুসলিম ও আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজের মতে একদিকে যখন উচ্চবর্ণের বাঙালি মধ্যস্বত্বভোগী থেকে উৎপন্ন মধ্যবিত্তসমাজ পৌরাণিক ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিদেশি প্রশাসনের পাদদেশে চাকরি লাভের প্রতিযোগিতায় শশব্যস্ত ছিল, অন্যদিকে তখন গ্রামাঞ্চলের বাঙালি প্রমজীবী সম্প্রদায় নতুন ভূমিব্যবস্থার সর্বনাশা শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল দিকে দিকে। উনবিংশ শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহের (পরবর্তীকালে কোনও কোনও ঐতিহাসিক যাকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতাসংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন) প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল বিগত প্রায় একশো বৎসরের অসংখ্য স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহ।*

বাংলা দেশের উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন রামমোহনের মৃত্যুর পরে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যায়। ব্রাহ্মধর্মের অনুসরীগণ আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং নববিধান পন্থীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েন। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুসংস্কার অটুট রেখে উচ্চবর্ণের হিন্দুবাঙালি মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিখে জীবিকা অর্জনের এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনে অংশীদারত্ব লাভের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে পৌরাণিক পৌত্তলিকতা নবজীবন লাভ করে রামকৃষ্ণ পরমহংস

ও বিবেকানন্দের নতুনের ধর্মীয় উদারতার সঙ্গে অভূতপূর্ব মিশ্রণে সৃষ্ট নতুন ভক্তিবাদের পত্তন করে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ব্রাহ্মধর্মের ধর্মীয় যুক্তিবাদের পৌত্তলিকতা বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধ হিসাবে তাঁদের নতুন ধর্মীয় ভক্তিবাদকে পৌরাণিক ধর্মীয় কুসংস্কারের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা না করলেও তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম থেকে বিরত ছিলেন।

'মত তত পথে'র রামকৃষ্ণ ওই একদিকে যেমন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুসংস্কারের ও সামাজিক ভেদনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগধর্মী ব্যক্তিগত জীবনের জীবে প্রেম ও মানুষের সেবাকেই ঈশ্বরের আরাধনার প্রকৃষ্ট পথ বলে ঘোষণা করেছিল, অন্যদিকে পৌত্তলিকতার ধর্মীয় আরাধনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার প্রবণতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার বিরুদ্ধে কোনও সামাজিক আন্দোলনের দিকে যায়নি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের ভক্তিবাদী পক্ষপুষ্ট উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুসমাজ পৌত্তলিকতা বিসর্জনকে বা পৌরাণিক কুসংস্কার বা জাতপাতের ভেদাভেদ বিরোধী সামাজিক বিদ্রোহকে অমোঘ করে তোলেনি। বস্তুত এ কারণেই হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণে রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মের তুলনায় অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর রামকৃষ্ণ মিশন কিছু নিবেদিতপ্রাণ উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুর আত্মনিয়োগে গঠিত হয়। ওই মিশনের কোনও গুরুর কাছ থেকে কোনও পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসারী ব্যক্তি দীক্ষা নিতে পারতেন এবং মিশনের আয়োজিত দরিদ্র নারায়ণ ও আর্তসেবাকল্পে অনুদান দিয়ে নিজের সামাজিক গোঁড়ামি অক্ষুণ্ণ রাখার অমোঘিত পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারতেন। ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় কোনও নতুন সামাজিক ধর্মীয় পরিবর্তনের কার্যসূচির পথ এভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুসারীরা গড়ে তোলেন না, শুধুমাত্র ধর্মীয় গুরুশিষ্য পরম্পরাতেই তাদের অনুগামিগণ আবদ্ধ থাকার অবকাশ লাভ করতে পারতেন।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম বা রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্ম প্রধানত বাঙালি সমাজের শতকরা ছয় থেকে নয়ভাগ উচ্চবর্ণের হিন্দু মধ্যবিত্তদের আচরিত ধর্ম হিসাবেই প্রসারিত হয়, পল্লী অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রসারিত হয় না। এর ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে সকল লৌকিক ধর্ম ও অনুশাসন আচরিত হয়ে আসছিল তা স্বাধীন থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ আচারব্যবহার, সামাজিক অনুশাসন ও কুসংস্কারে একাত্মতাবোধে দীক্ষিত ছিলেন বলেই তাঁরা অভিহিত ছিলেন ভদ্রলোক হিসাবে আর শ্রমজীবী সমাজের দরিদ্র মানুষগণ ইংরেজি সংস্কৃতিতে অশিক্ষিত থেকে পৌরাণিক অনুশাসন ব্যক্তিগত সামাজিক জীবনচর্যায় অনুসরণ না করেও পরিগণিত হয়ে গেলেন অভদ্রলোক বা 'ছোটলোক' হিসাবে। ওই তথাকথিত ছোটলোকদের সমাজে সাংস্কৃতিক ধর্মীয় চেতনায় পুরাণ বন্দিত ঠাকুর ঠাকুরানিরা থাকে না, এমন নয়, কিন্তু তাঁদের সংগ্রামজর্জর জীবনের ধর্মীয় আরাধনায় কোনও প্রতিকারের প্রার্থনা যতটা থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে স্রষ্টার প্রতি অভিমান ও জীবনের অনিশ্চয়তাবোধ। লোকগীতির যে বিভিন্ন রূপ বৃহত্তর বাংলার পল্লী অঞ্চলে মুখে মুখে গড়ে উঠেছিল, লোকসংস্কৃতির যে বিচিত্র ধারা পূর্ববঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বা উত্তর দক্ষিণবঙ্গে স্বকীয়তার ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল তা ছিল মাটির কাছাকাছি হিন্দু ও মুসলমান শ্রমজীবী নিম্নবর্ণের বাঙালি অভদ্র লোকদের জীবনস্পন্দিত গান ও মায়ামমতাময় না নির্মোহ জীবন উপলব্ধির বন্দনা। ওই লৌকিক ধর্মাচরণে নিম্নবর্ণের হিন্দুর পুজোপার্বণ বা মুসলমানের নামাজের থেকেও বড় হয়ে ওঠে লালনগীর ও গাজির পট বা শেতলা ঠাকুর বা মনসা ঠাকুর। সেখানে উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ব্রাহ্মধর্মের যুক্তিবাদ বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে কোনও পরিশীলিত সুরেলা ধারা বেমালুম অনুপা হয়ে যায়।

বাঙালির বৃহত্তর সমাজ-মানসের ওই দ্বৈতধারার উৎপত্তি কবে থেকে ও কী কারণে ঘটেছিল, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা গবেষকরাই দিতে পারেন। তবে যে সুস্পষ্ট সত্য প্রকট হয়ে উঠেছিল তা হচ্ছে— উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ আমলে বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের মধ্যেই শ্রেণীবিভাজন উদগ্র হয়ে দেখা দিল এমন নয়। বস্তুত সামগ্রিকভাবে শহরবাসী ও পল্লীবাসীর চিত্তজগতে দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে উঠল। তবে শহরবাসী সকলেই বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দু। আর পল্লীবাসী সকলেই কৃষিজীবী নিম্নবর্ণের হিন্দু-মুসলিম শ্রমিক সম্প্রদায় এমন চিত্র উনবিংশ শতাব্দীতেও পুরোদস্তর বাস্তব ছিল না। শহরে যদিও অভিজাত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বসবাস ছিল বেশি, পাশাপাশি ছিল মুচি, মেথর, নাপিত, ধোপা প্রমুখ নিছক শারীরিক শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জনে নিযুক্ত বেশ কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দু। শহরে দেখা যেত এমনকী নিম্নবর্ণের অভিজাত ব্যবসায়ী ভদ্রলোক' এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে আসা অবাঙালি ব্যবসায়ী ও ছোট দোকানদার ও কুলিকামিন।' অন্যদিকে পল্লী অঞ্চলেও দেখা যেত হয় অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিক সঙ্কটে আবদ্ধ নতুবা জমিদার বা একদা তালুকদার অথবা পত্তনীদার বা জোতদার শ্রেণীর সচ্ছল কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু গৃহস্থ (যাঁদের এক পা থাকত শহরে, আরেক পা থাকত পল্লীগ্রামে)। উপরে উল্লিখিত ব্যতিক্রমধর্মীদের বাদ দিয়ে সাধারণভাবে পল্লী অঞ্চলে থাকতেন বিরাট সংখ্যায় নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী হিন্দু মুসলমান এবং অহিন্দু বা মুসলমান আদিবাসী সম্প্রদায়। বাংলাদেশে উচ্চবর্ণের মুসলমান ছিলেন। তবে ১৮২০ সালে বিভারলির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ঢাকা শহরে বসবাসকারী কিছু অভিজাত উচ্চবর্ণের মুসলমানদের বাদ দিলে বাকি উচ্চবর্ণের মুসলমানদের

অধিকাংশকেই পল্লীবাসী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমান করা যায়। তবে বিশেষ করে বাংলাদেশে অভিজাত মুসলমানগণ ইংরেজ প্রচলিত শিক্ষার দিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতো আকৃষ্ট হননি। বিভিন্ন গবেষক উচ্চবর্ণের বাঙালি মুসলমানদের ইংরেজ প্রচলিত শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট না হবার ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন এবং যুক্তি ও তথ্যের আলোয় কোনও কারণই বিতর্কাতীত নয়। তবে বাঙালি বৃহত্তর হিন্দুসমাজের ন্যায় বৃহত্তর মুসলমানসমাজেও ধর্মচিন্তা ও সামাজিক চেতনায় দ্বৈতধারা দেখা যায়। অভিজাত ভদ্রলোক মুসলমানদের সঙ্গে ছোটলোক মুসলমানদের একসঙ্গে নামাজ পড়া অন্তত পল্লী অঞ্চলে দেখা যেত না।

১৯০১ সালের আদমশুমারিতে বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দু বলতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের বোঝানো হয়েছে। উচ্চবর্ণের উপরোক্ত বর্ণগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে আবার নানারকম সামাজিক বিভাগ ছিল এবং আজও অনেকখানি রয়েছে। একই ভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও জাতাপাতের বিভেদ ছিল এবং এখনও অনেকখানি রয়েছে। ১৯০১ সালের আদমসুমারিতে প্রতিটি বর্ণের মধ্যে জাতপাতের বিভেদ নিয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে মোটা দাগের উচ্চবর্ণ বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানগণ বিদেশি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের চাকুরিতে কতটা ছিলেন তার আপেক্ষিক একটি ছবি উক্ত আদমসুমারিতে পাওয়া যায়। ছবিটি নিম্নরূপ।

এই সংখ্যাতাত্ত্বিক ছবি থেকে দুটো দিক স্পষ্ট হয়। প্রথমত বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে বাঙালি উচ্চবর্ণের বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের অংশ বৃহত্তর বাঙালিদের সমাজে শতকরা ছয় ভাগের বেশি কিছুতেই ছিল না। দ্বিতীয়ত, শহরবাসী মধ্যবিত্তসমাজ প্রধানত বর্ণহিন্দু প্রধান ছিল এবং সরকারি চাকুরির শতকরা ৭৮ ভাগ বর্ণহিন্দুদের আয়ত্তে ছিল।

তা হলে আমরা দেখতে পাই যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল অবধি উচ্চবর্ণের হিন্দুপ্রধান বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের পেশা বা জীবিকার উপায়, শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মাচরণ এবং চিন্ত ও চিন্তাজগত পল্লীবাসী শ্রমজীবী সমাজের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। শুধু তাই নয়, ইংরেজি শিক্ষা, প্রশাসন এবং সংস্কৃতির যে অংশ নিতান্তই পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরের দিক, উক্ত মধ্যবিত্ত সমাজের বড় অংশই ছিল তার বাঙালি ধারক ও বাহক।

শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার যুগে প্রতিষ্ঠাতা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মী সকলেই ছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজের লোক। ওই মধ্যবিত্তসমাজের একটিই ছিল বস্তুগত নির্ধারক, তা হচ্ছে— কায়িক শ্রম দিয়ে ওই সমাজের লোকজনদের জীবিকার্জন করা প্রায় নিষিদ্ধ, যেমন ভাবে কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জনে অভ্যস্ত ছিলেন পল্লীবাসী চাষি ও শিল্পীগণ বা যেমন কায়িক শ্রমে জীবিকার্জন করতেন শহরবাসী নিম্নবর্ণের মুচি মেথর ধোপা নাপিত এবং অভিজাত পরিবারের ভৃত্য, দাসদাসীগণ। অন্যদিকে শহর বা পল্লীতে বসবাসকারী বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজের অভ্যন্তরে বিত্ত ছিল খুবই অসমান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অনেকেই ভূস্বম্পত্তির মালিক বা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়ের মাধ্যমে বা প্রশাসনের পদস্থ কর্তাব্যক্তি হিসাবে প্রচুর বিত্তের অধিকারী ছিলেন, আবার অনেকেই ছিলেন সামান্য জমির গৃহস্থ মালিক অথবা শিক্ষক, করণিক বা ছোটখাট বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিয়োজিত স্বল্পবিত্তের লোক। বিত্তহীন বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্তও দেখা যেত শহরে বা পল্লী অঞ্চলে তবে ওই বৈশিষ্ট্যছিল নিছক ব্যক্তিক্রমধর্মী। জীবিকার্জনের নিমিত্ত বিত্তহীন বর্ণহিন্দুদের ইংরেজি শিক্ষাই ছিল অগত্যির গতি। শহরে বিত্তবানদের মধ্যে ওই প্রবণতা ছিল সমধিক। বিত্তশালী মধ্যবিত্তদের অভিজাত ভদ্রলোক বলা হত। উক্ত অভিজাত

১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাঙালি চাকুরেদের ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় নিযুক্তির বিন্যাস।

	ইংরেজ প্রশাসনে চুক্তিবদ্ধ পদে (Convenanted Post) এবং স্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তি সংখ্যা	প্রশাসনের নিম্নস্তরে নিযুক্তির সংখ্যা	প্রশাসনে মোট বাঙালির মধ্যে উক্ত নিযুক্তি সংখ্যার শতকরা অংশ	সমগ্র বাঙালি জনসাধারণের মোট সংখ্যার শতকরা কত অংশ বিভিন্ন জাতপাতে বিভক্ত ছিল।
১. ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ	২২	১১০৪	৮০.২	৫.২
২. নিম্নবর্ণের হিন্দু	০	১৩১	৯.৫	৪১.৮
৩. উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মুসলমান	৩	১৪১	১০.৩	৫১.২
	২৫	১৩৭৬	১০০.০	৯৮.২

ভদ্রলোকদের মধ্যে নিম্নবর্ণের হিন্দু পাওয়া যেত না এমন নয়, তবে গড়পড়তা হিসাবে মধ্যবিত্তসমাজের বিশেষাংশ অংশে বর্ণহিন্দুর প্রাধান্যই ছিল এবং বিত্তহীন বা স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্তদের মধ্যেও নিম্নবর্ণের হিন্দু খুব কম ছিল। তবে তাঁরা অর্থাৎ স্বল্পবিত্তের মধ্যবিত্তগণ অভিজ্ঞাত ভদ্রলোক হিসাবে পরিগণিত হতেন না, তাঁরা শুধু ভদ্রলোক বিশেষণে বিশেষিত হতেন। স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকেরা কায়িক শ্রমেই শুধু বিমুখ ছিলেন এমন নয়, একালতি ছাড়া অন্য কোনও স্বাধীন ব্যবসায়েও এগিয়ে যেতেন না। হয় সরকারি প্রশাসনে নতুবা প্রধানত বিদেশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকরিলাভ অথবা নিদেন পক্ষে ইংরেজি স্কুলে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করা বা ওকালতি ব্যবসায় করা ভদ্রলোকের মান বজায় রাখার উপায় বলে মনে করতেন। এভাবেই বাঙালি মধ্যবিত্ত মনে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাহিদা এমনকী সমকালীন লন্ডন শহরের মধ্যবিত্ত সমাজের তুলনায় বেড়ে যায়।[১০]

আগেই বলা হয়েছে, বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সমাজে ভদ্রলোক শ্রেণীর একমাত্র নির্ধারক ছিল কায়িকশ্রমের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং ফলে উক্ত প্রকার শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জনের প্রতি বিমুখতা। অভদ্র বাঙালি সমাজ কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হত, সে কারণেই তাঁদের ছোটলোক হিসাবে গণ্য করা হত।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সমাজে ভদ্রলোক হবার একমাত্র উপায় ছিল কায়িকশ্রমের দ্বারা জীবিকার্জনের পথ পরিহার করে জীবিকার্জনে সক্ষম অথবা অন্যের কায়িক শ্রমের ফসল থেকে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থায় সিদ্ধিলাভ করা, একথাও আগেই বলা হয়েছে।

যা বলা হয়নি তা হচ্ছে কায়িক শ্রমে বিমুখ বর্ণহিন্দু যৌথপরিবারে অধিকাংশ স্ত্রীলোককে পারিবারিক কাজে কায়িক শ্রম করে জীবন কাটাতে হত। সুতরাং যা ভদ্রলোক শ্রেণীর পুরুষজাতির জীবিকা অর্জনের নির্ধারক ছিল, বাঙালি স্ত্রীজাতির ব্যাপারে তা নির্ধারক ছিল না। একমাত্র অভিজাত ভদ্রলোক পরিবারের স্ত্রীলোকদের হাত দাসদাসীর কায়িকশ্রমের ওপর নির্ভর করবার অবকাশ ঘটত। ফলে সাধারণ বাঙালি ভদ্রলোক পরিবারের পুরুষ জাতিরই ছিল কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা। যেহেতু সাধারণ ভদ্রলোকদের পরিবারস্থ মহিলাদের পরিবারের বাইরে স্বাধীন জীবিকার্জনে নিযুক্ত হওয়া সামাজিকভাবে বারণ ছিল এবং পরিবারস্থ পুরুষদের কায়িক পরিশ্রম করে সেবা করাই তাঁদের রীতি ছিল, সে অর্থে বাঙালি বর্ণহিন্দু প্রধান মধ্যবিত্তসমাজে ভদ্রলোকগণ বস্তুত পুরুষসমাজের প্রতিনিধিত্ব করতেন। অভদ্র বাঙালি সমাজে অর্থাৎ নিম্নবর্ণের হিন্দু পরিবারে বা মুসলমান পরিবারে স্বাধীন জীবিকার্জনে নিযুক্ত থাকা বিশেষ করে কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকার্জন পুরুষ ও রমণী উভয়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। পুরুষ প্রাধান্য মধ্যবিত্ত সমাজের উচ্চবর্ণে বা এমনকী নিম্নবর্ণের সচ্ছল অংশে যতটা ছিল, গ্রামীণ শ্রমজীবী সমাজের মধ্যে অহিন্দু অমুসলমান আদিবাসী সমাজে তা একেবারেই ছিল না। গ্রামীণ শ্রমজীবী সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে পুরুষ প্রাধান্য আদৌ দেখা যেত না এমন নয়, তবে তা ছিল ব্যতিক্রম। এক কথায় বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারে পুরুষজাতির মধ্যে কায়িক শ্রমবিমুখতা এবং পরশ্রমের ওপর নির্ভরশীলতার নিয়ামক যানিকটা সংস্কৃতিগত কারবারে ছিল প্রধানত আর্থিক সচ্ছলতার স্তরভেদ। বাঙালি সমাজের মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক অংশ ছিল পুরোদস্তুর পুরুষশাসিত, স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত অংশও পুরুষশাসিত সমাজের পক্ষপুটে ছিল গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ। একই সময়ে নিম্নবর্ণের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অংশেও ছিল পুরুষপ্রধান ব্যবস্থার অনুশাসন, কিন্তু কায়িক শ্রমের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নিম্নবর্ণের বৃহত্তর অংশে ও আদিবাসী সমাজে ওই অনুশাসন কার্যকরী হতে পারত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বর্ণহিন্দু প্রধান মধ্যবিত্তসমাজের পুরুষদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞার উল্টোপিঠে একই সমাজের স্ত্রীজাতির কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীলতার পাশাপাশি নিম্নবর্ণের বাঙালি সমাজের কায়িকশ্রমের ওপর নির্ভরশীলতা ইংরেজ শাসনের এই যুগে পরিপূর্ণতি লাভ করে। ওই পথেই সামগ্রিকভাবে ইংরেজশাসন তদানীন্তন বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজের পরশ্রমজীবী প্রবণতাকে শক্তিশালী করে তোলে। ওই পরশ্রমজীবী সংস্কৃতি থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিলেন বাঙালি শ্রমজীবী জনসাধারণ, কারণ তাদের পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল কায়িকশ্রম।

১৮৭২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল অবধি ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবস্থায় আংশিক রদবদল শুরু হয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলনের চাপে। ওই সময়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজের এক অংশ যেমন কৃষিদ্রব্যের প্রসারিত ব্যবসায়, সুদের ব্যবসায়, তেজারতি ও বন্ধকি ব্যবসায়ের কল্যাণে অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যবিত্তসমাজে অনুপ্রবেশ করতে পারে, তেমনই ভূমির ওপর মধ্যস্বত্বের অধিকারীও হয়ে ওঠে। যদিও অতীতে তাঁরা শ্রমজীবী সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে পূর্ববঙ্গের কৈবর্ত ও তাঁতি সম্প্রদায়, পশ্চিমবঙ্গের উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, মাহিষ্য, মাহাতো, রাজবংশী প্রমুখ কৃষিশ্রমে নিযুক্ত জাত বা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যায়। একদিকে শ্রমজীবী সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশ যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যবিত্তসমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে ইংরেজ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার অংশীদারত্ব লাভ করে, অন্যদিকে নিম্নবর্ণের জাতপাত বা সম্প্রদায়ের বাকি অংশের ওপর শোষণ ও বঞ্চনার চাপ আগের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে যায়।

উপরোক্ত অভাস্তরীণ পরিবর্তন সত্ত্বেও বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ প্রধানত পুরুষশাসিত সমাজের অনুশাসন ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত থাকে ও বর্ণহিন্দু প্রধান চরিত্র অটুট রাখে। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট নয়। অন্য যে কোনও স্বাধীন দেশে মধ্যবিত্তসমাজ গড়ে উঠেছিল প্রচলিত ভূমিস্বত্বাধিকারী শ্রেণীতে ভাঙন এবং বাণিজ্যপুঁজির স্বাধীন বিকাশ হেতু পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদক পুঁজির অভ্যুত্থানের পরিণামে। তাই যে কোনও স্বাধীন মধ্যবিত্তসমাজ নতুন মূল্যবোধ নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োজনায় নতুন জাতীয়তাবোধে অগ্রণীর ভূমিকায় চলে আসতে সক্ষম হত। কিন্তু বাঙালদেশে কোম্পানির আমল থেকে যে নতুন ধরনের মধ্যবিত্তসমাজ জন্মগ্রহণ করেছিল এবং কালক্রমে স্থায়ীত্বলাভ করেছিল তা উৎপন্ন হয়েছিল ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থে উৎসর্গীকৃত ভূমিব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর আঁতুড়ঘরে। ওই মধ্যবিত্তসমাজে লালন-পালন ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দোলনায় চেপে। এদিক থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের সত্তাপরিচয় বাঙালি বৃহত্তর সমাজের মধ্যে ছিল না, ছিল শাসককুলের পদমর্যাদা এবং ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত সঙ্কীর্ণ সামাজিক সত্তাপরিচয়ের নিরিখে। ওই সত্তাপরিচয়ে বাঙালিত্ব থাকে শুধু মাতৃভাষার দৈনন্দিন অবলম্বনে, আর কোথাও নয়। ওই সত্তাপরিচয় শুধু ভদ্রলোকদের মধ্যে। অর্থাৎ মধ্যবিত্তসমাজের একতলার বাসিন্দা থেকে আরম্ভ করে বহুতল ভদ্রলোক সমাজে সামাজিক সত্তাপরিচয় বৃহত্তর বাঙালি কায়িক শ্রমজীবী সমাজের মন ও মনন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বৃহত্তর সমাজের অধিকাংশই হয়ে যেতেন কায়িক শ্রমজীবী, ভদ্রলোক সমাজে অধিকাংশই হয়ে যেতে থাকেন মানসিক শ্রমজীবী এবং পরশ্রমজীবী। এ বিভাজন নবাবি আমলে ছিল দুর্বল ও ক্ষীণকায়। ইংরেজ আমলে ওই ভদ্রলোক সমাজই অনেকখানি শক্তি ও সংহতি লাভ করেছিল। যতটা ইংরেজ প্রশাসনের দৌলতে তার চেয়েও অধিক ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলজনিত বিষক্রিয়ায়। নবাবি আমলের পরে কায়িক শ্রমে বেঁচে থাকতে বাধ্য হন এমন শ্রমজীবী মানুষের বাঁচার স্বাধীনতা যখন অপহৃত হল তাদের জারি গান, কথকতা পাঁচালি বা যাত্রাগান বা কীর্তন শহরের উপকণ্ঠ থেকে অন্তর্হিত হয়ে স্থান পেল বিপর্যস্ত পল্লী অঞ্চলের প্রত্যন্ত প্রদেশে। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতকের মাঝামাঝি অবধি ছোটলোকদের সমাজও বহুতল হয়ে গেল। বাঙালি ভদ্রলোকদের

সমাজে বেঁচে থাকার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ইংরেজ আমলের আগে কোনও হত পল্লীবাসী কায়িকশ্রমজীবী সমাজের সঙ্গে একই সত্তাপরিচয়ের মাধ্যমে, তাদের পরশ্রমজীবী প্রবণতা ইংরেজ আমলে অনেক বেশি সার্বভৌম নিশ্চয়তা পেল ও বৃহত্তর সত্তাপরিচয়কে অস্বীকার করে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধার করে। কিন্তু ছোটলোকদের সমাজ অর্থাৎ বাঙালি বৃহত্তর সমাজ তার জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা হারিয়ে তার সামাজিক সত্তা পরিচয়কে নতুন পরিস্থিতিতে অনেকখানি বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে দিল। বিপর্যস্ত শ্রমজীবী সমাজে ব্যাপক হয়ে দাঁড়াল ভদ্রলোক সমাজের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরতা। জীবিকার্জনের বিপর্যয় তাঁদের মধ্যে নিয়ে এল আত্মশক্তিহীনতা।

উপরোক্ত ওই ভদ্রলোক সমাজ শতকরা দশভাগের কম বাঙালি ভাষাভাষী নিয়ে পরশ্রমজীবীর নতুন ব্যবস্থায় সংহত হয়ে গড়ে তুলল ঔপনিবেশিক বাঙালি মধ্যবিত্তসমাজ। ওই মধ্যবিত্তসমাজই ইংরেজ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে গোটা বাঙালি বৃহত্তর সমাজের মন ও মননের ষোল আনা প্রতিনিধি রূপে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আত্মপ্রকাশ করল। শতকরা নব্বই ভাগ বাঙালি ছোটলোকদের সামাজিক সত্তা-পরিচয় শোষণ ও বঞ্চনার মধ্যে নিমজ্জিত থেকে ক্রমশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাদের বাঙালিত্ববোধও নিমজ্জিত হয়ে গেল বিচিত্র আঞ্চলিক এবং অভাস্তরীণ জাতপাতজনিত সংকীর্ণতাসর্বস্ব ভেদাভেদের অন্তরালে। এখানেই ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তসমাজের সঙ্গে স্বাধীন জাতিসত্তাগুলোর সমাজবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন মধ্যবিত্তসমাজের পার্থক্য।

প্রসঙ্গ সূত্র :

১. ওই চিঠিগুলোর উদ্ধৃতি সহ ওই পরিবর্তনের বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।

২. Paul Rabbe / William Schmidt, Biggerman (সম্পাদিত) **Enlightenment in Germany** (a collection of articles) Trans. by P. Crampton (Verlag, 1979) পৃ: ৯-১০

৩. মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর জন্ম কী অবস্থায়? অর্থনীতিবিদ গাঙ্গুলির মতে, 'In the Easterm region [of India] at least, the Company's image as an enterprising body of traders was a familiar one. Even before 1757, the enterprising body of middle class had collaborated with the East India Company as functionaries, commission agents of intermidiataries and even as financiers and partners in business more or less on equal terms.

In his letter to Drake (**India tracks**) dated 27, August,

1754 ...Holwell was particularly worried about the middle class Bengali officials of the company's Zamindari estates whom he described as "these Eastern Machiavels in finesse whom it is difficult to counter." In another context he complained that they entered into partnership with the company's officials for enriching themselves by private trading at the expense of the company. As the result of the changes in the agrarian system introduced by the Company's administration later [i.e. Hestings' temporary settlement, Cornwallis' permanent settlement etc.], members of this new middle class in Bengal and the "Northern Provinces" became land speculators and [auction] purchasers of land in the rural area. They also became the new-style money lenders and grain merchants in place of traditional members of these professions'.

B.N. Ganguli: **Indian Economic Thought: Nieteenth Century**
Perspective (New Delhi, 1977) Part II, Ch. 2, পৃ. ৩০

৪. R.C Dutta. **The Peasentry of Bengal** (First Published 1874, 2nd edn, Calcutta 1980), পৃষ্ঠা ৭—১৮

৫. ওমালির ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে ১৯০১ সালের বাঙলাদেশের জনসংখ্যার জাতপাতের বৈচিত্র্য বিভারলির ১৮২০ সালের আদমশুমারির মতো দেখা যায় না। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করে ওমালি দেখিয়েছেন—হিন্দুদের সংখ্যা চার কোটি বাহান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার, আর মুসলমানদের সংখ্যা পাঁচ কোটি তেইশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার। তবে জীবিকার ভিত্তিতে যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক খানিকটা অনুমান করা যায়। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জীবিকা ছিল মানসিকশ্রমপ্রধান। সেদিক থেকে তাঁদের নিযুক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল ব্যাঙ্কে ও মহাজনি ব্যবসায়ে, দালালগিরি ও কমিশনের বা রপ্তানির ব্যবসায়ে, প্রশাসন দপ্তরে, আইন ব্যবসায়ে, চিকিৎসা ব্যবসায়ে, শিক্ষকতায় এবং বেসরকারি দপ্তরে কেরানিগিরির কাজে। ১৯০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উপরোক্ত কাজে হিন্দুদের নিযুক্তি মোট হিন্দু জনসাধারণের এক দশমাংশের চেয়ে অনেক কম। প্রতি দশহাজার হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে কৃষিজীবী, মৎস্যচাষ বা খনির কাজে এমন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আনুপাতিক সংখ্যাও ছিল মুসলমানদের সংখ্যায় অনেক কম।

দ্রষ্টব্য: O'Malley D.S., Census of India 1911, Vol. V, Bengal Bihar Orissa and Sikim, Part I, Report, Calcutta-1913 পৃঃ ৫৮১–৫৮৪

৬. তদেব, রমেশ চন্দ্র দত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮০, নরহরি কবিরাজের ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ii-Liii

৭. কলকাতা শহরে নিম্নবর্ণের হিন্দু সুবর্ণবনিকদের কেউ কেউ অভিজাত ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রতাপে। উক্ত অভিজাত ভদ্রলোকদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল শীল, বর্ণানুযায়ী তিনি সুবর্ণবনিকরূপ শুদ্র। আরেকজনের কথা মনে পড়ে। তিনি হচ্ছেন গোরাচাঁদ বসাক। এঁর বর্ণানুযায়ী অবস্থান হচ্ছে তাঁতিরূপ শুদ্র।

৮. ১৮৮১ সালে ব্রিটিশ ভারতের সরকার প্রথম আদমশুমারি প্রবর্তন করে। প্রথম আদমশুমারিতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কলকাতার জনসংখ্যা ছিল সাত লক্ষ নব্বুই হাজার দুশো ছিয়াশি (৭, ৯০, ২৮৬)। এদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরও কম লোকের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ওই সংখ্যার শতকরা ৪৭.৬ ভাগ আসতেন বিহার, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুর থেকে। বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশের (শতকরা ২৫.৫ ভাগের) জন্মস্থান ছিল কলকাতায়, বাকি প্রায় তিনি চতুর্থাংশের জন্মস্থান কলকাতার বাইরে অর্থাৎ পল্লী অঞ্চলে বা অন্য প্রদেশে প্রবাসী বাঙালি পরিবারে। পাশাপাশি আরেকটি চিত্রও পাওয়া যেত। তা হল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র, তীর্থস্থান এবং বন্দর শহরের নিকটবর্তী পল্লী অঞ্চলে নবাবি আমল বা তার পূর্বে আগত অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত পরিবারদের বাঙালি ভাষাভষী জনসাধারণে অনুপ্রবেশ।

৯. ১৯৩১ সালের আদমশুমারি, ষষ্ঠ ভাগ, পৃ. ৪৮৬ এবং ৫০৬।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে আদিবাসী (হিন্দু বা অহিন্দু) জনসাধারণকে আলাদা করে দেখানো হয়নি। সম্ভবত তাঁদের নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কারণ ১৮২০ সালে বিভারলী রিপোর্টের যে হিসাব রমেশ দত্ত দিয়েছেন, তাতে বাঙলি মুসলমানদের সংখ্যা ধরা হয়েছিল শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ, নিম্নবর্ণের বাঙালি হিন্দুদের সংখ্যা ধরা হয়েছিল মাত্র শতকরা ৩৪ ভাগ। আশি বৎসরের মধ্যে একদিকে এঁদের শতকরা অংশ যথাক্রমে ৬ এবং ৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যদিকে আদিবাসীদের সংখ্যার শতকরা ভাগ ১২.৯ ভাগ থেকে শতকরা ০.৮ ভাগে নেমে এসেছে—এ সম্ভাবনাও বাস্তব নয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙালি বৃহত্তর সমাজের যে এক তৃতীয়াংশ মারা গেছেন তারা প্রায় সকলেই আদিবাসী ছিলেন এমন কথাও কোনও ঐতিহাসিক তথ্যে পাওয়া যায় না। তাই বিভারলি রিপোর্ট বা ১৯০১ সালের আদমশুমারির তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা উভয় গণনায় কাছাকাছি রয়েছে। ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রশাসনে নিযুক্তির তথ্য নির্ভরযোগ্য সন্দেহ নেই, কারণ এর সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব তৎকালীন প্রশাসনিক দপ্তর থেকে সংগৃহীত। তুলনামূলক আলোচনার জন্য : J.H. Broomfield: **Elite Conflict in a Plural Society: Twentinth Century Bengal**, Barkeley, 1968, পৃ. ৫–১২

১০. তদেব, পৃ. ৫২–৫৩ (পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

রাইহান স্যারের গল্প

বেণু দত্তরায়

ছোটবেলায় আমাদের ইস্কুলে যাবার জন্যে বাস আসত না। ভোর-ভোর শীত-সকালে মা-র হাত ধরে বাড়ি থেকে কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হত না বাসের অপেক্ষায়। আমাদের কালটা ছিল ভারী অদ্ভুত। বাস্তবিক কী আশ্চর্য বদলে যায় সময়!

চোখ বুজে মনে-মনে দেখছি, সে বড়জোর ঘোড়ার গাড়ির যুগ। কিন্তু ঘোড়ার গাড়িতে তো আর ইস্কুলে যাওয়া হত না। আমাদের ইস্কুলে যাওয়া ছিল পায়ে হেঁটে। পড়াশুনোর চাপ খুবই ছিল। ধৈর্য ধরে খেটে কঠোর পরিশ্রমে পড়াশুনো করতে হত। কিন্তু এ-কালের মতো আমাদের শিশুকালটা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়নি। খেলার মাঠ ছিল, বন্ধু-বান্ধব ছিল, ডাংগুলি খেলা ছিল। আমরা পুকুরে সাঁতার কেটেছি, ঘুড়ি উড়িয়েছি। তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়াশুনোও করেছি। ক্লাসে উপস্থিত তো খেলার মাঠে অনুপস্থিত, তার জন্যে এক-আনা ফাইন নির্দিষ্ট ছিল। একান্নবর্তী পরিবারের ঠাকুমা-ঠাকুর্দা, জ্যাঠা-জেঠি কাকা-কাকিদের শাসন যেমন ছিল, তেমনই মাস্টারমশাইরাও ছিলেন আদর্শ শিক্ষক।

ছোটবেলায় আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের দু'তিন ভাইকে যিনি পড়াতে আসতেন, তাঁর নাম রাইহান সাহেব। চোখ বুজলে এখনও তাঁর চেহারা মনে জাগে। ছোট-খাটো মানুষটি, কিন্তু চাল-চলন চেহারা-চরিত্র ছোট না। শেরওয়ানি পাজামা ফেজটুপি কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি। চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা। পায়ে থাকত চটি। সব মিলিয়ে ধীর-স্থির, সৌম্য-প্রশান্ত মানুষ।

আমার জ্যাঠামশায়ের বন্ধু। বাল্যকাল থেকে একসঙ্গে পড়াশুনো করেছেন। জ্যাঠামশাই ছিলেন মফঃস্বল সহরের কৃতবিদ্য সরকারি উকিল। ভারী রাশভারি স্বভাবের মানুষ। তাঁর বৈঠকখানা সব-সময় মানুষজনে ঠাসাঠাসি। জুনিয়র উকিল-মক্কেলদের ভিড়। ঘরভর্তি বাঁধানো আইনের বই। যতক্ষণ তিনি থাকতেন, ততক্ষণ তাঁর অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া উঠত। সে ঘোর ইংরেজ আমল। তবু সাহেব-সুবোদের কাছেও তাঁর ছিল আলাদা ইজ্জৎ।

তা বলে রাইহান সাহেবকে কিন্তু আমরা কোনওদিন নেশা করতে দেখিনি। আমাদের মা-জেঠিদের সঙ্গে ছিল তাঁর আলাদা সম্পর্ক। জ্যাঠামশায়ের তামাক টানার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তবু জেঠিমাকে বলতেন, ভাবিজি, সে তো আর আমার মতন মুখ্যু ইস্কুলের মাস্টারমশাই নয় যে—

ইস্কুলের মাস্টাররা বুঝি মুখ্যু হয়? জেঠিমা মুখ টিপে-টিপে হাসতেন।

সে কথার জবাব না-দিয়ে রাইহান বলতেন, সব মাস্টার মুখ্যু হয় কিনা জানি না। মাস্টার থেকেও কেউ কেউ বড়মানুষ হয়েছেন—উকিল মোক্তার ডাক্তার নেতা—কিন্তু এ অধম একেবারেই মুখ্যু।

তা মুখ্যুমশাই, আপনার বন্ধুটি সারা দিনরাত্রি এমন ধোঁয়া খান কেন?

তাঁকে যে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে হয়, ভাবিজি! রাইহানের হাসিমুখে অবিচলিত উত্তর—আমি আপনি নিজেদের নিয়ে থাকি, জগুকে যে সকলকে নিয়ে থাকতে হয়, শরণাগতকে বাঁচাবার কথা ভাবতে হয়। তাই তার কথা আলাদা।

জ্যাঠামশাইয়ের নাম ছিল জগন্ময়। রাইহান তাঁকে জগু বলে সম্বোধন করতেন। দুই মধ্যবয়সী মানুষের দেখা-সাক্ষাৎ হত নিরালায়। প্রায়ই রাত্রে। আমাদের পড়িয়ে ফিরবার সময় কখনও সে-ঘরে একবার সাক্ষাৎ দিয়ে যেতেন। জ্যাঠামশাইয়ের সাগ্রহ গলা শোনা যেত—এসো, এসো হে!

বসতে বসতে হয়ত রাইহান বলতেন, ভয় পাই হে।

কীসের ভয়?

বুদ্ধির প্যাঁচে না পড়ে যাই! শিকারি বেড়ালের মতো এমন গোঁফ মোচড়াচ্ছিলে যে — রাইহান সাহেবের কথার উত্তরে জ্যাঠামশাই একসময় এত উচ্চহাস্য করতেন যে, ঘর গমগম করতে থাকত।

এ-ঘরে বাবা মাকে বলতেন, এত বয়সে দুই মানুষের শৈশব কেমন ফিরে আসে দ্যাখো!

মা তদুত্তরে বাবাকে বলতেন, তোমার মতো অকালবৃদ্ধ তো না।

বাবা বলতেন, আমিও তাই ভাবি। দাদার বুদ্ধির কথা সকলের মুখে-মুখে। অথচ রাইহানদাদার সঙ্গে দেখা হতেই তাঁরা একেবারে শৈশবে ফিরে আসে।

সেই জ্যাঠামশাই আমাদের পড়াবার দায়িত্ব রাইহান সাহেবের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজি ও ইতিহাসের টিচার ছিলেন তিনি। শিক্ষক হিসেবে ছিলেন অসাধারণ। বাক্তি হিসেবেও শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক। আমাদের বাড়ি থেকে তাঁর বাড়ি ছিল বেশ দূরে। শহর-প্রান্তে গ্রামের কাছাকাছি থাকতেন। তবু তাঁকে পড়াতে আসতে হত। কারণ জ্যাঠামশাইর অনুরোধ তিনি এড়াতে পারতেন না। প্রতিদিন ঠিক সন্ধেবেলায় আসতেন। ঘড়ি ধরে আমাদের অঙ্ক-ইংরেজি ইতিহাস-ভূগোল পড়াতেন। মনে আছে আজও সেই শেরওয়ানি ফেজটুপি। খুবই নিচু-গলায় পড়াতেন। ফেরার পথে কখনও একবার টুঁ মেরে যেতেন বন্ধুর ঘরে।

দুই বন্ধুতে রসিকতা হত তখন। ডাকসাইটে উকিল প্রশ্ন করতেন, কেমন পড়ছে ছেলেরা?

রাইহান বলতেন, ভাল।

তোমার হাতে ভাল হবারই কথা।

একটু পরে জ্যাঠা আবার প্রশ্ন করতেন, এই টুপিটা পরে থাকতে মাথা গরম হয় না?

এই সময় নিচু গলায় রাইহান বন্ধুকে কী বলতেন ভাল বোঝা যেত না। জ্যাঠাবাবুর গলা আবার শোনা যেত, ছেলেবেলায় এই টুপি কোথায় ছিল?

বলে দুই-দুই হাসতেন। ঘরে যদি কেউ থাকত তবে তারাও উপভোগ করত দুইবন্ধুর বাক্যালাপ। যে-লোকটা টানাপাখা টানত, এইসময় সে আবার জোরে জোরে টানতে থাকত।

টুপিটা খোলো, বন্ধু। মাথায় দু'গুণ হাওয়া লাগাও।

মাথা কি কোথাও আছে যে হাওয়া লাগাব? থাকলে তো উকিল হতাম।

এই গরমে ঘাম হয় না?

একটু পরেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বগতোক্তি হত, ছোটবেলায় কী বদবুদ্ধিই না ছিল, রাইহান, তাই ভাবি। এখন এই মাথাটি ফেজটুপিতে ঢাকলে কী হবে?

সেই লজ্জায় তো তোমার মাথার চুলই উঠে গেল।

তোমার মাথায় চুল উঠছে না? জ্যাঠাবাবু আবার ফিরিয়ে বলতে শুরু করতেন, এই টানাপাখার হাওয়াতেও আমার চুল উঠে যাচ্ছে।

হাতের কাছে গড়গড়ার নলটা ঠোঁটে ঠেকাতে গিয়ে থামত। রাইহান্ বলতেন, তুমি এই তামাক চুরুটে অভ্যেসটা ছাড়তে পারছ না! তামাকের জন্যেই কিনা চুল উঠে যাচ্ছে। আর ভাবিজির দুর্ভাগা এই যে, তোমার মাথার চুল উৎপাটনটাও করতে পারলেন না। দুই বড় মানুষ তখন উচ্চহাসিতে ফেটে পড়তেন। আমরা হাত আড়ালে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করেছি।

সে ঘোর ইংরেজ শাসনের কাল। চারদিকে তখন জনজাগরণের ঢেউ। ইস্কুলের ক্লাস তবু চলত সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলায়। বাইরের পৃথিবীটা যাই হোক, ইস্কুলের চেহারা আলাদা। উনচল্লিশে দেখা দিয়েছে যুদ্ধ। খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয় সব। হিটলার-মুসোলিনির বিজয়দর্প। কামানে-গোলায় বারুদে-বোমায় আকাশ অন্ধকার। সেই সঙ্গে জনজাগরণী ঢেউ। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল অঘ্রানি আগে। মানুষ না-খেতে পেয়ে মরল ধুলায়।

আমরা নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাসে বসে পড়াশুনো করি। ক্লাসের জানালার বাইরে রাস্তায় বড় বড় মিছিল। বন্দেমাতরম্-আল্লাহু আকবর। কাছারি পাড়ার মাঠে জনসভা হয়। ইস্কুলের জীবনে তার ছোঁয়া নেই। মাস্টারমশাইরা ঘড়ি ধরে ক্লাসে আসেন, পড়ান, বোঝান। বোর্ডে চক-খড়িতে আঁকেন। ইস্কুলের মস্ত বড় চত্বর জুড়ে বেঞ্চগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের বিশাল উচ্চতায় আকাশ দেখা যায় না। চারদিকে পিন পড়লেও শব্দ শোনা যায় ইস্কুল-চত্বরে। বাইরে সুরকি ঢালা রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি যায়। ইস্কুলের গেটে দু'টো দেবদারু গাছতলায় বসে থাকে এক বরফওয়ালা। বরফ-টুকরো কাপড়ে জড়িয়ে কুচি-কুচি করে ভেঙে তার সঙ্গে লাল সিরাপ ঢেলে একটা কাঠিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

আমরা ক্লাসে বসে পড়ানো শুনি। রাইহান সাহেব ক্লাসে এসে ব্ল্যাকবোর্ডে ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজত্বকালের ম্যাপ ঝুলিয়ে দেন। টেবিলে একটা লালচে রঙের হিল্‌হিলে ধরনের বেত রাখতে ভোলেন না। সেটা তুলে তার সরু লিকলিকে আগায় ম্যাপের চারদিক দ্রুত ঘুরিয়ে আনেন। তারপর তাঁর স্পষ্ট গলা শোনা যায় — মাই বয়েজ! দিস্ ইজ্ ইন্ডিয়া।

তারপর পড়াতে শুরু করেন। প্রাকৃতিক থেকে রাজনৈতিক ভারতবর্ষ পর্যন্ত।

ইস্কুলবাড়ির বাইরেও অমন কত স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। একদিনের কথা বলি। সে খুব সম্ভবত শ্রাবণ কি ভাদ্রমাস। সারাদিন বৃষ্টি হয়ে গেছে, ভেজামাটির গন্ধ উঠছে বাতাসে।

জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বৈঠকখানা ঘরের পাশাপাশি একটা ছোট্ট ঘরে আমরা তিনজন পড়ে যাচ্ছি নিশ্ছিদ্র অধ্যবসায়ে। কেরোসিন তেল দুর্লভ হয়েছে যুদ্ধে। বেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে সামনে। সে-রাতে হঠাৎ পড়তে পড়তে রাইহান বলেছিলেন, আজ তোমাদের ফ্রান্সের সম্রাট লুই সিক্সটিন্থের গল্প বলব। তোমরা কি তাঁর নাম শুনেছ? আমরা গল্পের নামে সজাগ হয়ে বসেছি। ইউরোপের ইতিহাস পড়ার বয়স সেটা নয়। তাই আগ্রহ আরও বেশি। উজ্জ্বল স্থির চোখ রাইহান স্যারের! গায়ে তেমনই শেরওয়ানি। গলা পর্যন্ত ফিটফাট্ বোতাম-আঁটা। স্থিরভাবে তিনি চেয়ারে বসে আছেন। একটু পরে তিনি বলেছিলেন, তোমরা ইতিহাস মুখস্থ কর। সাল-তারিখ-সন — পরীক্ষার প্রয়োজনে। কিন্তু ইতিহাস মানে জীবনের গল্প, আজগুবি কিছু নয়। যা হয়ে আসছে, এইরকম আর কি! ইতিহাস থেকেই জীবনের শিক্ষা নিতে হয়।

একটু পরেই তিনি বলেন সম্রাট ষোড়শ লুই এর গল্প। ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় বিলাসী সম্রাট। কিন্তু শিল্প-সচেতন রুচিশীল মানুষ হলেও সম্রাট সাধারণ মানুষদের সুখ-দুঃখের খবর রাখতেন না। তাই প্রজাদের অবস্থার প্রতি অসীম অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে তিনি প্যারিস থেকে দূরে বাগান বাড়িতে জীবন কাটাতেন। আর এদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমেছে চরম বিপর্যয়। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রা। ক্ষুধাতাড়িত প্রজাবৃন্দ তাই ছুটেছিল প্যারিস থেকে অনেকদূরে সম্রাটের বাগানবাড়ির দিকে। রাজার উদ্দেশে তাঁরা ক্ষুধা দূর করার আবেদন জানিয়েছিলেন।

জীবনের দূরপ্রান্তে বসে আজও যেন শুনতে পাই তাঁর গলা।

রাইহান বলেছিলেন, ইতিহাসের সেই ভয়ঙ্করতম সময়, যখন শাসকশক্তি ভঙ্গ করে নিজের অধিকার — মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে — চিরকাল নয় — মাঝেমাঝে এমন সময় আসে — আর তখনই মানুষের জেগে ওঠবার সময়! প্রজারা যখন রুটি চাই রুটি চাই বলে দাবি জানাচ্ছে, রাজকুমারী সেদিন বলেছিলেন, এত নির্বোধ কেন ওরা? রুটি না-মেলে তো কেক খায় না কেন?

একটু থেমে রাইহান বলেছিলেন, রাজশক্তির প্রজাদের প্রতি অবজ্ঞার এমন উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না। তাই ষোড়শ লুই-এর রাজত্ব ভেঙে পড়তে বাধা হয়নি। তখনই মানুষ জাগে — বাস্তিল ভেঙে পড়ে।

মাস্টারমশাইর গলায় এক নতুন সুর শুনেছিলাম সে-রাত্রে। সে কি আমাদের খুব বোঝার বয়স? আমরা সবাই তখন ছোট। কিন্তু তাঁর মুখের চেহারা সেদিন ছিল স্বতন্ত্র। আজ বড় হয়ে ভাবি, তিনি কি কিছু ইঙ্গিত করেছিলেন? বেয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের ক্ষোভ? আমরা বুঝিনি। নিতান্তই যে ছেলেমানুষ আমরা তখন।

সে-রাত্রে বৃষ্টিভেজা কদমফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল বাতাসে। জানলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও। ঘরের মধ্যে একটা অন্যরকম পরিবেশ। একটু পরেই তিনি কথা শেষ করে আর কিছু না বলেই চটিজুতো গলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সে-রাত্রে আমরা তিন জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই পুবনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর চলে-যাওয়া দেখেছিলাম যতদূর দেখা যায়। তারপর তিনি মিলিয়ে যেতে আকাশের দিকে চোখ পড়তে দেখেছিলাম মেঘ-ঠাসা জমাট অন্ধকার।

ছোটবেলার দিনগুলোর কথা যখন ভাবি, তখন অবাক হয়ে যাই। এক পাগল যেন বায়োস্কোপের চৌকো বাক্সে জমিয়ে রেখেছে ছবি। অথবা, হাওয়ার মিঠাই-এর বাক্স থেকে উঠে আসে সব।

রাইহান উঁচু ক্লাসে পড়াতেন ইতিহাস, নীচের ক্লাসে ইংরেজি, আর আমাদের ক্লাসে পড়াতেন ভূগোল। উঁচু ক্লাসে যখন ইতিহাস পড়াতেন, তখন অনেক সময় নিচু ক্লাসের ছেলেরা আমরাও উঠে এসে দাঁড়াতাম তাঁর ক্লাসের বন্ধ দরজার বাইরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতাম তাঁর পড়ানো। পড়াবার অপূর্ব ভঙ্গি! মনে আছে একদিন, সেদিন পলাশীর যুদ্ধ পড়াচ্ছিলেন হাত। সমস্ত ক্লাস স্তব্ধ। বাইরে আমরাও স্তব্ধ। পড়া শুরু করবার আগে সেদিন তিনি আবৃত্তি শুরু করেছিলেন নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ থেকে। পলাশীর যুদ্ধ কি তোমরা কখনও পড়েছ? বড় অসাধারণ কাব্য। এখন হাত তোমরা বুঝবে না — কিন্তু বড় হয়ে যখন পড়বে —

একটু থেমে বলছিলেন, ইতিহাসের সে এক মোড় ফেরার সময়। এক অভিশপ্ত সময়। চারদিকে ষড়যন্ত্র-শর্তাত। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে মীরজাফর দেশ তুলে দিচ্ছেন তখন ইংরেজের হাতে — ক্লাইভের এই গর্বদ। আর মোহনলাল্ তখন মরণপণ শেষ লড়াই চালাতে চলেছেন — ভাগীরথী তীরে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি বন্দনা করছেন — তাঁকে তক্ষুনি অস্ত না-যেতে বলেছেন —

তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ-রজনী.....

স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল রাইহানের গলা। সে ঘোর ইংরেজ রাজত্বের কাল, আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের কাল। কিন্তু ইস্কুল কলেজে তার বিন্দুমাত্র আঁচও পাওয়া যায় না। রাইহানের কি ভয় বলে কিছু ছিল না?

একরাত্রিতে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে রাইহানের কথা হয়। দুই বড় মানুষের কথাগুলো শুনি লুকিয়ে। তখন ইলেকট্রিকের

আলো ছিল না। ঘরের মধ্যে মস্ত এক টেবিলবাতি। দুই বয়স্ক মানুষ মুখোমুখি বসে আছেন।

আজকাল খুব ভাবনা হয়। ভাবি যে, এইসব ওকালতি বিষয়চর্চা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। জ্যাঠামশাইয়ের গলা।

তুমি কি এ-সব পার নাকি? এতগুলি মানুষের দায়িত্ব তোমার হাতে। রাইহান বললেন, তা ছাড়া সরকারি উকিল কি সরকারের বিপক্ষে যেতে পারে! রাইহানের শেষ কথায় শ্লেষ ছিল।

কিছুক্ষণ ঘর থমথমে হয়ে থাকল। একটু পরে রাইহানের চিন্তিত গলা শোনা গেল, তবে এ-কথা ঠিক দেশের সামনে খুবই দুর্দিন আসছে নিশ্চিত।

জ্যাঠামশাই বললেন, বল।

দেশের মানুষের মধ্যেই বিরোধ-অশান্তি দেখা দিয়েছে। রাইহান বললেন, অবশ্যই এ ইতিহাসের ফল। আমরা কেউই এ-দায়িত্ব এড়াতে পারি না। আমরাই এ-জন্য দায়ী। এরপর আর কথা হয় না। কোত্থেকে একটা গুবরে পোকা উড়ে পড়েছে টেবিলে। বাতির চারদিকে ঘুরছে। অনেক সময় দুই বড় মানুষ চুপ করে বসে থাকেন।

হঠাৎ রাইহান বলে উঠলেন, একবার মনে আছে আমরা ধলেশ্বরীতে স্টিমারে চড়ে নদীপ্রান্তে ফুফুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সে কী জল! আর জল। তারপর আবদুল্লাপুরে নেমে বেলা তিনটে-চারটের দিকে ফুফুর বাড়ির পুকুরে সাঁতার কেটেছিলাম। এদিকে আমাদের বিলম্বে—

শেষপর্যন্ত তোমার পিসিই হাজির হলেন এসে —। জ্যাঠামশাই বললেন, মনে ঠিকই আছে — সন্ধ্যায় শুরু হল আঁখের রস জ্বাল দেওয়া। আঃ কী গন্ধ। দু'জনে কাছেই বসে আছি। সন্ধ্যারাত্রি থেকে কতক্ষণ!

হঠাৎ যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে গলা। জ্যাঠামশাইর মৃদু গলা শোনা গেল, দিনগুলি কী সুন্দরই না ছিল!

রাইহান বললেন, মদনপীরের দরগায় গিয়েছিলাম, মনে পড়ে? সেই ভাঙা পুরনো দরগা। মস্ত মস্ত পাথরটুকরো পড়ে আছে। সেই পাথরটুকরোয় বসে আমরা শশা ভাগ করে খেয়েছিলাম। একটা গরু এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। খাবার জন্যে। মনে আছে দুপুরটা? সে-সব যেন স্বপ্ন। জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, আর ফিরবে না হে।

স্বপ্ন স্বপ্নই। রাইহান বললেন, এইতো কী ভীষণ আকালটা পেরিয়ে এলাম আমরা। ক্রমেই যেন সব কিছুর দুর্গতি হচ্ছে। কত মানুষ পথে-ঘাটে মরে থাকল।

সে-রাত্রে দু'জনে অনেক সময় চুপ করে বসে থাকলেন।

সে-সব কথা আমাদের ভাববার নয়। আমরা তখন ছোট। খুবই ছোট। এই-রকম সময়ে এক রাজপুরুষকে দেখলাম। স্কুলের ক্লাস-পড়াশুনো দেখতে ডি.আই. এলেন একদিন। দুর্দান্ত ইংরেজ রাজত্বের ডি.আই. লালমুখো স্কটিশ সাহেব। একটা সুন্দর মোটর গাড়িতে এলেন। উর্দি পরা চাপরাশি আগে পেছনে। লাল শালু পাতা হয়েছে বড় সুরকির রাস্তার সীমানা থেকে দেবদারু গাছদুটোর ভেতর দিয়ে ইস্কুলবাড়ির অফিস পর্যন্ত। মাস্টারমশাইদেরও অনেকেরই মুখ আতঙ্কিত।

ক্লাস ভিজিট করেন ডি.আই.। সঙ্গে হেডমাস্টার। ক্লাসে-ক্লাসে যান। কেমন পড়ানো হচ্ছে দেখা ডি.আই.র কাজ। মাস্টার মশাইরা কেউ কেউ ছাত্রদের শিখিয়ে রাখেন কী-কী পড়া ধরবেন। রাইহান কিন্তু নন।

এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল রাইহান সাহেবের ক্লাসে। তিনি পড়া ধরলেন আগের দিনের পড়ানো অংশ থেকে। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, খাদ্য এবং বাসস্থানের ইংরেজি বল।

যার উদ্দেশে বলা সে অবলীলাক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ফুডিং অ্যান্ড লজিং। মুহূর্তকালেই বিপর্যয়।

এই পড়া শিখিয়েছি তোমাদের! রাইহানের কী হল সেদিন! প্ল্যাটফরম ছেড়ে দ্রুত ছুটে এলেন তিনি। ছেলেটির গালে মস্ত এক চড় কষিয়ে দিলেন। সে এক বিশ্রী অবস্থা। ঘটনা যে কী হতে পারে, তা আমাদের বোঝার কথা নয়। ডি.আই. উঠে গেলেন তারপর। হেড মাস্টার গেলেন পেছন-পেছন।

যথারীতি ক্লাস ভিজিটের পর ডাক পড়ল রাইহানের। শান্ত পায়ে এসে দাঁড়ালেন রাইহান। স্কুল কমিটির আরও কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে। মাঝের টেবিলে ডি.আই. বসে আছেন।

স্কুল-সেক্রেটারি বললেন, রাইহান সাহেব, ছেলেটিকে অমন চড় মারা কি আপনার উপযুক্ত হয়েছে?

শিক্ষক হিসেবে আমি তাই ভাল মনে করেছি। রাইহানের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন উত্তর।

পরিচালক-সমিতির আর একজন বললেন, ছেলেটি কি ভুল বলেছিল?

অবশ্যই। রাইহান মাথা নাড়লেন, ফুড্-এর শেষে ing হয় না। আমি নিজে পড়িয়ে দিয়েছি।

একটু থেমে বললেন, এখানে ডি.আই. সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত।

বলে তিনি এক গ্রামার বই-এর নাম করলেন। বললেন, দেখতে চান তো বই নিয়ে আসুন। আমি ওদের ট্রানস্লেশন পড়াই। কতবার শিখিয়ে দিয়েছি। বই-এর পৃষ্ঠাসংখ্যা এবং তার ফুট্‌নোটও উল্লেখ করলেন রাইহান।

ঘরের মধ্যে স্তম্ভিত নীরবতা। ডি.আই. সাহেবের মুখ লাল। হেডমাস্টার বই-এর নাম করে সেটি আনতে বললেন দপ্তরিকে।

এ-সব ঘটনা আরও বড় হয়ে জানতে চেয়েছিলাম ইস্কুল দপ্তরি আনিস চাচার কাছে, তারপর কী হল, চাচা?

কী আবার হবে? লাইব্রেরি থেকে বই এল। হেডমাস্টার ডিকসনারি খুলে সেই বিশেষ পাতার নীচে ফুটনোটে আঙুল দিলেন। দ্রুত হাতে এগিয়ে দিলেন ডি.আই. সাহেবের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ফল ফলল। ছিলা-কাটা ধনুকের মতো সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন ডি.আই.। তারপর টেবিলের ও-প্রান্ত থেকে ঝুঁকে অনেক কষ্টে হাত বাড়িয়ে দিলেন রাইহানের দিকে হ্যান্ডশ্যাকের ভঙ্গিতে। পরে ঘনঘন হাত ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন, হিয়ার ইজ্ এ টিচার, হিয়ার ইজ্ এ টিচার। ইস্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ডি.আই. বলেছিলেন, এমন টিচার যে এ-স্কুলে আছেন — I feel proud for him. ওঁর সম্মানে আজ স্কুল ছুটি। আর ওঁর এক-আনা ইনক্রিমেন্ট হল আজ থেকে। কাল পুরো স্কুল ছুটি আমার ভিজিটের জন্যে।

খসখস করে কাগজে লিখে গেলেন ডি.আই.।

ছোটখাটো মানুষ ছিলেন রাইহান। কিন্তু মনের দিক থেকে ছিলেন অনেক বড়। পাতার পর পাতা পড়াতেন নিয়মিত। পড়া ধরতেন, মুখস্থ দিতেন। পরের দিনের পড়া করে আসতে বলতেন।

ইতিমধ্যে ইস্কুলে এসে দেখি, এক অভাবিত কাণ্ড। হেডমাস্টারের অফিসের সামনে বারান্দায় নিল ডাউন হয়ে আছে ক্লাস টেনের পাঁচ-ছ'টি ছাত্র। কাল বিকেলে নাকি ওরা কাছারি পাড়ার মাঠে বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল।

হেডমাস্টার গুনে গুনে বেত মেরে চলেছেন ছেলেদের হাতে। দুর্দান্ত রাগে ফেটে পড়তে-পড়তে বলছেন, আহাম্মকের দল! তোমাদের স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যে-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যায় না, তার বিরুদ্ধে লাগতে গিয়েছ তোমরা?

বেতের পর বেতের ঘায়ে আর্তনাদ করে উঠছে ছেলেরা। একের পর এক বেত চালিয়ে হঠাৎ এক সময় চমকে উঠে দেখলেন নিলডাউন হ'য়ে হাত বাড়িয়ে আছেন রাইহান। আপনি?

হ্যাঁ, আমি। রাইহান হাত বাড়িয়ে আছেন বেতের জন্যে, মারুন মারুন, আমাকেও মারুন। এইসব ছেলেরা আমার ছাত্র। আমি ওদের ইতিহাস পড়াই। এদের মনের মধ্যে যদি এতটুকু দেশপ্রেম জেগে থাকে, তার জন্যে আমিও দায়ী।

চোখের সামনে দেখছি, বেত ফেলে দিয়ে ততক্ষণ পালিয়ে বেঁচেছেন হেডমাস্টার। রাইহান ছেলেদের কাছে উঠে এসে নিজের রুমালে ওদের চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। কারও মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলছেন, কাঁদিসনে, বাবা। দেশের জন্যে মার খেয়ে কাঁদতে নেই। পরে বললেন, তোরা হয়ত এই গোলামখানাতেই থাকবি। আমি কিন্তু একে আজ ছেড়ে যাচ্ছি—

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, টুপিটা মাথায় বসিয়ে নিচ্ছেন রাইহান। তারপর আস্তে-আস্তে সিঁড়িতে পা ফেলে সামনের দিকে হারিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু সে-যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া নয়। বেশ কিছুদিন পরে ইস্কুলের পরিচালকমণ্ডলী রাইহান সাহেবকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। সে-এক আশ্চর্য দৃশ্য। ঘোড়ার গাড়ি থেকে সকলের আগে-আগে নামলেন হেডমাস্টার। সেক্রেটারি নিজে হাত ধ'রে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। দেবদারু গাছটার মাঝখানে চওড়া রাস্তা, যে-পথ দিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন, সে-পথেই আবার ফিরে এলেন। মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা এ-দৃশ্য দেখতে।

কতদিন আগের কথা সে-সব? পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু ভোলা কঠিন। সে-সব দিন ছিল আগ্নেয়গিরির উত্তুঙ্গ চূড়ায়। পরাধীন ভারতবর্ষে একটা মোড় ফেরাবার আয়োজন চলেছে। রাস্তায়-ঘাটে-মাঠে সভা ও শোভাযাত্রা। মিটিং-মিছিলে ভিড়। কিন্তু রাইহানকে কোনওদিন দেখিনি ভিড়ে।

এমন সময় আর একদিন সকালবেলা এক ঘটনা ঘটল।

খুব ভোরে সেকালে সাহেব এস.ডি.ও.-র এক রাউন্ড দৌড় হয়ে যেত 'ওয়েলার' ঘোড়ায়। আওয়াজ উঠত খটাখট্ খট্ খটাখট্ খট্। অর্থাৎ ইংরেজ শাসন যে সজীব, সেটা বোঝাতেই হয়ত এর রেওয়াজ হয়েছিল।

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন রাইহান। চোখের সামনেই পলকে ঘটনাটা ঘটল। মর্নিং স্কুলে যাচ্ছিল ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা। দুর্দান্ত ঘোড়ার ধাক্কা লেগে ছিটকে গেল একজন। সঙ্গে-সঙ্গেই মস্ত উঁচু ঘোড়াটার জিন্ ধরে ঝুলে পড়েছেন রাইহান। আর তাঁর পিঠে পড়ছে ঘনঘন সাহেবের চাবুক।

বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ঘোড়া। লাগাম ধরে-থাকা সাহেব ইংরেজি বুলিতে গালি দিয়ে চলেছেন। ততক্ষণে রাইহান আছড়ে পড়েছেন মাটিতে। খবরটা ছড়িয়ে যেতে দেরি হয়নি। সমস্ত ইস্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ছাত্রছাত্রীরা। দোকান-পাট বন্ধ। শহরের চেহারা অগ্নিগর্ভ।

গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রাইহান। রাজকর্মচারীর কাজে হস্তক্ষেপের ফলেই শুধু নয়, আরও অনেক ধারায়। জামিন হয়নি। এমনকী সরকারি উকিল জ্যাঠামশায়ের চেষ্টাতেও নয়।

বেশ কিছুকাল পরে জেলার কোর্টে উঠল কেস। উকিল চাননি রাইহান। নিজের পক্ষে নিজেই বক্তব্য পেশের অনুমতি নিয়েছিলেন। নিজের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে শুধু বলেছিলেন,

ধর্মাবতার, যা বলব, সত্য কথাই বলব। কারণ আমি একজন শিক্ষক। ইংরেজের বিদ্যালয় থেকেই লেখাপড়া করে শিক্ষক হয়ে বেরিয়েছি। সংস্কৃতি ও সভ্যতার যা-কিছু পাঠ আমরা নিয়েছি সবই ইংরেজের কাছ থেকে। একজন উচ্চ রাজকর্মচারীর ঘোড়ার পায়ে একটি বাচ্চা ছেলে ছিট্‌কে পড়লেও তিনি ঘোড়া থামাননি। তাঁর মানবিকতাবোধ জাগেনি। এ-রকম ঘটনায় যদি একজন শিক্ষক হিসেবে আমি তাঁর ঘোড়া ধরে ঝুলে পড়ে থাকি, তবে কি খুব বেশি অপরাধ করেছি? আমার মনের তখনকার অবস্থা অনুধাবন করুন। যদি তা আমার অন্যায় অপরাধই হয়ে থাকে, তবে আমাকে শাস্তি দিন, ধর্মাবতার। এই আমি আমার মাথা নামাচ্ছি।

কয়েকটি মুহূর্ত। সমস্ত আদালতকক্ষ স্তম্ভিত। বিচারকের গলা শোনা গেল একটু পরেই। রাইহান বেকসুর খালাস। সাহেব বিচারক বলতে ভুললেন না, এ ঘটনা ইংরেজ জাতির পক্ষে লজ্জাজনক। আমি তাঁকে বিলম্ব না করে এই শিক্ষক মহাশয়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার নির্দেশ দিচ্ছি।

পরাধীন জাতির জীবনে এমন ঘটনা কত ঘটেছে। রাইহান সাহেবের ঘটনা প্রসঙ্গে মনে পড়ে এসব কথা। তিনি কোনও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, বিপ্লবী বিদ্রোহী ছিলেন না। ছিলেন একজন শিক্ষক। নির্ভীক মানুষ ছিলেন তিনি।

উনিশ শ' সাতচল্লিশের দেশ-ভাগ মেনে নিয়ে এ-পার বাংলায় চলে আসবার আগে একবার গিয়েছিলাম রাইহান সাহেবের বাড়ি। শহর থেকে বেশ কিছুদূরে। তার অনেক আগেই চাকরি থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। তাঁর ছেলে সহপাঠী মনসুরের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালাম কুণ্ঠিতভাবে।

একটা চারদিক-খোলা টিনের চালা-ঘরে বসে আছেন রাইহান পেছন ফিরে। খালি গা। গায়ের চামড়া কত ঢিলে হয়ে গিয়েছে। মনসুর ডাকল পেছন থেকে। আমার নাম ধরে বলল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

বেশ কিছুক্ষণ চলে গেল। জবাব নেই। ও-পাশে মস্ত এক পুকুরের তীরে বাঁশবন থেকে কী-একটা পাখি থেকে থেকে ডেকে উঠছে। মাস্টারমশাইর গলা শোনা গেল একটু পরে। যেমন ছিলেন, তেমনই বসে থাকলেন। শুধু একটা প্রশ্ন—যাওনি?

বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠেছে। এই সেই মাস্টারমশাই। কত ছোটবেলা থেকে তাঁর কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেছি। জ্যাঠামশাই-এর সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই জ্যাঠা কবে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তিনি এখনও আছেন! কী জবাব দেব তাঁর কথার?

ক্ষীণগলায় বললাম, যাইনি। তবে যাব।

যেমন ছিলেন তেমনই বসে থাকলেন পেছন ফিরে। মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়েই যেন হঠাৎ বলে উঠলেন, যাও, যাও। চলে যাও।

দেশভাগ হয়ে গেল, বাবা। আত্মগতভাবে রাইহান বলে উঠলেন, খোদার উপরে বড় অভিমান ছিল। আমার চোখ দু'টা তিনি কেড়ে নিয়েছেন—

শুনে চমকে উঠলাম। কিন্তু তখনও তিনি বলেই যাচ্ছেন, এখন বুঝতে পারছি খোদা মেহেরবান। বেঁচে থেকে এ-দৃশ্য আমায় দেখতে হল না।

সামনে ঝুঁকে পড়লেন অসহায় বৃদ্ধ মানুষটি। তারপর হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। দু'হাটুর মাঝখানে ঝুঁকে পড়েছে তাঁর মুখ। থরথর করে কাঁপছে পিঠ।

আমি স্থির। কান্না আমারও বুকের মধে দল দল করছে। মনসুর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বাবার পিঠে। ঘষে দিচ্ছে পিঠ।

খানিকটা এগিয়ে নিঃশব্দে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে উঠে এলাম। পুকুরে জমাট জল। তীরে-তীরে জংলা ঘাস, ঝোপ-ঝাড়। সন্ধে আসতে কতই-বা বাকি। একটা ঝাপসা ছায়া নেমে আসছে শূন্য থেকে দ্রুত।

বাঁশ-বাগানের ভিতর থেকে সেই অদ্ভুত পাখিটা ডেকে উঠল।

রাইহান স্যারের গল্প এখানেই শেষ। ফিরে আসবার অনেকদিন পরে হঠাৎ যেন কার মুখ থেকে শুনেছিলাম, রাইহান সাহেবকে ডাকাতরা কেটে ফেলেছে। কেমন ডাকাত ওরা? যারা অমন একজন বৃদ্ধ শিক্ষকের গায়ে নির্মম হাত চালাতে পারে?

কিন্তু এমন তো কতই হচ্ছে। সারাদেশ জুড়ে আ[illegible] অস্থিরতা। উগ্র বিষবাষ্পের জন্ম দিয়েছে যারা, তাদেরই হাতে খুন হয়ে চলেছে স্নেহ-মমতা-ভালবাসা শিক্ষা-সৌ[illegible] সৌজন্য ও শিষ্টাচার। মেরে-মেরে এমন করে আমরা কতদূরে পৌঁ[illegible]?

মানুষকে যাঁরা ভালোবাসেন, মানুষ-গড়ার কারিগর, সেইসব আদর্শবাদী শিক্ষকদের কথা মনে রেখে রাইহান স্যারের গল্প লিখে রাখা গেল। □

গ্রন্থসমালোচনা

সাত হাটের হাটুরে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে আমার মেজকাকার ঘরে এক ভদ্রলোক নিয়মিত আসতেন। মাঝে মধ্যে থেকে যেতেন। ছোটখাটো অথচ মুগুরভাঁজা চেহারা। চৌকো চোয়াল, স্তালিনের মতো গোঁফ, পরনে খাকি হাফ শার্ট, প্যান্ট। আমরা 'ইন্দ্রকাকা' বলে ডাকতাম। শরিকি মামলায় ফরিদপুরের জমিদারি খুইয়ে কলকাতায় এসে রয়িস্ট বা মানবেন্দ্র রায়পন্থী হয়েছিলেন। তো ওই ইন্দ্রকাকার হাতেই দুটো কাগজ দেখতাম—একটি 'ভ্যানগার্ড' অন্যটি 'জনযুদ্ধ'। তা ছাড়া বাড়িতে 'রংমশাল' আসত কিশোরী বড়দি-মেজদির তাড়নায়। আমার মাথা তখন খাওয়ার টেবিল ছাড়িয়ে খুব একটা ওঠেনি। ওই 'রংমশাল' আর 'জনযুদ্ধ'-র পাতায় একজন লেখকের নাম হরবখৎ দেখতাম — সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বাচ্চা বয়স থেকেই 'রং মশাল'-এর লেখাগুলো আমার গোড়া ধরে টান দিত। ভবঘুরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমে আমি প্রথম দেশের মাটির আকাঁড়া গন্ধ পাই।

গোড়া হতেই কবি হিসাবে সুভাষের খ্যাতি দেশজোড়া। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমার কিন্তু গোপন পক্ষপাত গদ্যকার সুভাষের ওপর। তাঁর উপন্যাস নয়, রিপোর্টাজগুলি আক্ষরিক অর্থেই আমাকে পেড়ে ফেলেছে বারবার। অনন্য কমিউনিস্ট ও 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী বাংলা খবরের কাগজের ইতিহাসে রিপোর্টাজের পত্তন করেন। এই কাজ হাসিল করতে তিনি দেশের ঘাট-মাঠ-পাহাড়তলি-অরণ্যে কয়েকটি বেগবান, তরুণ অশ্বকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের নাম—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়। বড়া কমলাপুরের তেভাগার লড়াই কভার করার জন্য লাহিড়ী তো খোদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পাঠিয়েছিলেন। না, তিনি সংবাদ বা রিপোর্টাজ লেখেননি, ফিরে এসে, লিখেছিলেন একটি আগুনপারা গল্প—'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'।

অনেকের ধারণাই নেই, কী পরিমাণে গদ্য লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই তালিকায় আছে—সাংবাদিকতা, ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস-গল্প, রোজনামচা, আত্মজীবনী, তত্ত্ব, অনুবাদ, কিশোরপাঠ্য ইতিহাস-বিজ্ঞান-জীবনী—এ রকম হরেক কিসিমের লেখা। সব কিছু লিখেছেন এমন চোখটানা মনকাড়া গদ্যে যে 'ধুত্তোর' বলে উঠে পড়ার কোনও ফুরসত-ই পান না পাঠক। তা ছাড়া তাঁর পায়ের নীচে ছিল সর্ষে, কাজে-অকাজে ঘোরাফেরায় বেজায় আনন্দ পেতে, এক সমরেশ বসু ছাড়া, অমন আর কাউকে দেখিনি। মানুষে বিশ্বাস, মাখনে ছুরির মতো জীবনের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার ইচ্ছে আর লেখার প্রতিভা—এই তিনের যোগফল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের 'আমার বাংলা' (১৯৫১) 'যখন যেখানে' (১৯৬০), 'ডাকবাংলার ডায়েরি' (১৯৬৫), 'নারদের ডায়েরি (১৯৬৯), 'ক্ষমা নেই'(১৯৭২), 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' (১৯৮১)—এই ছ'টি গ্রন্থের সংকলন। এটি সম্পাদনার কাজ করেছিলেন সুবীর রায়চৌধুরী, তাঁর অকালমৃত্যুর পর সেই দায়িত্ব পালন করেন অমিয় দেব। যদ্দিন বাঁচি, আমার মাথার কাছে বইয়ের তাক আলো করে সঙ্কলনটি থেকে যাক।

২.

গদ্য দিয়ে সাহিত্যে হাতেখড়ি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। অচিরে চলে যান পদ্যে। এবার তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক।

"তারপর কলম ছেড়ে আবার যখন কলম ধরলাম তখন আমি পার্টির কাগজে। সোমনাথ লাহিড়ী আমার ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে গদ্য না লেখালে এবং লিখতে না শেখালে আমার কলম দিয়ে আর কখনও গদ্য বার হত কিনা সন্দেহ।

গ্রামাঞ্চল আর শিল্পাঞ্চল ঘুরে ঘুরে পার্টির কাগজে সেই সময় কয়েকটা রিপোর্টাজ লিখেছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তাড়নায় ছোটদের কথা মনে রেখে কিছু কিছু সেই রিপোর্টাজের অন্তর্বস্তু নিয়ে 'রংমশালের' জন্যে 'আমার বাংলা' লিখি। আমার সেই লেখা পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কী খুশী হয়েছিলেন, বলার নয়। আমার সবই ঘুরে বেড়িয়ে চোখে দেখে কানে শুনে লেখা।

'ডাকবাংলার ডায়েরি' লেখার পেছনে ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় কতটা কী পরিবর্তন হয়েছে তার খোঁজখবর নেওয়া। 'নারদের ডায়েরি', 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'তে আছে তার অনুবর্তন।

'যখন যেখানে' জেল থেকে ফিরে লেখা।

বাংলাদেশের যশোর-খুলনায় মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা 'ক্ষমা নেই'। তখনকার ক্রোধ এতদিনের ব্যবধানে কারো কারো কর্কশ লাগতে পারে। লেখক এক্ষেত্রে নিরুপায়। আজকের মন দিয়ে সেদিনের মনের অবস্থা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।"

চোখ পাতার পর পাতায় চলে যায় আর ইচ্ছে করে স্রেফ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা উদ্ধার করেই তাঁর গদ্য নিয়ে লিখি।

একটু আগে যে চোখ টানা মনকাড়া-গদ্যের কথা বলছিলাম, লেখক তা লব্ধ করেছিলেন সাত হাটের হাটুরে হয়ে টানা তিন দশক জুড়ে গোটা বাংলা চুঁড়ে সে সব জায়গার হতমান, গরিবগুর্বো মানুষজনের কথাবার্তা থেকে। সে কথ্যভাষার প্রসাদগুণ অবলীলায় চালান হয়েছে তাঁর গদ্য থেকে পদ্যে। জটিল বাক্য খুব কম, যৌগিক বাক্যও তেমন নয়, সরল ছোট ছোট বাক্যে পাতার পর পাতা লিখে যান তিনি। অনুচ্ছেদ ভাগ করেন খুব সহজে, আটপৌরে শব্দে তাঁর বরাবরের ঝোঁক, অন্বয় একান্ত সরল। বক্রোক্তির বদলে স্বভাবোক্তির ব্যবহার রয়েছে তাঁর শিল্পিত স্বভাবে। আশি ছুঁয়ে দিয়েছেন সুভাষ, বয়স কিন্তু তাঁর ঘাড়ে আজও সিন্ধবাদ হয়ে চেপে বসেনি। তারুণ্য তাঁর গদ্যে, তাঁর মেজাজে।

কবিতা আর গদ্যের এ-ঘর ও ঘর করার কথা বলছিলাম। সুভাষের একটি বিখ্যাত কবিতা 'সলেমনের মা' বেরিয়েছিল 'পরিচয়'-এর এক পুজোসংখ্যায়। সেখানে পাগল বাবর আলির চোখের সঙ্গে এলোমেলো আকাশের তুলনা ছিল। 'যখন যেখানে' গ্রন্থে একটি নিবন্ধের নাম—'বাবর আলির চোখের মত'। সেখানে পাগল বাবর আলি ভাল হয়ে বজবজ মিলে পাড়ার তাঁত শ্রমিকদের সঙ্গে ভিড়েছে। সুভাষ রচনাটির অন্তিমে লিখেছেন, "বজবজের মাথায় যে-আকাশটা দেখছি তার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন বাবর আলির চোখের কথাই ফের মনে পড়ল। পাগল বাবর আলি নয়। যে-বাবর আলি ঠকঠকি তাঁতের সামনে বসে সারা রাত জেগে জীবনের সঙ্গে শেষবারের মত বোঝাপড়া করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, একমাত্র তার চোখের সঙ্গেই এই গনগনে আকাশটার তুলনা করা চলে।"

১৯৬৮-র ২৩ ডিসেম্বর জেলখানা যাওয়ার সময় সুভাষ এদেশের সংগ্রামী মানুষের গলায় তুলে দিয়েছিলেন একটি ধ্বনি। 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা'। সংকলনের অন্তর্গত নারদের ডায়েরি-তে একটি লেখার নাম—'যখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা'। পঁচিশ বছর পর ১৪০০ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং এ-পর্যন্ত অগ্রন্থিত 'মোট বারো' শীর্ষক কবিতায় ফিরে আসে সেই শ্লোগান বুকে নিয়ে কারাবাসের ও সেখানকার সঙ্গীসাথীদের স্মৃতি। সুভাষ লেখেন—"রক্ত / রাস্তা / রক্ত / রাস্তা / রক্ত / বাড়িতে ডাকাত পড়ার মত আতঙ্কে তারস্বরে সেদিন / চিৎকার করে আমরা বলেছিলাম / রাস্তাই একমাত্র রাস্তা / আমরা বলেছিলাম"। এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে গদ্য দিয়ে কবিতা ও কবিতা দিয়ে গদ্যকে প্রাণিত করার নজির তুলে দেওয়া যায়।

ঠিক এভাবেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'নারদের ডায়েরি'-র অন্তর্গত 'বকুল গাছের তলায়' লেখাটি পড়তে পড়তে তাঁর কবিতার পাঠকদের অনিবার্য ভাবে মনে পড়ে পংক্তিগুলি—"এক পায়ে উর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে / জটাধারী একটি গাছ / ঝুকে পড়ে / যত দেখে, তত অবাক হয় / ট্যাঁকে বাচ্চা নিয়ে / এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাসন মাজে / রাত্তিরে গাছতলায় মাদুর বিছিয়ে শোয় / যে মেয়েকে স্বামী নেয় না / যমেরও অরুচি / ছি ছি! / আবার তার ছেলে হবে।" ১৩৬৮-তে শারদীয় স্বাধীনতায় প্রকাশিত লেখকের 'একটি রাস্তার সূত্রে' গল্পটির সূত্র-ও ওই 'বকুল গাছের তলায়' লেখাটিতে মিলবে। আসলে তামাম দেশ ঘুরে ঘুরে সুভাষ তখন যে রিপোর্টাজগুলি খবরের কাগজের তাগিদে চটপট লিখে ফেলতেন, তার অনেকগুলিতেই তিনি সংগ্রহ করে রাখতেন এমন সব উপাদান যেগুলি পরে তাঁর কবিতা বা উপন্যাসে শিল্পের ফুল ফোটাত। একটা সময় ছিল, বড় দীর্ঘ সে-সময়, যখন ঘর থেকে রাস্তায় না বেরলে, হাজার রকমের মানুষের ঘনিষ্ঠতার তাপে নিজেকে সেঁকে না নিলে সুভাষ আদৌ কিছু লিখতে পারতেন না।

৩.

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গদ্যরচনা ছাপা হয়েছিল 'জনযুদ্ধ'-র ১৯৪২-এর ১৫ জুলাই সংখ্যায়। তখনই তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। সংবাদপত্রের রিপোর্টার হিসাবে তখন কোথায় না কোথায় পাঠানো হত তাঁকে। শুধু রিপোর্টাজ নয়, অসংখ্য প্রতিবেদন, এবং বেশ কিছু স্বাক্ষরহীন ভাবে নিয়মিত লিখে যেতেন। ঘুরতে ঘুরতে নানা ধরনের মানুষের সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর কলমকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করত 'মাঠ জোড়া ধান আর দেশজোড়া ক্ষুধা।' উৎপীড়িত মানুষের নারকীয় অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর লেখাগুলির পাতায় পাতায়। কিন্তু এহেন পরিণতিকে কখনও চূড়ান্ত বলে মেনে নেননি তিনি। নতুন করে চারপাশের দেখা আর চাখা, ভস্মের ভেতর থেকে সোনা খুঁজে বার করা—এসবই তিনি করেছেন ভ্রাম্যমান সাংবাদিক হিসাবে তদন্তমূলক রিপোর্টিং করার সময়। সেকালের তরুণ সাংবাদিক বিশেষত কমিউনিস্ট সাংবাদিকদের কাছে সুভাষের লেখাগুলি কীভাবে সম্পূর্ণ নতুন পথের দিশা দিয়েছিল, তাঁর সমসাময়িক কবি ও এক সময়ে পরিচয় পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি স্মৃতিচারণা থেকে জানতে পারি, "...সুভাষ নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন স্বদেশকে আর তুলে আনছিলেন কলমে আঁকা ছবি আমাদের এই বাংলার আর তার বাসিন্দা বাঙালি অবাঙালি নানা জাতের নানান ভাষার মানুষের আসল রূপটির—মরতে মরতেও মরতে জানে না যে মানুষ, ঘর করতে শিখেছে যারা নিরন্তর মারী মন্বন্তর নিয়ে। বলা বাহুল্য আমরা যারা 'জনযুদ্ধ'-এর হদিশ রাখতুম, নিয়মিত পড়তুম যারা ওই সমস্ত রিপোর্ট, তারা অবশ্যই রীতিমত তারিফ করতুম লেখাগুলির। আর এ তারিফ যে কতটা আন্তরিক ছিল তা বোঝা যাবে 'জনযুদ্ধ' আর 'স্বাধীনতা' দৈনিক পত্রের পরবর্তী লেখক সাংবাদিকদের—ননী ভৌমিক আর গোলাম কুদ্দুস প্রমুখের লেখা রিপোর্টাজগুলি ফের একবার পড়লে, সুভাষের রিপোর্টাজ বেশ খানিক যাদের 'মডেল' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি ১৯৪৭ সালের গোড়ায় বাংলার চাষীদের তেভাগা আন্দোলনের এক-আধটু রিপোর্টিং-এর কাজে নেমে আমিও যথাসাধ্য অনুসরণের চেষ্টায় ছিলুম ওই মডেলের।"

সুভাষের গদ্যসংগ্রহ প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত সবকটি বইতেই পাঠক খুঁজে পাবেন তৎসম শব্দবর্জিত, চলতি ইডিয়ামে সমৃদ্ধ ঝরঝরে গদ্য, যা লেখা হয়েছে গল্প বলার ঢঙে আর আঞ্চলিক বুলির মিশেল দেওয়া একেবারে সহজ সরল ঘরোয়া মুখের ভাষায় ও ভঙ্গিতে। প্রতিটি রচনায় আমরা তাই খুঁজে পাই খাঁটি বাংলা বাক-রীতির রাশ রাশ নমুনা। সাধারণ মানুষের জিভে জিভে ফেরা একান্ত আটপৌরে ভাষা কীভাবে সম্পূর্ণ নতুন একধরনের গদ্যধারা জন্ম দিতে পারে, তা সুভাষের লেখাগুলি না পাঠ করলে কিছুতেই প্রত্যয় হতে চায় না। আমার তো খুব মনে হয় একই সঙ্গে বড় মাপের এবং দায়বদ্ধ কবি না হলে এরকম গদ্য কারও পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। হাতে আঁককষার পেনসিল নিয়ে মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করার দরকার নেই, অলসভাবেই চোখ বুলিয়ে যান না 'মেঘের গায়ে জেলখানা', 'ফুলের লোক্যালে বাড়ি ফেরা', 'সোনালি সুতোর পাকে পাকে', 'যেদিকে দুচোখ যায়' অথবা যে-কোনও লেখায়, দেখবেন, এই কলমচির কথাটা আর নেহাত ধরতাই বুলি থাকছে না।

এসব কথাবার্তা মুলতুবি রেখে না হয় সুভাষের লেখা থেকেই কিছু মোক্ষম উদাহরণ দিই।

(১) "আমি বুড়ো আংলা নই। আমার সুবচনী হাঁস নেই। নইলে—। বাজপাখির দল যখন ওদের হাতকড়া পরিয়ে মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেল—এক হাতে পাশ, এক হতে অঙ্কুশ নিয়ে আমি ছুটে যেতাম। আমি বরকতের ভাই। আমি যে সালামের ভাই। পাখির ভাষায় আমি যে কথা বলি। পাখির ভাষায় আমি যে গান গাই।" (লিখতে বারণ)

(২) "এই দেখুন, এতক্ষণে লোকটাকে মনে পড়ছে। দাওয়ার ওপর বসে কথা হচ্ছিল। সামনের একটা বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল গাঁক গাঁক করে রেডিওর আওয়াজ। মুড়ি, তেলেভাজা আর গরম চা এল। ঢ্যাঙা মত সেই লোকটা। মনে পড়ছে। মুখ মনে পড়ছে। ভুরবেড়িয়ায় গেলেই চিনতে পারব। দাওয়ার ওপর আবার গিয়ে বসলে নামটাও হয়ত মনে পড়ে যাবে। চলে গেলেই তো হয়। হাওড়া থেকে কেন? এবার অছিপুরে গঙ্গা পেরিয়ে উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠব। ফিরব ভোরবেলাকার ফুলের লোক্যালে। আর তা যদি করি, তাহলে আসছে বার এখানে রথের মেলায় আস্ত একটা ভাল ফুলের গাছও আমার কপালে নাচছে।" (ফুলের লোক্যালে বাড়ি ফেরা)

(৩) "বছর শেষ হয়ে এল তাই মন বলল, যাও হে—শেষের সুখটানটা দিয়ে এস বজবজে। বজবজ। সে তো বাসে উঠলেই হুস করে যাওয়া যায়। কিংবা ট্রেনে। এত কাছে বলেই বোধহয় যাব যাব করে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। কতদিন যে ও-রাস্তা মাড়াই নি। টাঁকশাল পেরিয়ে খেয়াল হল—আরে, বেহালাতেই তো আসা হয় নি আজ কত কাল। রাস্তা যে এর মধ্যে এত চওড়া হয়েছে, ট্রাম লাইন যে ডানদিকের বদলে বাঁ দিকে ঘুরে যাচ্ছে—আমার অসাক্ষাতে এমনি অনেক কিছু ঘটে গেছে দেখে একটু অস্বস্তি হল। তার মানে, আমি আর আজকাল সব কিছুর ওপর তেমন নজর রাখতে পারছি না।" (কাছেই বজবজ)

(৪) "আসল নাম বলব না। ডাক নাম—এই ধরুন বাচ্চু চিঠি লিখেছিল জলপাইগুড়ি যেতে। আমি কোনো উত্তর দেব না জেনেও লিখেছিল। উত্তর দেব না বলাটা ঠিক হল না। আসলে আমার চিঠি লেখাটি যেন দেয়ালের সঙ্গে কথা বলা। চিঠি লেখা ব্যাপারটা আমার ঠিক আসে না। কাউকে আমার দরকার হলে ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে দু-চার মাইল হেঁটেও আমি সাক্ষাতে হাজির হতে পারি। কিন্তু চিঠি কেন, টেলিফোনেও আমার হাত ওঠে না। যার সঙ্গে কথা বলব তার মুখ দেখতে না পারলে আমার বেজায় অস্বস্তি হয়।" (যেদিকে দুচোখ যায়)

একবার একটা কবিতায় লিখে ফেলেছিলাম, "কবি তো বসেছে ট্রামে মানুষের পাশে / মানুষের গন্ধ খাবে বলে। / বিকেলের মায়াবী আলোয় / কবিকে মানুষ ভেবে কেউ কেউ ভুল করে খুব।"

সুভাষ হচ্ছেন সেই কবি মানুষের গন্ধ না পেলে যিনি কিছুই লিখতে পারেন না—না গদ্য না পদ্য। তাঁর গোড়ার পর্বের একটি বইয়ের নাম 'পদাতিক'। তা ওই হাটুরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই লেখক হিসাবে আমাদের কাছে এক বা দুই নয়, তিন শক্তি। □

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ। প্রথম খণ্ড / সম্পাদনা : সুবীর রায়চৌধুরী ও অমিয় দেব / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ / ১৫০.০০

সুভাষ অনুরাগীর চোখে নেহরু-সুভাষ বিরোধ

দিব্যেন্দু হোতা

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসচর্চা সঙ্গত কারণেই বহুমাত্রিক। দেশি ও বিদেশি ঐতিহাসিকেরা ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর নিবিড় তত্ত্বতালাশ যেমন করছেন তেমনই এই কাঠামোর প্রেক্ষপটে জাতীয় সংগ্রামের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিজ নিজ মত ও তত্ত্বের আলোকে গভীরভাবে বিচার করার চেষ্টা করছেন। স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর ইংরেজ বিরোধিতার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ভিন্নধর্মী বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের পতাকাতলে স্বাধীনতাপ্রেমী বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের ভারতবাসী একত্রিত হয়ে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং এর পেছনে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ কাজ করেছে—এই ধরনের একদা গৃহীত বক্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। ভিন্নধর্মী বক্তব্য স্বাভাবিক, কেননা এই সময়ের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শগত কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতিহাস চর্চা পদ্ধতিগত দিক থেকে নানা অভিধায় এখন ভূষিত—উপনিবেশবাদী, নয়া উপনিবেশবাদী কেম্ব্রিজগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী ও সাবঅলটার্নপন্থী ইত্যাদি। ভারতবর্ষের ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত বৈষম্যের ফলে জাতীয় আন্দোলনে বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে উনবিংশ শতক এবং বিংশ শতকের চার দশক জুড়ে প্রায় সারা বিশ্বে উপনিবেশবাদ সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ চিন্তাজগতে আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উত্থান পতনের অন্যতম প্রধান পরিচালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। ভারতবর্ষ এই আলোড়নের বাইরে ছিল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়গুলিতে এক এক ধরনের আদর্শের প্রভাব আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে আন্দোলিত করেছে। আদর্শ রূপায়ণের পদ্ধতি কী হবে—এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত ছিল না। ১৯১৯ এর পর থেকে ভারতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধার হয়েছেন। জনমানসে মহাত্মা গান্ধীর বিপুল আন্দোলনের ফলে জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত অহিংস সত্যাগ্রহের পথকে কংগ্রেসের পথ বলে মেনে নিয়েছিল এবং তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীনতাসংগ্রাম ফলবতী হবে—কংগ্রেসের এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা গড়ে উঠেছিল। গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের পতাকাতলে একই সঙ্গে দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব নেতাজি ও জওহরলাল সামিল হয়েছিলেন। 'যৌবনের প্রতীক' 'বামপন্থী' এই দুই নেতা গান্ধীজির অনুগামী হয়েই কংগ্রেস রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং গান্ধীপন্থা মেনে নিয়েই আন্দোলনে যোগ দেন। বলা হয় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য দু'জনেরই সমাজতন্ত্র নিয়ে নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল—অর্থাৎ নিজের মতো করে সমাজতন্ত্রকে তাঁরা বুঝেছিলেন—দুজনের ধারণা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হয়েছিল। জওহরলাল নানা সময়ে গান্ধীপন্থা বিষয়ে প্রশ্ন তুললেও বরাবরই গান্ধী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন পরিত্যাগ করেননি। সুভাষচন্দ্র গান্ধীপন্থার বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। ফলে গান্ধীজি এবং সমাজতন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধেছিল। স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এই দুই নেতার সংঘাত বিষয়ে প্রথাগত ইতিহাসচর্চার বাইরেও গবেষণা হয়েছে। দুই নেতার ব্যক্তিমানস বিকাশের উপাদান এবং জনগণের উপর তাঁদের প্রভাবের ভিত্তি এবং ব্যাপকতা নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে।

স্বাধীনতাসংগ্রাম বিষয়ে লিখিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করলে আর একটি গ্রন্থ হয়ে উঠবে। তবে বেশির ভাগ গ্রন্থই ইংরেজি ভাষায় লিখিত। বাংলা ভাষায় সুলিখিত বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ অমলেশ ত্রিপাঠীর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫–১৯৪৭)' ছাড়া নজরে পড়ার মতো গ্রন্থের খুবই অভাব। বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সেই সময়ের ইতিহাস রচনা আমরা লক্ষ করেছি। এর সংখ্যাও তেমন বেশি নয়। বাংলাভাষাতে তো খুবই কম। নেহরু ও সুভাষের বিরোধকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করার যে প্রচেষ্টা গিরিশচন্দ্র মাইতি করেছেন তার জন্য সাধুবাদ জানাতেই হয়; তিনি সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার ধারার অনুসারী এবং তাঁর নেতাজির প্রতি অনুরাগ স্পষ্ট।

শ্রীমাইতির বইয়ের বিষয় বহুচর্চিত নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের দ্বন্দ্ব এবং তাঁদের ভূমিকা। দেশি বিদেশি বহু ঐতিহাসিক এ বিষয়ে নিজ নিজ মতাদর্শ অনুযায়ী আলোকপাত করেছেন। দুই ব্যক্তিত্বের জীবনী এবং বিশেষ করে আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলি আদর্শগত মতামত স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে। শ্রীমাইতি তথ্যসূত্র হিসাবে প্রায় সমস্ত রচনাগুলি থেকে সাহায্য নিয়েছেন। স্বাধীনতাসংগ্রামের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পর্যায়ে দুই নেতার নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচিগত অবস্থান বিচার বিশ্লেষণ করে লেখক দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে দুইজনের মিলের আড়ালে ছিল মৌলিক পার্থক্য। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর পক্ষপাত তিনি লুকোননি। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন নেহরুর চেয়ে তিনি অনেক বেশি নিজ আদর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন। এবং এই আদর্শের জন্য গান্ধীপন্থা বিসর্জন দিয়ে গান্ধী-নেতৃত্বকে অস্বীকার করার সাহস তিনি দেখিয়েছিলেন। সংগঠনে গান্ধীর কর্তৃত্ব, জনমানসে গান্ধীর আবেদন, গান্ধীর

ডাকে জনসাধারণের সাড়া—এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু গান্ধী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন এবং নিজের আদর্শের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। শ্রীমাইতি এই বহুকথিত বিষয়গুলিকে খুব সাবলীলভাবে বাহুল্যবর্জিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। নিস্পৃহভাবে ইতিহাসের ঘটনাবলিকে বিচার করার আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা তিনি করেননি। দুই ব্যক্তিত্বের সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণার বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুভাষচন্দ্রের এবিষয়ের ধারণাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেকেই সুভাষচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ধারণার অস্পষ্টতা ও বৈপরীত্য দেখিয়ে থাকেন। শ্রীমাইতি সুভাষের ধারণার ধারাবাহিক বিবর্তন তুলে ধরে দেখিয়েছেন এর মধ্যে কোনও বৈপরীত্য নেই। কংগ্রেসের আপসমূলক রাজনীতি সুভাষ মেনে নেননি। তাঁর যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ছিল এই আপসের বিরুদ্ধে। আপসবিরোধী, আজীবন সংগ্রামী, সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজি' ভাবমূর্তি বাঙালির মর্মমূলে এমন ভাবে প্রোথিত যে নেতাজির সমালোচনা বাঙালি চিত্তকে ব্যথিত করে। শ্রীমাইতি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কোনও রাজনৈতিক ভ্রান্তি দেখেননি। নেহরুর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় এই প্রসঙ্গ আসতে পারত। তিনি ওই পথে এগোননি। বাংলার কর্পোরেশন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া, প্রাদেশিক রাজনীতির অন্তর্কলহ ইত্যাদি মূল ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তাঁর অবস্থানকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল না নামিয়ে দিয়েছিল ইত্যাকার নানা প্রশ্ন অনেকের লেখায় তোলা হয়েছে।

নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের আদর্শের লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছিল ব্যক্তিত্বের সংঘাত। এ বিষয়ে শ্রীমাইতি মাত্র শেষ অধ্যায়ে (দশ) আলোচনা করেছেন। তাদের ভিন্ন ধরনের চারিত্রিক গঠন ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁরা একযোগে কাজ করতে পারেননি। তিনি গান্ধীর কৌশলী ভূমিকা'র কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা বিশদ ও বিশ্লেষণধর্মী হলে ভাল হত। সুভাষের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব গান্ধী পোষণ করতেন—এই ধারণার নিরিখে গান্ধীজির মনোজগত ও গান্ধী-দর্শনের বিশ্লেষণ অতি সরলীকরণ মনে হয়েছে। তবে লেখক নেহরু ও সুভাষ বিতর্ককে কেন্দ্রে রেখে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের জাতীয় আন্দোলনের বিশাল ক্যানভাসটি ধরার চেষ্টা করেছেন।

বইটিতে বিভিন্ন অধ্যায় সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত। সাধারণত প্রবন্ধে এই ভাবে লেখা হয়। বইটিতে আলাদা কোনও সূচিপত্র নেই। দুটি মলাটের মধ্যে একটি প্রবন্ধের বর্ধিত রূপ ধরা রয়েছে। লেখক অবশ্য একথা স্বীকারও করেছেন। অধ্যায়গুলির বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে সূচিপত্র থাকলে পাঠকের সুবিধে হত। নিছক প্রবন্ধপাঠের পরিবর্তে বই পড়ার আনন্দ পাওয়া যেত।

বহুচর্চিত বিষয় হলেও লেখক নিজের বক্তব্য প্রচুর তথ্যসূত্রের সাহায্যে নিশ্চিতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তথ্যসূত্রে দীর্ঘ উদ্ধৃতিও ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক বিষয়ে পাঠক তার সঙ্গে এক মত নাও হতে পারেন। তবে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ভাষার গুণে বইটি সংশ্লিষ্ট সকলের পড়তে ভাল লাগবে আশা করি। □

স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল
—গিরিশচন্দ্র মাইতি / মডেল, কলকাতা-৭৩ / ৬০.০০

অক্ষয়কুমার দত্ত

মন্দার মুখোপাধ্যায়

এ বই পড়লে বোঝা যায় অন্নপূর্ণা বিশ্বাস অক্ষয়কুমার দত্তকে কতটা জমি দিতে বদ্ধপরিকর। উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি নিজস্ব মাটি খুঁজে পাওয়া এবং তাতে বীজরোপন এ কী সহজ 'গান'! কিন্তু গবেষকের পরিশ্রম বৃথা হয়নি। পরতে পরতে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি দেখাতে পেরেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত কী এবং কেন।

"জলস্তম্ভ দেখিতে অতি আশ্চর্য। নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলি যেন বিশ্বাধিপতির পৃথ্বীরূপ প্রসাদের পরম রমণীয় স্তম্ভ স্বরূপ প্রতীয়মান হয় এবং জলস্তম্ভ যেন প্রকৃত স্তম্ভ হইয়া তাহা ধারণ করিয়া থাকে"—পৃ. ৬৮ (চারুপাঠ পৃ. ৮৭) অক্ষয় দত্তের এই উদ্ধৃতিটি পড়লে বোঝা যায় বিংশ শতাব্দীতে কেউ একজন যে কবিতায় বিজ্ঞান লিখবেন এ কথা যেন স্থির হয়ে গেল—জগদীশচন্দ্র বসু লিখলেন—"নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? মহাদেবের জটা হইতে"—

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (পৃ. ৬৬)"—একথা অন্নপূর্ণা লিখেছেন। এই বিজ্ঞানচেতনার জন্যই অক্ষয় দত্ত লিখলেন "অতএব অতি অধম প্রাণীও অতি উত্তম বৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট"—(পৃ. ৬৬)। আর এ জন্যই অক্ষয়কুমার চাইলেন বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্মকে এক অখণ্ড সূত্রে যুক্তি ও বুদ্ধির মিলিত আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত করতে।

বর্ধমান জেলার চুপীগ্রাম থেকে যে-জীবনের সূত্রপাত তাতে এসে মিশেছিল নানা পরস্পরবিরোধী এবং পরিপূরক ধারা। অন্যভাবে বলা যায় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ও একমাত্র রচিত পদ্যগ্রন্থ 'অনঙ্গমোহন' দিয়ে যে মননভাবনার সূত্রপাত ঘটে তার পরিসমাপ্তি এল 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ১ম ভাগ

ও ২য় ভাগের মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ রচনা করে। অবশ্য এই গতিপথ কোনও ভাবেই কোনও একরৈখিক সমাধান নয়। বিশেষত অক্ষয় দত্তের মতো ব্যক্তিত্বকে বোঝবার পক্ষে। কারণ এরই মধ্যবর্তী পর্যায়ে তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছেন, যাঁদের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন, লেখালেখি করেছেন যেসব প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন সে সবগুলি একত্র করে তবেই তো নানা অক্ষয় দত্তের এক অখণ্ড মালা। যার চেতনার কেন্দ্রবিন্দু বিজ্ঞান।

এই অক্ষয় দত্তকেই অন্নপূর্ণা বুঝতে চেয়েছেন তাঁর জীবনী, সাহিত্যসাধনা, সমাজচিন্তা, বিজ্ঞানচিন্তা, ধর্মচিন্তা এবং উপসংহারের মধ্যে নিজের খোঁজাটুকুকে মিলিয়েমিশিয়ে। তাঁর মূল্যায়ন ও সঠিক সমালোচনার মাধ্যমে এক অসচরাচর ব্যক্তিত্ব হিসাবে। ঈশ্বরচন্দ্র যদি 'আখ্যান মঞ্জরী' বা 'চরিতাবলী'তে আর একটিও ভারতীয় নাম সংযোজন করতেন তবে নিশ্চয়ই জুড়ে দিতেন অক্ষয় দত্তের কথা। সেই অনেকেরই একজন অক্ষয় যাঁরা মেষপালক হতে হতে অথবা চাষের কাজ করতে করতে আগ্রহ ও মনোবলের জন্য শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। তা না হলে অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু ও নিজের বিবাহ (পৃ. ১৪) তাঁকে যে গুরুদায়িত্বের নিগড়ে বাঁধে তাতে গ্রিক ল্যাটিন হিব্রু জর্মান ইলিয়াড বর্জিল বা কুম্ব স্থান করে নিল কী করে। লেখিকার এ কথা মানতেই হয়—'বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ আর না হলেও তিনি বন্ধু বান্ধবদের সহায়তায় স্বেচ্ছায় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনো চালিয়ে যান। বাস্তবিক পক্ষে তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত এই সময়টুকু তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাল বলা যায়। কারণ এই সময়ে তিনি স্বাধীনভাবে স্বনির্বাচিত বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়নের ফলে তাঁর বহু বিষয়ে আগ্রহ ও দখল জন্মেছিল (পৃ. ১৫)"

ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়েও ভূদেব যখন মনে করছেন "বিদ্যাসাগরের ভদ্রঘরে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন চেষ্টা এবং স্কুল পাঠ্য গ্রন্থে এ দেশীয় বালকদিগের নিকট শুধু বিদেশীয়দিগের চরিত্র ও ব্যবহারকে আদর্শভাবে দেখান—স্ব-সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর—এই দুইটি স্থায়ী হইবে না। অল্পকাল মধ্যে অপ্রচলিত হইয়া যাইবে—(ভূদেব চরিত ১ম খণ্ড পৃ. ১৭৭ / কুমারদেব সম্পা:) সেই একই সময় হিন্দু কলেজ বা সংস্কৃত কলেজের কোনওটিতেই উচ্চশিক্ষার কোনও সুযোগ না পেয়েও অক্ষয় দত্ত তাঁর ধর্মনীতি (১৮৫৬) গ্রন্থে 'বহুবিবাহ বাল্যবিবাহের অবৈধতা বিধবাবিবাহ অসবর্ণ বিবাহের নির্দেশ দিয়ে সে সময়ের সংসার ও সমাজে বিপ্লবাত্মক ব্যাপার করছেন (পৃ. ৮১)"। ভূদেব যখন প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে দ্বিধান্বিত সে সময় অক্ষয় স্ত্রীজাতির বিজ্ঞান পুরাবৃত্ত স্বদেশীয় সামাজিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা দরকার বলে মনে করছেন (পৃ. ৫৯)"।

আবার অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র যখন বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলে প্রকাশ্যে চিহ্নিত করছেন, রামমোহনকে ধর্মের নিরিখে ব্যাখ্যা না করে একজন রেনেসাঁস মানুষ, আধুনিক মানুষ বলে বর্ণনা করছেন সে সময় দেবেন্দ্রনাথ বলছেন "আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ, আকাশ পাতাল প্রভেদ—(পৃ. ৮৪)"। তা না হলে অক্ষয় কেন ভাবলেন "ধর্মের মূল ভিত্তি কোন পুস্তক হইতে পারে না' (১০৪) অথবা "অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র (পৃ. ৮৬)"

আর এই একই কারণে "যখন Law of attraction পিয়ারসনের হাতে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি, অক্ষয়কুমারের কলমে তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, Electricity ম্যাবোর বিদ্যুতীয় সাধন, ব্রিটনের গুণতৃণ মনিভাব, তৃণমণিভাব, অক্ষয়কুমারের তড়িৎ। জনসন ও ফস্টার একটি বিশেষ অভিপ্রেত শব্দ না দিয়ে সময়ে সময়ে একাধিক প্রতিশব্দ দিয়েছেন—যথা Thunder গর্জন, গড়গাড়ান, নাদন, ছড় ছড়ানো, জনমন বজ্রনিস্বন গড়গড়ি মেঘগর্জন মেঘনাদ আকাশের ডাক অক্ষয়কুমারের—বজ্র। ফস্টার volcano পরিভাষা দিয়েছেন জ্বালামুখী। জনসন স্ফুলিঙ্গ নির্গমন ধর্মক কোনও বস্তু। অক্ষয়কুমার আগ্নেয়গিরি। দেখা যাচ্ছে অক্ষয়কুমার ছাড়া অন্যেরা শব্দের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, অনেক ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারই খুব সাবধানতার সঙ্গে পারিভাষিক তাৎপর্য রক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন—(পৃ. ৮০)"। কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনকে নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত করলে সেই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে যে দেশ ও সমাজ সার্থকতা লাভ করে এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—(পৃ. ৮৬)"

অক্ষয়কুমারের জীবনে দিকচিহ্নকারী ঘটনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা। অক্ষয়-দেবেন্দ্রনাথ-ঈশ্বরচন্দ্র এই রসায়নে উনবিংশ শতাব্দীর মানস ক্রমশই সমৃদ্ধ হয়েছিল। তার ফল যে শুধুমাত্র সমাজচিন্তা বা বিজ্ঞানচিন্তা বা ধর্মচিন্তা বা শিক্ষাচিন্তা এমন নয়। বিচ্ছিন্নভাবে এগুলিকে বিচার না করে বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে ফুটে উঠেছিল আরও একটি চরিত্র-ধর্ম—যাকে সামগ্রিক ভাবে বলা যায় বন্ধুত্ব। আমাদের সমাজধর্মে স্তাবকতা ছিল চাটুকারিতা ছিল প্রভুত্ব ছিল বিরোধ ছিল গুরুশিষ্য সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বিপরীতধর্মিতার দুপ্রান্তে থেকেও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে সমাজকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—এমনটা ছিল না। মননসচেতন ব্যক্তিরা সামাজিক উদ্বৃত্ততায় ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে একে একে পুনবার্সিত হতে লাগলেন বন্ধুত্বের নিবিড় শুশ্রূষায়। এর সূচনা হয়েছিল রামমোহন-দ্বারকানাথে। পরবর্তীকালে তা নিষ্প্রাণ হয়ে গেলেও

অক্ষয়-ঈশ্বর, ঈশ্বর-মাইকেল বা ঈশ্বর-মদনমোহন এ সম্পর্কের কোনও অবসান ঘটেনি। আর তা ভাঙেনি বলেই এই সব মানুষগুলি সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনর্বাসিত হয়েছেন। মধুসূদনের বাংলা নাটকে আসা, পাণ্ডিত্যের নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজসংস্কারক হওয়া আর প্রথাগত শিক্ষার তকমা না থাকা সত্ত্বেও অক্ষয় দত্তের শিক্ষা ও শিক্ষকের জীবনযাপনে সফল হয়ে ওঠা—এ এক আশ্চর্য ঘটনা বই কি।

প্রশ্ন উঠতে পারে অক্ষয়কুমার সম্পর্কে এ বইটি কতটা সাহায্যকারী। এরকম একটি বই যেচে কিনে লোকে পড়বে কি না। এ প্রশ্নের উত্তরে বলতেই হয় যে এত সংখ্যক লোকে এ বই কিনে পড়বে না যে বছরে বছরে তা সংস্করণযোগ্য হবে। এমন গবেষণাগ্রন্থ যাঁরা লেখেন তাঁরা তো কিছুটা সময় ও অর্থ অপচয় করবেন ধরে নিয়েই কাজে হাত দেন। কারণ যাঁদের ওপর এই সব কাজ তাঁরা তো সর্বস্ব পণ করেও করেছিলেন।

তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় গবেষণা আকর হিসাবে এটি কতটা মৌলিক, যুক্তিনিষ্ঠ এবং আন্তরিক। শেষ মাপকাঠিতে বলা যায় আন্তরিকতা এ বইয়ের এক মস্ত সম্পদ। বালক অক্ষয়কে চুপীগ্রাম থেকে যাত্রা করিয়ে বালির গঙ্গাতীরবর্তী 'শোভনোদ্যান'-এ পৌছে দেওয়া বা 'অনঙ্গমোহন' থেকে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' অবধি একটি মননে চিহ্নিত করতে অন্নপূর্ণার পরিশ্রম অক্লান্ত। মৌলিকত্ব তাঁর সম্পাদনায়। অক্ষয় দত্তের সমগ্র রচনার একটি তথ্যমূলক চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। হয়ত এই সূত্রেই কোনওদিন সঙ্কলিত অক্ষয় দত্তকে পাব আমরা। আরও ভাল লাগে যখন দেখি স্পষ্ট অল্প কথায় কিছু কিছু বিরোধের শুধু আভাস দিয়েই অক্ষয় দত্তের ব্যক্তিত্বকে বুঝতে সাহায্য করেছেন। লেখকের পাণ্ডিত্যের প্রভায় ভারাক্রান্ত না হয়েও আমরা বুঝতে পারি বিজ্ঞানসাধনায় কেন অক্ষয়-রাধাকান্ত সমমনস্ক হয়েও জুটি বাঁধলেন না (পৃ. ৬৩) বা অক্ষয় দত্তের অর্থনীতি সম্পর্কিত ভাবনায় রামমোহনের বিপরীতে তাঁর অবস্থান (পৃ. ৫৫)। এই সব বিরোধের প্রতিষ্ঠায় রামমোহন বা রাধাকান্ত নামক রেখাগুলিকে দুদিকে মুছে ছোট না করে অক্ষয় দত্ত নামক রেখাটিকে এমন বড় ভাবে টেনেছেন যে অপর দুটি রেখাকে স্বাভাবিক ভাবেই তুলনায় কিছুটা ছোট মনে হয়েছে। সুগবেষণার এ আর এক ঐশ্বর্য।

আরও একটি প্রয়োজনীয় দিক এই যে তিনি অক্ষয় অবদানে মগ্ন হলেও আচ্ছন্ন নন। তাই সম-আলোচনার অভাব নেই এতে। "অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে তাঁর বিজ্ঞানচিন্তায় সীমাবদ্ধতাও ছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনা আগাগোড়া বিশুদ্ধ ছিল না। জর্জ কুম্বের মতবাদ দ্বারা তিনি খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই পদ্ধতি কুম্বের সময়ে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করলেও এই চিন্তাও পুরোপুরি বিশুদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞানের আরোহ পদ্ধতি অপেক্ষা অবরোহ পদ্ধতি অবলম্বন করে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হত। এজন্য তাঁর রচনা বিশ্লেষণধর্মী না হয়ে বর্ণনাত্মক হয়ে উঠেছিল (পৃ. ১১৬)" যে-বিজ্ঞানমনস্কতার জন্য অক্ষয় স্মরণীয় সেই গাছের শিকড়কে কেটে ছেঁটে সিদ্ধান্তে আসা এ কম সাহসের নয়। হয়ত কোনও সাহিত্যমনস্ক বিজ্ঞানীর কখনও ইচ্ছে হবে অক্ষয় দত্ত ও কুম্বের তুলনামূলক আলোচনায় ডুব দিতে।

তবে বিড়ম্বনাও আছে। প্রথমত বলার যে অক্ষয় দত্তের রচনার পূর্ণাঙ্গ তালিকায় 'অনঙ্গমোহন' কাব্যসংগ্রহটির উল্লেখ নেই কেন? কবিতার বই বলেই কি? বাংলাভাষাকে যে বিজ্ঞানমনস্কতা পেয়ে বসেছিল তার উন্মেষ যে কবিতায় হবে এ তো ধ্রুব সত্য।

দ্বিতীয় কথা অন্নপূর্ণার সূত্র ব্যবহার প্রসঙ্গে। বিশেষত যেগুলি যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত যেমন তত্ত্ববোধিনী বা বিদ্যাদর্শন সেখানে অক্ষয়-ঈশ্বর বা অক্ষয়-প্রসন্ন ঘোষ বলেই ধরে নেওয়া সমীচীন নয় যে এগুলি অক্ষয়েরই লেখা। বিশেষত তত্ত্ববোধিনী চৈত্র ১৭৭৭ শক / ১৫২ সংখ্যা বা ১৭৭৬ শক / ১৪০ সংখ্যা যেখানে প্রসঙ্গ বহুবিবাহ বা বিধবাবিবাহ যার নেতৃত্বের পুরোভাগে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র। লেখিকা নিজেই যেখানে নিশ্চিত না হয়ে লিখছেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত তার অধিকাংশই অক্ষয় কুমারের লেখা (পৃ. ৬৮)"।

অক্ষয় দত্তের মৌলিকত্ব চিহ্নিতকরণে অন্নপূর্ণার বাক্যবিন্যাস কিছুটা অদলবদলের দাবি রাখে। অর্থাৎ অক্ষয় দত্ত কোথায় সহযোগী আর কোথায় একক—এ রকম একটি ভাবনা গড়ে তুলতে গেলে পরিষ্কার করে আগে আসবে তাঁর বিজ্ঞানচিন্তার কথা। সেক্ষেত্রে "কেবল মাত্র সমাজ সংস্কার আন্দোলন নয় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় অক্ষয় কুমার দত্তের ভূমিকা স্মরণীয় (পৃ. ১১৫)"। এরকম চিন্তার প্রকাশ হয়ত—কেবলমাত্র জ্ঞানবিজ্ঞান নয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনেও অক্ষয় দত্ত—এ জাতীয় বক্তব্য বিন্যাসের দাবি রাখে।

আর বলা পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে। রোগাক্রান্ত অক্ষয়ের নারায়ণ প্রণামের ঘটনা বা জর্জ কুম্ব প্রসঙ্গ একাধিকবার আনা অনাবশ্যক মনে হয়েছে। আর এই একই কারণেই উপসংহারটিকেও একই কথার সংক্ষিপ্ত রূপ বলে মনে করা হয়েছে।

উপসংহারে তাঁর বক্তব্যতেও কিছুটা গোলমাল বেধেছে। কারণ তাঁর শেষ কথা ব্যক্তি অক্ষয়ের মৌলিক অবদানে শেষ না হয়ে তা শেষ হয়েছে এই ভাবে—'সমাজজীবনে আধুনিক

বিজ্ঞান চিন্তার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এভাবে অক্ষয় কুমারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের মধ্যভাগেই ধর্মের আধুনিকীকরণ সম্ভব হল।

ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে সে যুগে এ এক অসাধারণ বিপ্লব। কোনও দেশের রাষ্ট্রজীবনে বা ধর্মজীবনে বিনা রক্তপাতে এ রকম বিপ্লব কখনও সম্ভব হয়নি। বলা যেতে পারে ধর্মচিন্তায় এতখানি পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে এদেশে সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে দ্রুত সংস্কার সম্ভবপর হয়েছে—(পৃ. ১১৭)"।

অথচ উপসংহারে প্রত্যাশা ছিল এরকম একটি মূল্যায়নের—"বাস্তবিকই জাতীয় জীবনে তাঁরা (অক্ষয়-ঈশ্বর) যে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তায় দেশকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন তা সফলতার সঙ্গে অনুসৃত হলে আমাদের পারিবারিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গ্লানি ও জড়তা মুক্ত হয়ে এক সুস্থ সবল শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন জাতিরূপ পরিগণিত হত (পৃ. ৮৬)" □

অক্ষয়কুমার দত্ত: সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তা—অন্নপূর্ণা বিশ্বাস / র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা-৯ / ৫০.০০

বঙ্গাব্দের উৎসকথা

বসন্তকুমার সামন্ত

'বঙ্গাব্দ' কথাটির মধ্যে 'বঙ্গ' থাকলেও বঙ্গদেশবাসীর জীবনে এর ব্যবহার সীমিত। বহির্ভারতীয় অব্দের মধ্যে খ্রিস্টাব্দ ব্যাপকভাবে প্রচলিত এ-দেশেও। আজ কোন তারিখ জানতে চাইলে অনেকেই তার উত্তরে বলবেন—'১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নভেম্বর'। কিন্তু আজকের তারিখ যে '১৪০৫ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ'—ঠিক মতো এ কথা বলতে পারবেন হাতে গোনা কয়েকজন লোক। বাংলা পঞ্জিকা (গুপ্তপ্রেস, পি.এম. বাকচি, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, মদন গুপ্ত, বেণী মাধব শীল, বা যে কোম্পানিরই হোক) অনেক বাড়িতে একটি করে বঙ্গাব্দ শুরু হওয়ার সময় কেনা হয়। তবে তারও ব্যবহার শুভ কর্মের তারিখ, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যার তিথির অবস্থান বা তেমন কোনও শুভ যোগ নির্ণয়ার্থে হয়ে থাকে। আবার পঞ্জিকাভেদে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই উৎসবের জন্য ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে সরস্বতী পূজানুষ্ঠানের তারিখ ছিল ১৩ মাঘ বুধবার, মতান্তরে ১৪ মাঘ বৃহস্পতিবার।

আর সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ঘটেছে বঙ্গাব্দের জন্মকথা নিয়ে। আন্তর্জাতিক বৎসর খ্রিস্টাব্দের আদি বিন্দু সম্পৃক্ত হয়েছে যিশুখ্রিস্টের জন্ম তারিখের সঙ্গে (A.D. = Anno Domini অর্থাৎ in the year of our Lord') অবশ্য যিশু যে দিন জন্মেছিলেন সেদিন থেকে খ্রিস্টাব্দ চালু হয়নি—শিশু যিশুর ঐশ্বর্য গরিমা তখন কোন অব্দ প্রবর্তকের চিন্তায় আসবে! তাঁর জন্মের ৫৩২ বৎসর পরে রোমান ধর্মযাজক ডায়োনিশিয়াস এক্সিগিউয়াস প্রস্তাব করেন যে যিশুর জন্ম থেকে বৎসর গণনা করে একটি অব্দ চালু হোক। তিনি হিসাব করে দেখালেন যে যিশু জন্মে ছিলেন ২৫ ডিসেম্বর ৭৫৩ Avc (Avc = Anno urbis conditace = year of founding city) অর্থাৎ রোমনগরী স্থাপনার ৭৫৩ তম বৎসরে। পরবর্তী জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকে খ্রিস্টাব্দ চালু হয়েছিল কিন্তু পূর্বোক্ত রোমান যাজকের হিসাবে কিছু ভুল ছিল। পরে জানা গেছে, যিশুর জন্ম হয়েছিল কম পক্ষে আরও চার বৎসর আগে।

এখন বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে আদি বিন্দু কী? এ-বিষয়ে বহু প্রচলিত মত—এটির তেমন আদি বিন্দু নেই; বঙ্গাব্দ হিজরা অব্দ-সংশ্লিষ্ট একটি শাখা মাত্র। প্রচলিত মতটি ঠিক মতো বুঝতে হলে প্রথমে সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসর জানতে হবে। সূর্যের চার দিকে পৃথিবীর একবার পরিক্রমণকাল এক সৌর বৎসর যার পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড (প্রায়)। তাই সাধারণ বৎসর ৩৬৫ দিনে হলেও পরে দু'দফায় কিছু আইন করে প্রতি ৪০০ বৎসরে ৯৭টি ৩৬৬ দিন মেয়াদের অতিবর্ষ (Leap year) আনা হয়েছে; অতিবর্ষে ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিনে হয়।

আর পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর চার পাশে এক পাক ঘুরে আসে মোটামুটি ২৯½ দিনে—যাকে বলা হয় এক চান্দ্র মাস। ফলে এক চান্দ্র বৎসরে সৌর দিনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৪। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চান্দ্র বৎসর হিসাবে হিজরা অব্দ চালু হয়েছিল ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই শুক্রবার থেকে হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় শুভাগমনের দিনকে স্মরণে রেখে। "মুসলমানগণের আক্রমণের পর এদেশে রাজকার্যে হিজরা অব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে।...কিন্তু হিজরা অব্দ ৩৫৪ দিনে পূর্ণ হয় বলিয়া উহার বর্ষারম্ভ বৎসরের যে কোনও সময়েই হইতে পারে। পরন্তু ৩২½ বৎসর পর পর হিজরা সনে এক বৎসর করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাতে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রাজকার্যের অসুবিধা হয়। এই জন্য সম্রাট আকবরের সময়ে হিজরাকেই ৩৬৫ দিনে গণনা করিবার ব্যবস্থা হয়।" [ভারতকোষ—প্রথম খণ্ড পৃ. ৯১)। কাজেই আকবর-নির্দেশিত বঙ্গাব্দের প্রাক—১৫৫৬ খ্রিঃ অংশ চান্দ্র মতে ও পরবর্তী অংশ সৌর মতে গণিত হয়েছে। স্মরণীয়

চান্দ্র মতে গণনা কৃত হিজরা অব্দ এখনও চালু আছে। বঙ্গাব্দের উৎস হিসাবে একথা মেনে নিলে আমাদের এটিকে Luni-solar Calendar (চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা) বলতে হয়।

তবে বহুল-প্রচলিত এই মত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-সঙ্কলিত ভারতকোষ গ্রন্থে নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী লিখিত নিবন্ধে স্থান পেলেও (এখানে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের হিজরা সংখ্যা ৯৬৩ এর সঙ্গে তৎপরবর্তী সৌর বৎসর সংখ্যা যোগ করলে বর্তমান বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়) ক্রমে এ-বিষয়ে জ্ঞানী-গুণীজন ভিন্ন একটি মত হাজির করেছেন। এত দিনের প্রচলিত মত যাঁরা খণ্ডন করছেন তাঁদের যুক্তি, কেবল রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনে আকবর বঙ্গাব্দকে এমন একটি অব্দ চালু করলেন যেখানে তখন তাঁর আধিপত্যের বিস্তৃতি সীমিত বলা চলে। তা ছাড়া, আকবরের আমলে বঙ্গাব্দ-শাখার উৎপত্তি হলে প্রাক-আকবর যুগে বঙ্গাব্দের ব্যবহার থাকার কথা নয়। ১৪০০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'উদ্বোধন' পত্রিকায় সুষমা সরকার লিখেছেন যে বাঁকুড়া জেলার ডিহর গ্রামে যে জোড়া শিবমন্দির আছে তাতে বঙ্গাব্দের উল্লেখ আছে। পণ্ডিতদের মতে মন্দিরদুটির বয়স অন্তত আট শত বৎসর। কাজেই এখানে বঙ্গাব্দের উল্লেখ থাকলে কীভাবে তাতে আকবরের ভূমিকা থাকতে পারে? পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত 'বাংলা ৯৮৫ সাল' এ হাতে লেখা কাশীদাসের আদিপর্বের এক পুঁথির 'ফটোকপি' নিঃসন্দেহে বঙ্গাব্দের প্রাচীনত্বের প্রমাণ করে।

সেক্ষেত্রে বঙ্গাব্দের আদি বিন্দু কী? এখন পণ্ডিতসমাজ আদি বিন্দু হিসাবে মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের রাজত্বের সূচনাকাল বলেছেন। পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে শশাঙ্কদেবের সার্বিক মূল্যায়ন এখনও সম্ভব হয়নি। আনুমানিক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মেছিলেন এবং জন্ম বা বসবাস সূত্রে বাঙালি ছিলেন। গুপ্তবংশীয় রাজা মহাসেনগুপ্তের অধীনে সামন্ত হিসাবে তাঁর কর্ম-জীবনের শুরু—ক্রমে তিনি হন 'মহাসামন্ত' এবং পরে গৌড়বঙ্গে এক স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। বঙ্গের অন্যতম নগরী কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী, তিন দশকের বেশি সময় ছিল শশাঙ্কের রাজত্বকাল। হিসাব মতো ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সোমবার বঙ্গাব্দের আদিবিন্দু অর্থাৎ ১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ। শশাঙ্ক ছাড়া তেমন কোনও খ্যাতনামা শাসকের কথা ভাবা যায় না যিনি ওই সময়ে বঙ্গাব্দের সূচনা করতে পারেন। প্রত্যক্ষ পাথুরে প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারলেও বঙ্গাব্দের সূচনার সঙ্গে রাজা শশাঙ্কের স্বাধীন রাজত্বের ঘোষণাকে জড়িত করতে পারা যায়।

একটা কথা উঠতে পারে। বঙ্গদেশের প্রাচীন মন্দিরগাত্রে বা পুঁথিপত্রে বঙ্গাব্দের বহুল ব্যবহার নেই কেন? এর উত্তরে বলা যায় ঘোরতর বৌদ্ধ ধর্ম-বিদ্বেষী শৈব ধর্মাবলম্বী শশাঙ্ককে পাল ও সেন রাজারা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন! তা ছাড়া পাল রাজাদের ছিল পালসংবৎ এবং লক্ষ্মণ সেন চালু করেছিলেন লক্ষ্মণাব্দ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ৫৯৫—৬২৫ খ্রিঃ গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজত্ব বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেক্ষেত্রে ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সেই রাজত্বের সূচনাকাল ভাবলে ঐতিহাসিক কোনও ভ্রান্তি আসছে না।

যা হোক, বঙ্গাব্দের সঙ্গে শশাঙ্কদেব ও আকবর বাদশাহের নাম জড়িয়ে দুটি তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে। তবে আকবর বঙ্গাব্দ এনে থাকলে তা এনেছেন হিজরাব্দের সৌর-সহোদরা হিসাবে। সেক্ষেত্রে পুরাতন তেমন কয়েকটি মন্দিরে বঙ্গাব্দের উল্লেখ ব্যাখ্যাত হতে পারছে না। তাই বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার শুভ তারিখ হিসাবে বঙ্গাব্দের সূচনা করেছিলেন—এমন কথা ইতিহাসের অনুমোদন পেতে পারে। তবে এই তত্ত্বকে তথ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সার্থক গবেষণা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

লেখক তাঁর 'বঙ্গাব্দের উৎস কথা' গ্রন্থে বঙ্গাব্দের অধিবর্ষ গণনার একটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন এবং পরে সেই নিয়মের গাণিতিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শুরুতে বঙ্গাব্দের একটি অধিবর্ষ তালিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে। আর একটি তালিকায় প্রতিটি বঙ্গাব্দের নববর্ষ দিনটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খ্রিস্টাব্দ মাস, তারিখ ও বার নির্দিষ্টভাবে লেখা আছে। একটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার 'সপ্তর্ষি অব্দ' থেকে খ্রিস্টাব্দ'—৩৯ টি ভারতীয় অব্দ ও তৎসহ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ব্যাখ্যা করেছেন।

পঞ্জিকা প্রসঙ্গে গ্রন্থে তার পাঁচ অঙ্গ—বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণের কথা সংক্ষেপে আলোচিত। বাংলা পঞ্জিকা বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও এখানে প্রকৃত সৌর বর্ষমানকে বাদ দিয়ে 'মান্ধাতা আমলের সেকেলে' নিরয়ন বর্ষ মান ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতে প্রতি ৪০০ বৎসরে ৯৭টি অধিবর্ষের স্থলে ১০৩টি অধিবর্ষ এসে যাচ্ছে। ফলে বঙ্গদেশের ঋতুচক্রের সঙ্গে তার মাসের বাবধান তৈরি হচ্ছে। এই অসুবিধা দূর করতে ভারত সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকায় আন্তর্জাতিক সৌর বর্ষ-মান ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু প্রাচীনপন্থী কিছু মানুষ রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকাকে মানতে চান না তার শুদ্ধতা সত্ত্বেও।

আলোচ্য গ্রন্থে খ্রিস্টাব্দের ও বঙ্গাব্দের আদি বিন্দু নির্ণয় করে বলা হয়েছে ১ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ছিল শনিবার এবং বঙ্গাব্দ পুরাপুরি সৌর বৎসর দ্বারা গণিত হয়ে থাকলে ১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ অবশ্যই সোমবার হবে।

ঐতিহাসিক অতুল সুর গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন। তিনিও প্রশ্ন রেখেছেন রাজকার্যের সুবিধার জন্য হিজরাব্দকে বঙ্গাব্দে

পরিণত করে থাকলে আব্বর কেন কোনও দিন রাজকীয় কাগজপত্রে বঙ্গাব্দের ব্যবহার করেননি। "কোনও মতবাদকে নস্যাৎ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার পিছনে যে সব যুক্তি থাকার প্রয়োজন তা মিটিয়েছেন গবেষক লেখক শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।".... তাঁর 'বঙ্গাব্দের উৎস কথা'য় তিনি যে ঐতিহাসিক সত্য প্রচার করেছেন তা তথ্যনিষ্ঠ গবেষণার দ্বারা স্বীকৃত হোক এমন আশা রাখি। □

বঙ্গাব্দের উৎস কথা — সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা / ৭৫.০০

লালন : সত্য পরিচয়

সৌমেন সেন

পঞ্চাশের দশকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে কিশোর কিশোরীদের জন্য একটি জীবনী সিরিজ শুরু হয়। কয়েকটি বই বেরনোর পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। প্যাপিরাস কর্তৃপক্ষ এই সিরিজের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। আগে প্রকাশিত বইগুলি তো আছেই, নতুন সংযোজনে সব মিলিয়ে এই সিরিজের বই-এর সংখ্যা এখন পর্যন্ত পঁচিশ। আলোচ্য লালন পঁচিশতম। এই উদ্যোগের জন্য প্যাপিরাসকে ধন্যবাদ জানাই।

লালনজীবনী লেখার যোগ্য অধিকারী আর কে হতে পারেন, সুধীর চক্রবর্তী ছাড়া? ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'ত্রাতা লোকায়ত লালন' লালন-গবেষণায় মূল্যবান সংযোজন। আর কিশোর কিশোরীদের জন্য জীবনীগ্রন্থও যে গবেষণার আকর হতে পারে আটান্ন পৃষ্ঠার এই ছোট্ট রচনা তার প্রমাণ। কে না জানে লালন জীবনী নিয়ে নানা বিতর্ক, নানা পক্ষপাত; বাস্তব তথ্য ও কল্পিত তথ্যের মধ্যে ফারাক করা কঠিন। কিন্তু 'লালন ফকির নামের পুরনো মানুষটার সম্পর্কে' যে 'কৌতূহল জাগে', তাঁকে সুধীর চক্রবর্তী যে ভাবে 'খুঁজেছেন', তা সহজপাঠ্য জীবনীগ্রন্থের আদর্শ হয়ে রইল।

তাঁর ধর্মদর্শন, জীবনচর্যা, তাঁর গান সব মিলিয়ে যে এক সম্পূর্ণ মানুষ লালন, সেই মানুষটি ও তাঁর কালকে এই ছোট্ট বইয়ে, স্বচ্ছন্দ ভাষায় সুধীর চক্রবর্তী প্রকাশ করেছেন। লালনের জীবনীবিতর্কের উল্লেখ যেমন আছে, আছে লালন-রবীন্দ্রের সম্পর্কের খবর, কিংবা লালনের হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ কাঙাল হরিনাথ ও মীর মশাররফ হোসেনের কথা (যদিও মীর মশাররফ হোসেনের মতো মানুষও লিখেছিলেন: ঠোঁটা গুরু ঝুটা পীর / বালা হাতে নেড়ার ফকীর / এরা আসল শয়তান, কাফের বেইমান / তা কি তোমরা জান — পৃ. ৫৫), কিন্তু সব ছাপিয়ে আছে 'মানুষ ভজা' এক জীবনদর্শীর কথা। আসল লালনকে এভাবেই চেনা যায়। সুধীর বলছেন, 'লালনজীবনের বাহ্য ঘটনা বা ঘটনাহীনতা থেকে তাঁর অন্তর্জীবন বা অনুভবকে ধরা যাবে না। মধ্যযুগের ভারতীয় সন্তসাধক কবীর-নানক-দাদূ-রজ্জব-শুক্কহংস-মীরা বা একনাথের মতো লালনও একটি গভীর নাম, যাঁর কোনো পদবি নেই...আসল লালনকে আমরা এভাবে জানব' (পৃ. ৫১)।

আর যাদের জন্য বইটি লেখা তারাও এই পদবিহীন মানুষটিকে এভাবেই জানুক, সেই পরিকল্পনাতেই তিনি এই জীবনী লিখেছেন।

'মরমি সাধক' তকমায় যে প্রহেলিকা আছে, যা ঘিরে আছে লালনদের, মনে হয় সেই প্রহেলিকা সরাবার একটা চেষ্টা হওয়া উচিত। লালন-গবেষকদের কাছে এটি আমাদের একটি প্রত্যাশা। এখনও যখন, অতি সম্প্রতি প্রকাশিত আলোচনায় ('লালনগানের দর্শন', মো: সোলায়মান আলী সরকার, লৌকিক বাংলা, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭) বলা হয় যে লালন 'একেশ্বরবাদী, ভাববাদী, আধ্যাত্মবাদী বা আল্লাহবাদী চিন্তাবিদ, তখন 'মানুষ ভজা' 'প্রতিবাদী' 'ত্রাতা লোকায়ত' লালনকে চেনা যায় না। ভুলে যেতে হয় যে 'লালনকে কোনো বাঁধা ছকে ফেলা যাবে না'। এই বাঁধা ছকের বাইরের লালনের পরিচয়ই দিয়েছেন সুধীর চক্রবর্তী: 'তাঁর গান কেবল আধ্যাত্মিক বা ভাববাদী নয়, বরং সামাজিক প্রশ্নে জড়িত, যুক্তিতে ঋজু, প্রতিবাদে বাস্তব। তাতে আধুনিক একজন জিজ্ঞাসু মানুষের স্বর লুকনো আছে। ধর্মজাতিবর্ণ ঘটিত অপ্রয়োজনীয় কৌতূহলের টানে প্রকৃত লালনকে আমরা আজও বুঝিনি' (পৃ: ৫১)। প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু তাঁদের (লালনদের) কথা শুনছে কে? কতজন মরমি আছেন সমাজে, যাঁরা শুনতে চান অবহেলিত প্রতিবাদী এই মানুষগুলির ভাষা'? (পৃ: ৫৬–৫৭) শোনা তো দূরের কথা, তাঁর কাছে লালনের মতো 'বাউল ফকিরদের নিয়ে ভদ্রলোকদের মস্তব্য, ঘৃণা আর বিদ্বেষ অনেকটাই একপেশে, নির্মম, সহানুভূতিহীন (পৃ: ৫৬)।' মৌলবাদ তো শুধু আজকের রোগ নয়, লালনের কালেও ছিল, তার হিসাব দিয়েছেন সুধীর চক্রবর্তী। যে ত্রাতাজনের 'গলায় পৈতে নেই, নেই তসবি মালা', তাঁদের ঘৃণা করা হয়েছে, তাঁদের আখড়া ভেঙে দিয়ে, চুল দাড়ি কামিয়ে ভিটেছাড়া করা হয়েছে: (পৃ: ৫৪) আর এই ছোটলোকদের সম্পর্কে লেখালেখিও কম হয়নি।

লালনের জীবনচর্যা, দর্শন, ধর্ম তো এই মৌলবাদী জাতপাত, সংকীর্ণতা, পৈতে-তসবিমালা ইত্যাদি উৎপাতের প্রতি ধিক্কার ও প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদকে শুধু 'মরমি' আখ্যা দিলে আক্ষেপ

হয়। তাঁদের ভাষার 'আলো আঁধারি'কে বুঝতে না পেরেই এই তকমা আঁটা। তা তাঁদের সত্য পরিচয় নয়। 'মানুষ ভজা' লালনের সত্য পরিচয়ই উপস্থিত করেছেন সুধীর চক্রবর্তী তাঁর এই ছোট্ট জীবনীগ্রন্থে, তাঁর অন্যান্য রচনায় যা আরও বিশদে পাওয়া যাবে। □

লালন — সুধীর চক্রবর্তী / প্যাপিরাস, কলকাতা-৪ / ২০.০০

বাঙালির সাম্যবাদ চর্চার ইতিবৃত্ত

শতদ্রু চাকী

কমিউনিজমের জন্ম ইউরোপে। যদিও রুশ বিপ্লবের অনতি উত্তরকাল থেকেই বাঙালির সঙ্গে ওই 'কমিউনিস্ট ভাবধারা, দর্শন ও সংগঠনের নিবিড় যোগাযোগ।' মূল গ্রন্থে প্রবেশ করার আগে, প্রচ্ছদপত্রে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত একটি বয়ান থেকেই পাঠকের জানা হয়ে যাচ্ছে এই সংবাদ। গ্রন্থ বলতে — 'বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা'। বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলাদেশ। একদিকে বিদেশি শাসনশোষণের বিরুদ্ধে উত্তাল নানা অসন্তোষের আবর্ত, অন্যদিকে, উনিশ শো সতেরয় রাশিয়ায় ঘটে যাওয়া যুগান্তকারী ঘটনার অভিঘাত। দেশ ও বিশ্বের যে মাধ্যাকর্ষণে থেকেই কেটে যায় বাঙালি জীবন ও মানসের তিন তিনটি দশক। ক্ষুব্ধ, স্বপ্নাময়ী আর সম্ভাবনাপূর্ণ! অবশেষে 'স্বাধীনতা'। অন্তবর্তী যে কাল-পরিসরে বাংলা ভাষাতেও সচল থেকেছে সাম্যবাদী চর্চারও জোরাল একটি প্রবাহ। যেখান থেকে বাছাই করা এক প্রস্থ লেখাকেই দু'মলাটের ভেতরে সযত্নে, সাজিয়ে দিয়েছেন শ্রীমতী শিপ্রা সরকার ও অনমিত্র দাশ।

সংকলনটি যেহেতু চর্চা বিষয়ক এবং চর্চাটাও যেহেতু কমিউনিজমকে কেন্দ্র করে, এই রকম একটা প্রত্যাশাও গড়ে ওঠে পাঠকের মনে যে, চালচিত্রের অনেকটা জুড়েই থাকবে সেখানে, হাতেকলমে অনুশীলনেরও প্রাণবন্ত কিছু প্রতিফলন। তা ছাড়া পূর্বাহ্নেই যেখানে পাঠককে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওই রকম একটি তথ্য। যেটিকে উদ্ধৃত করেই আরম্ভ হল আজকের এই সমীক্ষা। সে তথ্যটাই আরও খানিকটা মদত পায় সম্পাদকের নিজস্ব আলোকপাত থেকে। প্রথাগত ভূমিকা না হয়ে, কার্যত যা হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র একটি নিবন্ধ প্রায়, ঋদ্ধ আর সারগর্ভ।

এ কথা সত্যি, যে-তিনটি দশকের প্রেক্ষাপটে সংস্থাপিত ওই চালচিত্র, সমগ্র সেই পর্বটি জুড়েই পার্টিকে কাজ করতে হয়েছে প্রায় অজ্ঞাতবাসে থেকে। তবু সেই গুপ্ত পার্টি, গুপ্ত আধাগুপ্ত যত গণসংগঠন ও তার নেতৃত্ব, পাশাপাশি ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সহমর্মী এবং মোটেও অঙ্গুলিমেয় নয়, এই রকম বেশ কিছু সংঘ, সমিতি ছিল তো এই সব মিলিয়ে, যাকে বলে, অনুপ্রাণিত একটা নেটওয়ার্ক। যাকে কেন্দ্র করেও আবার গড়ে উঠেছে রীতিমত একটা রাজনৈতিক সাহিত্য বলয়। হয়ত তৎকালের বিচারে 'নিষিদ্ধ ইস্তেহারে'র-ই নিয়তিলাঞ্ছিত সেই সাহিত্যের অধিকাংশ রচনাই কিন্তু যে কোনও গবেষকের কাছেই তা প্রায় অনাবিষ্কৃত এক তথ্যের আকর। তার সঙ্গে চাঞ্চল্যকর ওই সব সওয়াল জবাব, আদালতের মঞ্চগুলি থেকে। '২৪শে কানপুর, '২৯শে মীরাট। আইনের ভাষায় — 'ষড়যন্ত্র মামলা'। যে উপলক্ষেই সাড়া জাগানো ওই সব জবানবন্দি। কমিউনিস্টস চ্যালেঞ্জ ইমপিরিয়ালিজম ফ্রম দা ডক্। সে সবও তো ছিল কমিউনিজম চর্চারই কিছু আয়েয় উচ্ছ্বাস। নিষেধটা অবশ্য প্রত্যাহৃত হয়েছে পরে। আইনি হয়েছে পার্টি, 'মিত্রশক্তি'র শরিক যখন সোভিয়েত। বর্ণিত ওই সময়পটের খাঁজে খাঁজে ফেলে বললে — বিয়াল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ। যে বছর পাঁচেকের ভেতরেও পার্টির নিজস্ব উদ্যোগেই বার হয়েছে আশু ও দীর্ঘমেয়াদি নানা জাতের লেখা। আন্দাজ করা যায় যে, ওই সব পত্র পুস্তিকার মাঝখানেও ধরা আছে কমিউনিজম চর্চারই কিছু উষ্ণ শোণিতপ্রবাহ। আজকের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বা আরও পাঁচটি সূত্রে হয়ত সে সব মালমশলারও কিছু কিছু প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছে। তবু এই সংকলনেও থাকতে পারত বইকি সেই সব লেখালেখির অন্তত প্রতিভূস্থানীয় কিছু কিছু নমুনা। বিশেষ করে যুদ্ধ — আকাল — দাঙ্গা — দেশভাগ পর্বের প্রসঙ্গভিত্তিক কিছু কিছু লেখা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক্ষুনি কারও হয়ত মনে পড়বে, প্রয়াত ভবানী সেনের 'ভাঙনের মুখে বাংলা' (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। মে, ১৯৪৫), অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু ও মুসলিম' (ঐ। এপ্রিল, ১৯৪৬), কিংবা কিশোরবাহিনীর মুখ্য সংগঠক হিসাবে 'স্বাধীনতা'র পাতায় প্রকাশিত কবি সুকান্তর ওই সব চিঠি, ফিচার প্রতিবেদন, এ সবেরও কিছু নমুনা। আর সৃষ্টিশীল সাহিত্যের দিক দিয়ে ভাবলে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসের এক্ষেত্রে কিছু অংশবিশেষের বাদ পড়ে যাওয়ার কথাটি তো ভাবাই যায় না। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত — মাঘ, ১৩৫৩। তার মানে এ সংকলনের পরিকল্পিত সময়ের ভেতরেই তা। নির্বাচনের সময়ে এ সব বিষয়ে আর একটু মনোনিবেশ করা গেলে — 'বাঙালির সাম্যবাদ চর্চার

আনুপূর্বিক কোষগ্রন্থ' রূপে এ গ্রন্থের স্বেচ্ছাপ্রসূত দাবিটিও, বোধ হয় আরও সর্ববাদীসম্মত হত।

তবু 'কোষগ্রন্থ' হয়ে উঠতে পারুক না পারুক — কিংবা যে অর্থে সুসম্পূর্ণ — সাম্যবাদী রাজনৈতিক সাহিত্যের মনোজ্ঞ একটি সংকলন রূপে গ্রন্থটি কিন্তু বাংলাভাষায় নিঃসন্দেহে অনুধাবনীয় একটি সংযোজন বলেই স্বীকৃত হবে। বিশেষ করে মেনস্ট্রিম প্রকাশনার জায়গায়। সেকালে বা উত্তরকালে পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, এমনকী সেই সুবাদেই খ্যাতিমান এই রকম বেশ কিছু নাম এখানে চোখে পড়বে লেখক তালিকায়। তবে মোটের ওপরে সূচিভুক্ত লেখকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই কিন্তু এখানে সে অর্থে নিতান্তই নিয়মমাফিক কোনও সংঘ শৃঙ্খলার শরিক নন। বরং স্বাধীন চিন্তক, এটাই তাঁদের আদত পরিচয়। কেমন করে এবং কীভাবে আসতে চাইছেন তারা সেদিন, কমিউনিজমের সঙ্গে বোঝাপড়ায়? এ ইতিবৃত্তটুকু যেন ধরা থাকে শ্রমসাধ্য এই সংকলনে। যে বৃত্তায়নকে বাদ দিলে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজের সামাগ্রিক পরিচয়টিও খণ্ডিত হয়ে যায় অনেকটা। সমাদৃত হওয়ার কথা, নিশ্চয়ই, এ সংগ্রহটির।

সংকলনের প্রথম লেখা — 'রাশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের আনন্দ' (প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২৪ / ১৯১৭)। লেখক বলতে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দেশপ্রমিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রাসঙ্গিক ওই উদ্দীপনার শিকড়টি খুঁজে পান যিনি বাঙালির সহজাত ওই স্বাধীনতাপ্রিয়তারই মাঝখানে, যার প্রথম প্রতিভূ রাজা রামমোহন রায়। লেখকের নিজের কলমেই শোনা যাক — 'আমাদের শরীরে সেই শোণিত প্রবাহ হইতেছে — আমরা অযোগ্য হইলেও তাঁহারই বংশধর। পৃথিবীর কোথাও কোনো মানুষ মানুষ হইবার সুযোগ পাইলে আমাদের আনন্দ আপনা হইতেই উথলাই ওঠে।' বাঙালির এই সহজাত স্বাধীনতাপ্রিয়তাই তাকে মুক্ত রাখে যে কোনও কিসিমের গোঁড়ামি থেকে, তথাকথিত সনাতনের দোহাই পেড়ে দ্বাররুদ্ধ রাখার রক্ষণশীল মনোভাব থেকে চাটুযোমশায় আরও বলেন তাই, বলতে পারেন — 'ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর অন্তর্গত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহা শিবত্রিশূলাগ্রে অবস্থিত কাশীর ন্যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্বন্ধরহিত নহে, অন্য সব দেশের চিন্তা, ভাব আকাঙ্ক্ষা ও কৃতিত্বের উল্লাসের তরঙ্গ এখানেও আসিয়া পৌঁছে।'

রবীন্দ্রভাবুক অজিতকুমার চক্রবর্তী। তাঁর লেখা থেকেই একটু উদ্ধৃতি — 'রাশিয়ার বলশেভিমন্ত্র যে জার্মান প্রভুতন্ত্রকে ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করিয়া আনিয়াছিল, সে খবর তো গোড়ায় প্রকাশ পায় নাই।' (যুদ্ধশেষ / অংশবিশেষ। ভারতী; অগ্রহায়ণ ১৩২৫ / ১৯১৮)। আরও বলেন তিনি, রুশ বিপ্লবের নবীন নির্ঘোষেই 'প্রভুতন্ত্র ইউরোপ হইতে চিরবিদায় লইল।' এবং এ পর্যবেক্ষণের সঙ্গেই অন্বিত করে নেন যেখানে 'বলাকা'র এই বাণী — 'এসেছে আদেশ / বন্দরের কাল হলো শেষ'!

শুধু দেশপ্রেম, শুধু গণতন্ত্রের দিক থেকেই নয়। দুইয়ের দশকের সূচনা থেকেই সোভিয়েত বিপ্লবের, তথা সমাজতন্ত্র কি সাম্যবাদের শ্রেণীগত তাৎপর্যটাও স্পষ্ট থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চেতনায়। পশ্চিমের democracy হুবহু এনে বসিয়ে দিয়ে বা ভোটের জন্য চাষিদেরকে বিব্রত করে তাদের কল্যাণ হবে না। সমস্যাটা আরও মূলগত। যে পরিস্থিতির মর্মমূল থেকেই উঠে আসে এই রকম একটি প্রশ্ন — 'এ অসমান অবস্থা আর কতদিন? জমিদার ও চাষা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা বাংলার বলশিদের সর্বপ্রধান নীতি হইবে?' (বাংলার বলশি, আবুল হোসেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা; শ্রাবণ ১৩২৮ / ১৯২১)। পাশাপাশি শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক প্রসঙ্গ। 'বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব' সন্তোষকুমারী গুপ্তা। তাঁর কলমেই পাওয়া যায় দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য — 'ফলকথা তোমরা স্বেচ্ছায় কখনও শ্রমজীবীদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর নাই এবং আজও করিবে বলিয়া মনে ভাবিবার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই (বাংলার চটকলের কথা। সংহতি; কার্ত্তিক ১৩৩০ / ১৯২৩)। অথবা হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের এই শ্লেষকথায় পর্যবেক্ষণ — 'শ্রমিক নেতা হইবার শখ অনেকের আছে। কিন্তু গরীব শ্রমিকদের দুঃখ কষ্টের ভাগ লইতে কয়জন রাজি আছেন?... .... নেতারা হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু শ্রমিক দলের দুঃখ কষ্টের ভাগ লইবেন কেমন করিয়া? যখন দেখি শ্রমিক-সভায় শ্রমিক-নেতা মোটরে করিয়া আসিয়া আবার মোটরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আমরা হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া পাই না। এইসব নেতা দেখিয়া মনে হয় দেশের দুর্ভাগ্য, শ্রমিকদের দুর্ভাগ্য' (শ্রমিকদের সম্পর্কে দুয়েকটি কথা। নব্য ভারত; চৈত্র ১৩৩০ / ১৯২৪)। মোক্ষম একটি উপমার প্রয়োগে ওই শ্রেণীসত্যটিকেই আরও অকাট্য করে ধরিয়ে দেন, এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম আদিপুরুষ 'কাকাবাবু' মুজফ্‌ফর আহমেদ — 'এই শ্রেণীসংগ্রামের জন্য আমাদের তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা সোশ্যালিস্ট আর কমিউনিস্টদিগকে দোষ দিচ্ছেন। এ হচ্ছে ঠিক হাওয়াঘরের অধ্যক্ষকে ঝড়-হাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য দোষ দেওয়ার মত' (শ্রেণী সংগ্রাম। লাঙ্গল; ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬)।

বিশ্বব্যাপী নিগৃহীত ওই সব শ্রেণীগুলিরই অভ্যুত্থানের সময় এসেছে আজ। মুজফ্‌ফর আহমেদ সাহেবের ওই লেখাটিরও তিন বছর আগের একটি লেখা। সংকলকদের ধন্যবাদ, প্রায় একই মর্মে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও দুষ্প্রাপ্য ওই একটি লেখাকেও এখানে সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁরা, যার শেষে ব্যক্ত হয়েছে কবিরও

এই অভিপ্রায় — 'পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের ইতিহাসের যে চেষ্টা আজ দেখতে পাচ্ছি, ভারত তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে বঞ্চিত হবে। নতুন শক্তির যে বিশ্বব্যাপী মন্দির তৈরী হচ্ছে, তার একটা সিংহদ্বার রচনার ভার ভারতকে নিতে হবে' (সংহতি। সংহতি: ১৩৩০ / ১৯২৩)।

শত অপপ্রচার সত্ত্বেও তাই সোভিয়েত সম্পর্কে বিষিয়ে তোলা যায় না নিপীড়িত জাতিসমূহের মন। লেনিনের মৃত্যুর পর 'মহামতি লেনিন; এই শিরোনামে সম্পাদকীয় লেখে 'আনন্দবাজার' (১৬ই মাঘ ১৩৩০ / ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৪)। আদর্শের দিক দিয়ে 'বহুল পার্থক্য থাকিলেও' তাঁকে স্মরণ করে 'মানবমিত্র মহাপুরুষ' রূপে। লেখা হয় এমন কথাও — 'বুর্জোয়া জগতের বাসনা এবার বুঝি পূর্ণ হইল' (অতুলচন্দ্র সেন। পরলোকে লেনিন। বিপ্লবের পথে রুশিয়ার রূপান্তর / অংশবিশেষ। মাঘ ১৩৩০ / ১৯২৪)। এমনকী তিনের দশকের মাঝামাঝি অপপ্রচার যখন তুঙ্গে তখনও অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে (৭/৩/১৯৩৫) 'নানা ত্রুটি সত্ত্বেও' এই সোভিয়েতকেই আবারও স্বাগত জানান রবীন্দ্রনাথ — 'নবযুগের তপোভূমি' বলে। কারণ, 'নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে যার নাম লোভ' (ঐ)। এ হল 'নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন' তথা গোটা সভ্যতারই ভিত্তি বদলের প্রয়াস'।

এই ছিল সেদিন বাঙালি মানসের মূলস্রোত। ঐকান্তিক একটা দায়বোধ থেকেই কলম ধরেছিলেন বাঙলার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। যারই ফসল হল কমিউনিজমকে কেন্দ্র করে বিপুল এক 'লোকশিক্ষামূলক' সাহিত্যের ধারা। এ যেন বাঙালি মানসেরই আর এক নব জাগরণ। চিন্তার স্বচ্ছতায়, উপস্থাপনার মৌলিকত্বে এবং সর্বোপরি আন্তরিক প্রত্যয়ের গুণে — আজও যেগুলিকে সাময়িকতায় আক্রান্ত বলে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। এই রকম লেখাও রয়েছে সংকলনে। প্রসঙ্গত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভূতের মুখে রাম নাম', সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ', এম. এন. রায়ের 'মাকর্সবাদ', সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিপ্লবী রাশিয়া' কি 'শ্রেণী দল ও বিপ্লব', বিনয় সরকারের 'কার্ল মার্ক্স ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস', হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতবর্ষ ও কার্ল মার্ক্স', সুশোভন সরকারের 'সোশ্যালিজমের মূল সূত্র', বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সাম্যবাদের মর্মকথা', চিন্মোহন সেহানবিশের 'মজুরি ও মুনাফা', দেবজ্যোতি বর্মনের 'কার্ল মার্ক্স', পাঁচুগোপাল ভাদুড়ির 'বাড়তি মূল্য' লেখাগুলি আজও পাঠকের কাছে সমানই জীবন্ত আর প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। স্থানাভাবে একটি মাত্র উদ্ধৃতিই এই সূত্রে, মনে হয়, যথেষ্ট হবে — 'ইউরোপ দুনিয়ার সর্বত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে বলেই বুর্জোয়া-ব্যবস্থা মরেও মরছে না। ভারতবর্ষের মত তাঁবেদারি দেশই হচ্ছে তাই সাম্রাজাবাদের আসল খুটি। এই তাঁবেদারি দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন ও পর্যুদস্ত না হলে ইউরোপের জনসাধারণও বুর্জোয়াদের কবল থেকে মুক্তি পাবে না। আমাদের ভবিষ্যত কী ঘটবে ভেবে অনেক সময় আমরা ইউরোপের দিকে চেয়ে থাকি; কিন্তু ইউরোপেরও ভবিষ্যত আমাদের চেষ্টা, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের গণশক্তির উপর নির্ভর করছে।' (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ঐ। ভারতবর্ষ ও মার্ক্সবাদ / অংশ বিশেষ / ১৩৪৭ / ১৯৪০) খুবই ভাল হত এই সিরিজেই যদি আর একটি বিরলপূর্ব রচনার কথাও ভুলে না যেতেন সংকলকেরা। মূলে ইংরেজিতে শিরোনামটি যার 'দা ফিলজফি অব ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশেন' (মর্ডান রিভিয়ু, ৬৪, ১৪৫, ১৯৩৮) যার রচয়িতা হলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা। বাঙালির সাম্যবাদচর্চার ইতিবৃত্ত কি দূরদ্রষ্টা এই বিজ্ঞানীর অবদানকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হবে? কিংবা সাতচল্লিশেই প্রকাশিত তাঁর ওই 'মাই এক্সপিরিয়েন্স্ ইন সোভিয়েত রাশিয়া' (প্রকাশক: দা বুকম্যান) বইটির কথা। 'দা বলশেভিকস্ প্ল্যানড্ লাইক দা জায়ান্টস্ অ্যান্ড্ ফিনিসড লাইক টাইট্যান্স' — ওই গ্রন্থেরই স্মরণীয় একটি পংক্তি।

প্রসঙ্গত, ফ্যাসিবাদবিরোধী বিশ্বমোর্চার যুগে বাংলার শিল্পী সাহিত্যিকদের ওই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথাও একটু এসে পড়ে। যে প্রেক্ষাপটেরই অনবদ্য একটি ফসল, সেদিনকার বুদ্ধদেব বসুর লেখা — ওই 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' (স্পেনের গৃহযুদ্ধ / অংশবিশেষ। ১৯৪২)। যেইখানেই সেদিনের ওই আধুনিক কবি ও বুদ্ধিজীবীর প্রায় দ্ব্যর্থহীন এই পর্যবেক্ষণ — 'আমি কোনও রকমে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে ব্যাঙ্কের টাকা গুছিয়ে যে কোনও অবস্থায় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করে দিন গুজরান করতে চাই না, আমি নিবিড়ভাবে বাঁচতে চাই, আমি সেই মহৎ স্বার্থ রক্ষা করতে ইচ্ছুক যা আমার একলার নয়, সকলের স্বার্থ।'

এসব নিয়ে হল একদিক। অন্য দিকে ভিন্ন চিন্তার ধারাও ছিল একটা, সেদিনের বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজেও, নানাদিক থেকেই সোভিয়েত ব্যবস্থা তথা কমিউনিজমের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যাঁরা, তৈরি হয়েছে বিতর্ক। দুই পক্ষ মিলিয়ে সেই রকম তর্ক বিতর্কমূলক কিছু লেখাও স্থান পেয়েছে এখানে। আজকের পাঠকের কাছে যেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়। এদিক দিয়ে মনস্বী হুমায়ুন কবীর প্রণীত 'ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ' ও সেকেন্দর চৌধুরীর 'সমাজতন্ত্রবাদ ও ভারতবর্ষ' — সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'এষণা' ও সরোজ আচার্যের 'মার্ক্সীয় দর্শনের স্বদেশী সমালোচনা' সুপণ্ডিত বটকৃষ্ণ ঘোষের 'মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্র' কি 'অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব' এবং নলিনীকান্ত গুপ্তের 'বলশেভিকি' ও শিবরাম চক্রবর্তীর 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' প্রভৃতি রচনাগুলি এই সংকলনে ভিন্ন

একটি মাত্রা যোজনা করেছে। যেমনটি করে কমিন্টার্নের সঙ্গে বিরোধপ্রসূত এম. এন. রায়ের 'আমার অপরাধ' শীর্ষক খরশান ওই লেখাটি। কমিউনিজমের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাঁর। তবে মস্কো রেডিও থেকে সম্প্রচারিত আর্ন্তজাতিক সুরের সঙ্গে বাজা, ক্রেমলিনের ঘড়ির সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়ার অভ্যাসটি নাকি থেকেই যায় নিঃসঙ্গ এই কিংবদন্তি মানুষটির অনেক দিন। নজরুলের অনুবাদে যে আর্ন্তজাতিকেরই একটি চরণ — 'ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী'। যে প্রত্যয় থেকেই গণশিল্পী বিনয় রায় লেখেন — 'দেশপ্রেমিক লোকসংস্কৃতির পতাকা জনসাধারণের হাতে' (জনযুদ্ধ। আশ্বিন; ১৩৫০ / ৬ই অক্টোবর ১৯৪৩)। আর, ঘোষিত সময়সীমাকে লঙ্ঘন করেও, ন্যায্যতই গৃহীত, সংকলনের শেষ লেখায় শিল্পী সুভো ঠাকুর জানান অকুণ্ঠ চিত্তে—'কালোবাজারি ধনিকের সর্বদাগহরী উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ লেপনে দেওয়ালে লেখা আমার সে-কবিতাটি যদি মুছে গিয়ে থাকে আজ, তো ক্ষতি নেই। আমার সে মর্মবাণী, মসিহীন লেখায় লিপিবদ্ধ, শুধু আমার নয়, মনুষ্যত্বের মহিমায় বিশ্বাসী, সুন্দরের পূজারী প্রত্যেক শিল্পীর প্রাণবন্ত প্রাকার' (পি. সি. যোশী। রাজনৈতিক দলপতি — শিল্পীদের দরদী দোস্ত। শারদীয় অনুষ্টুপ; ১৩৩২ / আনুমানিক ১৯৪৮)। কী ছিল হোয়াইট ওয়শে হারিয়ে যাওয়া উল্লেখিত ওই কবিতায়? '...আজ এই পহেলা মে, / সেই পহেলা মে-রই তো জন্মোৎসব...' এই রকমই কিছু কিছু পংক্তি।

সবশেষে একটি প্রশ্ন। যা দিয়ে শেষ হয়েছে সম্পাদকের ভূমিকা। ডোডো পাখি না ফিনিকস্? কোন পাখির কথা বলা হবে আজ কমিউনিজমের উপমায়? এর উত্তরে যেটুকু বলা যায়, কবিরাই সে উত্তর দেবেন কবিতায়। কিন্তু ইতিহাসের জিজ্ঞাসু ছাত্র যারা? তাদের হয়ত মনে পড়বে শুধু আঠারোশো পনেরো সালের ওই 'ভিয়েনা কংগ্রেসে'র কথা। উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন ছিল যেখানে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ইউরোপ যেন ভুলে যায় 'ফরাসি বিপ্লবে'র কথা চিরতরে। কিন্তু শুধু অতীতের বোঝা বহন করেই তো আর ইতিহাসের চলে না। দশক যেতে না যেতেই আবারও ওঠে ঝড়। সারা ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়ে যায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন প্রবাহ, ১৮৪৮ সালটি ছিল যে প্রবাহেরই শীর্ষচূড়া। এবং ওই বছরই প্রকাশিত হল ছোট্ট একটি পুস্তিকা 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার'! জীবন মানে ক্রমাগত জীবন, যে ইসতেহারও এই কথাই বলে। □

বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা — সংকলক শিপ্রা সরকার ও অনমিত্র দাশ / আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯ / ২৫০.০০।

অস্থির প্রেমিকের গদ্য

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

দেবী রায়ের 'পণ্ডিত নই, প্রেমিক মাত্র' বইটি হাতে পাওয়ামাত্র মনে প্রশ্ন জাগে — বইয়ের নাম এমনতর কেন। পাণ্ডিত্য এবং প্রেম, কিংবা পণ্ডিত এবং প্রেমিকের মধ্যে সত্যিই কি কোনও দ্বন্দ্ব অথবা সংঘাত বর্তমান, নাকি উভয়ের সম্পর্ক অসেতুসম্ভব? যে রচনাটির নামে বইয়ের নামকরণ, সেটি জীবনানন্দ-বিষয়ক। তার শুরুতেই জানতে পারি এমন একটি নামের পেছনে ইন্ধন জুগিয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা'-র ভূমিকায় ব্যবহৃত একটি পংক্তি: 'আমি পণ্ডিত নই, প্রেমিক মাত্র'। 'মহাভারতের কথা'-র প্রেক্ষিতে কথাটির সারবত্তা মেনে নিলেও মনে প্রশ্ন থেকে যায় পাণ্ডিত্য এবং প্রেমের সীমারেখা ঠিক কোনখান দিয়ে টানব: কোন গোত্রে ফেলব আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে কিংবা প্রমথ চৌধুরী এবং বিষ্ণু দে, ধূর্জটিপ্রসাদ আর মুজতবা আলী অথবা যিনি এ হেন বাক্যের বক্তা — সেই বুদ্ধদেব বসুকে।

সূচিপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বইটি সাতাশটি সংক্ষিপ্ত রচনার সংকলন — কোনওটি প্রায় প্রবন্ধ, কোনওটি বা গ্রন্থসমালোচনা শ্রেণীর। অমিয় চক্রবর্তী, নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর, জীবনানন্দ, অলোকরঞ্জন, শামসের আনোয়ার, অমিয়ভূষণ, নির্মলপ্রভা বরদলৈ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের কিছু রেখাচিত্র ছাড়াও রয়েছে সাহিত্য বিষয়গত কিছু রচনা যেমন 'সাহিত্যে অনুবাদের সমস্যা' অথবা 'গ্রন্থাগার সান্নিধ্যে' সেই সঙ্গে আশ্চর্য রকমের ভিন্ন জাতীয় গুটিকয়েক রচনার সহাবস্থান, যেমন 'দেশ বিভাগের জন্য গান্ধীজি কি সত্যই দায়ী', 'মানুষের অপর নাম মনুষ্যত্ব'। সাধু প্রয়াস নিঃসন্দেহে, কিন্তু একটি সাহিত্য-বিষয়ক রচনা সংকলনের পক্ষে সুপরিকল্পনার ইঙ্গিত বহন করে না। সূচিপত্রের বাইরে রয়ে গেছে তিনটি রচনা: সমর সেন, দেবী রায় (?) ও বিভূতিভূষণ।

সাহিত্য-কেন্দ্রিক যে সব রচনা — সেগুলির বেশির ভাগের মধ্যেই এক ধরনের ব্যক্তিগত আলাপচারিতার রেশ রয়েছে, গুণগত বিচারে এতটুকু বলা যেতে পারে। সাহিত্যপ্রিয় এক হৃদয় এ সমস্ত রচনার পেছনে জাগ্রত, এটাও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। মুশকিল হয় রচনাগুলিকে রসোত্তীর্ণ বলতে গেলে। তখনই চোখে পড়ে কোনও রচনাই পূর্ণাঙ্গ অবয়ব মেলে ধরতে পারেনি, কোথাও সামান্য সূত্র নির্দেশ করে নিশ্চুপ হয়ে গেছে, কোথাও বা নিছক 'লেখক-পরিচিতি' ধরনের রূপ

গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়েছে। কোথাও আবার এতটাই কোটেশন-কন্টকিত যে লেখকের নিজস্ব কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। আমার ধারণা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'Personal Essay' — এ বইয়ের ক্ষেত্রে লেখকেরও হয়ত প্রাথমিক উদ্দেশ্য তাই-ই ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও লেখককে হয়ে উঠতে হয় নৈর্ব্যক্তিক, আপাত মসৃণ ভঙ্গিমার আড়ালে চালিয়ে যেতে হয় প্রগাঢ় চিন্তন প্রক্রিয়া। সার্থক পণ্ডিত কিংবা সার্থক প্রেমিক — যিনিই হোন না কেন, তার পক্ষে এই চিন্তার গভীরতা অভিব্যক্তির স্বচ্ছতা এবং দৃষ্টির ব্যাপকতা — তিনটি গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। □

পণ্ডিত নই, প্রেমিক মাত্র — দেবী রায় / বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯ / ৪০.০০

কবিতার দুই মুখ

অসীম রেজ

বেণু দত্তরায় কবিতা লিখছেন কয়েক দশক ধরে। অধ্যাপনাসূত্রে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন বহুদিন। এর আগে তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি তার শেষতম সংযোজন। এটিকে তাঁর স্মৃতিচারণমূলক আত্মকথন বলাই শ্রেয়। এর অনেক কবিতায় একই ভাবনা ঘুরেফিরে এসেছে — ফেলে আসা স্মৃতি, কিছু হারাবার দুঃখ। আর তাঁর শৈশবের স্বপ্নময় দিনগুলির কথা তিনি শুনিয়েছেন গল্পের মতো। তাঁর ভাষায় — 'আমার জামীর গাছের ছায়ায় ছায়ায় ইষ্টিকুটুম / দিন গুলি আমার' অথবা 'দিনগুলি আমার যায়, রাতগুলি আমার কাটে না / পাহাড়ের ঢালে জমাট অশ্রু / নিরেট-কঠিন / সাদা বরফ গলে না।' বক্তব্যধর্মী এই সব কবিতাগুলি আটপৌরে সরল ঢঙে লেখা। তাঁর স্মৃতি জুড়ে গ্রাম্যজীবন ও প্রকৃতির চেহারা অকৃত্রিম ভাবে ফুটে উঠেছে। ফোক মোটিফগুলি ঘুরেফিরে এসেছে বারবার। অনেক সময় এগুলি প্রতীক হয়ে উঠেছে অন্তর্জীবনের সুখ দুঃখ, ব্যথা ও বেদনার। বিশেষত জল, নদী ও নারী, এই তিনটি অনুষঙ্গ ভালবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। বেণুবাবুর আগের কবিতাগুলিতে উত্তরবঙ্গের অনবদ্য নৈসর্গিক চিত্র আমরা পেয়েছি। সেখান থেকে তিনি যেন অনেকটা সরে এসেছেন। ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন পারিপার্শ্বিক থেকে। নস্টালজিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ানক দুঃখ তাঁকে পেয়ে বসেছে। তবে আশার কথা মানুষ ও প্রকৃতির অন্বয় সম্পর্কের কথাটি তিনি এখনও ভোলেননি। তাই হয়ত লিখেছেন — 'জীবনের বেদ পাতা-লতা-শেকড়বাকড় / জন্ম জন্ম।'

ভুবন পাহাড়ের কথা বলেছেন মনোতোষ চক্রবর্তী। ভুবন পাহাড়, বরাক উপত্যকার মানুষদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাই ভুবন পাহাড়ে সূর্যোদয় ঘটলে অথবা বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা উপত্যকার মানুষদের স্বপ্ন জেগে উঠে — ফুলে ফলে, সোনালি ফসলে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। শিলচরবাসী এই কবির বর্ণনায় উপত্যকার এক অনবদ্য রূপ ফুটে উঠেছে। কবির ভাষায় এই 'নদী-পাহাড়-ঝর্ণা-মঙ্গলের রহস্য মেশানো / জরিপহীন পৃথিবী', তার হাত ধরে খুব স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায়। তিনি খবর দিয়েছেন — 'কোথায় ফুলের তল-কোথায় হমার বস্তি / বাঘের থাবার মতো ভয়ঙ্কর চাঁদ শীত ও আঁধার ছিন্ন করে / আকাশময় ছড়িয়ে দিল হাসি / মাইল মাইল বিস্তারিত আনারসের বাগান তরোয়ালের মতো লম্বা / ধারালো পাতা আর মাথার মুকুট....(স্মৃতি-২) কিংবা 'জাটিঙ্গার কমলালেবু / ঐ কমলালেবুর সঙ্গে মেশানো ছিল আদিমতা / ট্রেনের ঝমাঝম দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর স্রোত / আদিবাসী রমণীর সপ্রতিভ পৃথিবী...' (স্মৃতি-১)।

এই প্রকৃতির সঙ্গে এত ওতোপ্রোত জড়িয়ে থেকেও মনোতোষবাবু তাঁর ফেলে আসা স্মৃতিচিহ্ন — বাংলার প্রকৃতি ও ভাষা, কলকাতা ও তার নাগরিক উল্লাসকে কখনও ভুলতে পারেননি। এই প্রবাসী মানুষটি এক শিকড়হীনতায় ভুগেছেন। আবার ওই শিকড়ের খোঁজে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে চেয়েছেন — 'ধুলিধূসর শব্দ আমার ঝকঝকে দিন / আমি আবার ফিরে আসছি / নতুন করে করবো শুরু / দেশান্তর থেকে আবার ফিরছি আমি।' নিজের জায়গায় ফিরে আসার এমন বেদনাদায়ক আর্তি একার নয়, হয়তবা আমাদের সবার।

একেবারে ভিন্ন ধরনের কবিতা লিখেছেন নাগপুরবাসী কবি সুকুমার চৌধুরী। তাঁর ভাষার নির্মাণকুশলতা চোখে পড়ার মতো — 'ঝরে যাবো / যে নির্ভার শিশির / এ রকম সাবলীল, বীতশব্দ, বিভা। / গন্ধহীন, বর্ণহীন খুলে যাবো। / নিবিড় ঘাসের বুকে স্বতোৎসার...' পরিমিত শব্দ ব্যবহার করে তিনি একটি স্থাপত্যধর্মী নির্মাণ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এগুলি অভিব্যক্তিমূলক, অন্তর্জীবনের প্রকাশ। কবিতা তাঁর আত্মখননের প্রক্রিয়া। এই খননের ভিতর থেকে যে রূপ দৃশ্য হয় তা কেবলই অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিষাদে ভরা, এক অন্তিম শোকদৃশ্য, মৃত্যুর আর এক নামান্তর। তাঁর ভাষায় — 'মৃতের প্যাশন, স্মৃতি ও সম্ভার, হিম কত ভালবাসা' (কান্না)। আধুনিক মানুষের সংকট ও সংশয়, অস্থিরতা ও ভয় এবং শেষ পর্যন্ত এক নিরালম্ব শূন্যগর্ভ অস্তিত্বটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অজস্র ইমেজে

যেমন ধোঁয়াচ্ছন্ন হিম কফি ঘর, তিন লক্ষ গিরগিটি মেঘ, শীর্ণ পেরেকের আগায় সহিষ্ণু মাথা, ওষ্ঠে বারুদগন্ধ, চুলে রাত্রিজট, ধাতব বাতাস, উবুড় করা শূন্যতা, পুটুশ কাঠির মতো সরু ঘাড়, মেরুদণ্ডে স্টিল রড, উলের গোলার মতো গড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই অস্তিত্বটিকে তিনি যেন শব দেহের মতো বহন করে চলেছেন। তবে আশার কথা এই কবর থেকে তিনি নিজেকে উদ্ধার করতে চান। হিংসা, ব্যভিচার, শঠতা, ক্রুরতা কিংবা অহঙ্কারের মতো আধুনিক মানুষের পোশাকের অসুখগুলি একে একে খুলতে চেয়েছেন। নিজেকে স্পষ্টভাবে চিনতে চেয়েছেন এরই ভিতর। আর এক ভুবনের স্বপ্নে আস্থা রেখেছেন নতুন করে বাঁচার — কিভাবে হয়, কেউ জানে না, আবার ভাবো / নির্জনতা হয়তো বা নেই, এমন ভিড়ে / সবাই চেনে তেমন ভুবন, আরশিভরা / তারই ভেতরই ফুটে রামধনু / এমনও হয়....'(অনুভাব)।

দীপক করের কবিতায় টুকরো টুকরো, প্রক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। পুরনো দিনের কথা নিয়ে তিনি হাহুতাশ করেছেন। ছাত্রজীবন, যৌবনের কফি হাউস, শক্তি-সুনীলের কবিতা এবং ফাঁকি দেওয়া উজ্জ্বল দিনগুলির কথা তিনি লিখেছেন, যা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত। কবিতা লিখতে না পারার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থটিতে আমরা এমন কিছু পাই না যা মনে রাখার মতো।

নারী হৃদয়ের শঙ্কা ও ভয়, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা, একটি বালিকা থেকে পূর্ণ নারীতে পরিণত হওয়ার যে দীর্ঘ পথপরিক্রমা এবং সর্বোপরি ভালবাসার টানে নিজেকে শৃঙ্খলমুক্ত করার এক তীব্র বাসনা এনাক্ষী আচার্যের কবিতার জগতটি গড়ে তুলেছে। যেমন 'অবেলায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে বালিকা / হাসনুহানার গন্ধ আপ্লুত করল শরীর, / মেয়েটি লজ্জায় ছেয়ে দিল আকাশ / লুকিয়ে থাকল বহুকাল' (সন্ধি),' সেই বসনমুক্ত জলকন্যার স্তব, / কিংবা শঙ্খ বালিকার নারী হয়ে যাওয়া, / উন্মোচিত ক্রমশ এখন' (অন্তর্গত থাক) কিংবা কতো বার বলেছি শান্ত হও / স্থিতধী হও মেয়ে, / এত বেশি চঞ্চলতা তোমার জন্য নয়' (প্রেম), 'প্রার্থনার সঙ্গীতে পৌঁছে আসি পদ্মবনে / আরও এক জীবন চাই মেয়ে / একবার সুযোগ দাও ভালোবাসিবার / দহনে দহিত হয়ে দ্রবীভূত কর জীবন আমার (দ্রবীভূত কর)।

একটি নারীজীবনে যেন সব কিছু অসম্পূর্ণ থাকে। তাই বারবার নারীজন্ম চেয়েছেন তিনি। সামাজিক জীবনযাপনের শর্তে গণ্ডীবদ্ধ, অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষার সত্তা এক শবদেহের মতো বহন করেছেন তিনি — 'আমারই শব নিয়ে চলেছি আমি ক্লান্তিহীন / ভালোবেসেছিলাম যে দুটি প্রাণ ও পাখীকে / তারা সব ভেসে গেছে কালিন্দীর জলে' (শবযাত্রা)! অস্তিত্বের সঙ্কটে তিনি দ্বিধাবিভক্ত। একই সঙ্গে দুটি নারীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায় একটি 'আশ্রয়হীন নির্বিকার নিঝুম অস্তিত্ব', আর অন্যটি 'ফুলের পাপড়ির মতো খুলে রাখা' মাধুর্যময় সত্তা। এই টানাপোড়েন থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন ; খুঁজে পেতে চেয়েছেন সেই স্বাধীন সত্তাটিকে 'যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো / অবোধ স্বপ্নের জলে ভাসব সারাদিন, / গোল্লাছুট...হা...ডু...ডু / সময় নেই অসময় নেই / উঁকি দেব চৈত্র বাতাসে' (ঘোষণা)। তাঁর কবিতায় নারী স্বাধীনতার মুক্ত কণ্ঠটি আবার শোনা যায়। তবে তাঁর কাব্য জগৎ একান্ত ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তা সর্বজনীন রূপ পায় নি। শব্দের প্রতি অতিরিক্ত মোহ তাঁকে নির্দিষ্ট ভূমি থেকে বারবার সরিয়ে দিয়েছে।

দীপালী রায়ের কবিতাগুলি কবিতার নামে কতকগুলি ভ্রমণ কাহিনী। এক একটি জায়গা নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন যেমন প্যারিসে সূর্যাস্ত, বর্ষণ শেষে মানালি, মিরিকের লেক, ঘুম, দার্জিলিং ইত্যাদি। ভ্রমণের নেশাই তাঁকে কবিতা লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে, এ তথ্যটি জানা যায় বইয়ের শেষ কভারে। লেখার ঢঙটি পুরনো, অপ্রচলিত। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে হয়ত বা গদ্যে লিখলে আরও বেশি তথ্য দিতে পারতেন।

আজকাল কাব্যনাটক লেখা কদাচিৎ চোখে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট ধারাটি পুষ্ট করার দায়িত্ব বর্তায় মূলত কবিদের উপর। বহুদিন পর বাসুদেব দেবের কাব্যনাটক সংকলন 'নক্ষত্র ও নীবারের গান' পেয়ে স্বভাবতই নতুন করে আগ্রহ জাগে। বাসুদেববাবু কবিতা লিখছেন বহুদিন ধরে। কাব্যনাটক সংকলনটি বোধহয় প্রথম। সংকলনটিতে ছোট ছোট পাঁচটি কাব্যনাটক রয়েছে — 'বৃষ্টির ভিতর চিঠি', 'মাধুরীর চোখ', 'নীবার ও নক্ষত্রের গান', 'বনের আগুন' এবং 'রঙের গোলাম'।

আমাদের অস্তিত্বের সঙ্কট, দ্বিবিভক্ত জীবনযাপন, একই সত্তার দুটি রূপ — নারী ও পুরুষ, অথবা পুরুষের ভিতর নারীর অসহায়ত্ব কিংবা নারীর ভিতর পুরুষের বন্ধনমুক্ত অস্তিত্বের খোঁজ এই কাব্যনাটকগুলির মূলমন্ত্র। বাস্তব ও স্বপ্ন, চেতন ও অবচেতনের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিসত্তার নিরন্তর অন্তর্বিরোধের চিত্রটি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন নাটকীয় ভাবে ছোট ছোট ঘটনার মোড়কে। কাহিনীগুলি আপাত বাস্তব মনে হলেও ঘটনার অনিবার্য কারণে সেগুলি হয়ে উঠেছে রহস্যময় ও অতিবাস্তব। তাই প্রতিটি নাটকে আলো ও অন্ধকারের একটি বিশেষ ভূমিকার কথা লেখক আমাদের স্মরণ করিয়েছেন। কাব্যে বৃষ্টির প্রতীকটি হয়ে উঠেছে সত্তার প্রকৃত উন্মোচন। এই কাব্যনাটকগুলিতে লেখক স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন ভূমিকায় কখনও কবি, কখনও অধ্যাপক, শিল্পী অথবা অসুস্থ স্বামী হিসাবে জীবনের নানাবিধ প্রশ্ন নিয়ে। যদিও তিনি জানেন

জীবনের এমন অর্থ খোঁজা বাতুলতা মাত্র, 'আমাদের মরুবালি / বালি খুঁড়ে খুঁড়ে খালি তৃষ্ণা' (নীবার ও নক্ষত্রের গান)।

কাব্যনাটকগুলিতে পুরুষ চরিত্রগুলিকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করলেও, অরুণ, পূর্ণেন্দু, সলিল, অগ্নি, সৈকত, সুদূর অথবা অবিনাশ প্রত্যেকেই একই দ্বন্দ্বের শিকার — খণ্ড বিখণ্ড, টুকরো টুকরো, অর্থহীন, শূন্যগর্ভ এক অস্তিত্বের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত। এঁদের ট্র্যাজেডির কথাই শুনিয়েছেন কবি। অন্যদিকে অবচেতনের রূপ ধরে এসেছেন নারীরা একে একে, নূপুর, তৃষ্ণা, মাধুরী, শিখা, কল্পনা, কিংবা রঙ্গিলা। এঁরা যেন আত্মার দর্পণ, আমাদের বিবেক, নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে আমাদের। এই সব নারীরা কখনও প্রখর যুক্তিবাদী কঠোর বাস্তব : কখনও সরল ও গ্রাম্য ; প্রকৃতির মতো সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর ; কখনও বা মোহিনীরূপে ছায়ার মতো আসে, পথ দেখায়, স্বপ্নে জাগে। আর এই নারীই হয়ে ওঠে পুরুষের শেষ আশ্রয় — 'আমাদের দুঃখ কষ্ট, আমাদের অন্ধকার মন / আমরা মৌমাছি নই / আমাদের প্রত্যহ ভ্রমণ / হয়তো জলের মতো / কখনো পাতাল মুখী কখনোবা উর্ধ্ব অভিসার / শুধুই তোমার জন্য / আমাদের দীর্ঘ অভিযান, আমাদের সব হাহাকার' (নীবার ও নক্ষত্রের গান)। তাই বারবার এই নারীর কাছেই পুরুষ ফিরে আসে, নিজেকে খোঁজে তারই ভিতর। ভয়ে ও স্বার্থপরতায় ক্রমশ নিঃসঙ্গ, মিথ্যা আর ভুলের মেলায় প্রক্ষিপ্ত, অবসন্ন, ধ্বস্ত, নষ্ট, আত্মআবিষ্কারে দুঃখী, আশ্রয়হীন এই পুরুষটি বৃত্তের মতো এক জালের ভিতর আটকা পড়ে। সেই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার পথও যেন তার অজানা। হতাশ হয়ে বলে — 'আমি এক কেন্দ্রচ্যুত, সময়ের ক্রীতদাস / রঙের গোলাম / শেকল বদল হয় মুক্তি বুঝি এ জীবনে নয়।' আর এই না পারার ব্যর্থতাই আধুনিক মানুষের জীবনকাহিনী, স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। প্রসঙ্গ পাল্টালেও কাব্যনাটকগুলিতে পুরুষের এই মর্মান্তিক অসহায় রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে বারবার।

কাব্যনাটকগুলির নির্মাণকৌশলে অ্যাবসার্ড নাটকের মতো অতিনাটকীয়তা বা অবাস্তবতা প্রশ্রয় পেলেও এর শক্ত বাঁধুনীর জন্য কাহিনীর রেশ কোথাও ছেড়ে যায়নি। কাটাকাটা সংলাপগুলি ধরে রেখেছে কাহিনীর গতি। স্বপ্ন ও বাস্তবের পাশাপাশি বেড়ে ওঠা চরিত্রগুলি ততটা স্পষ্ট নয়, যতটা কাহিনীর। কোথাও কোথাও সংলাপ অনাবশ্যক দীর্ঘ হওয়ায় নাট্যগুণ বিঘ্নিত হয়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত বিষয়বৈচিত্র্য ও আকর্ষণীয় রচনার গুণে এই সংকলনটি পাঠকদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলবে। □

বাড়ি ফেরার দুপুর — বেণু দত্তরায় / মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগণা (দ)/ ৩০.০০

ভুবন পাহাড় — মনোতোষ চক্রবর্তী / উলুখড়, হাওড়া / ১২.০০

ছন্নমতির কুহু — সুকুমার চৌধুরী / খনন, ওয়াড়ি, নাগপুর / ২৫.০০

এই নাও — দীপক কর / এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৯০ / ৩০.০০

আমার প্রিয় কবিতা — এনাক্ষী আচার্য / মহাদিগন্ত, বারুইপুর ২৪ পরগণা (দ:) ২৫.০০

চালচিত্রে দেবীদুর্গা — দীপালী রায় / মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগণা / ২৫.০০

নক্ষত্র ও নীবারের গান — বাসুদেব দেব / অর্কিড প্রকাশনী, কলকাতা / ২৫.০০

ছোটগল্পের বৈচিত্র্য

সৌমিত্র লাহিড়ী

সত্যপ্রিয় ঘোষ, কান্তি গুপ্ত, গৌর বৈরাগী এবং কিন্নর রায় এখনও গল্প নির্মাণে সক্রিয় যদিও চারজনই মূলত বাণিজ্যিক ধারার লেখক নন। আবার একই সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করলেও, তাঁদের গল্প নির্মাণ, শব্দ চয়ন, চরিত্র গঠন ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত।

সত্যপ্রিয় ঘোষ সাধারণ গল্প পাঠকের খুব পরিচিত নন। কয়েক দশক ধরে লিখলেও খুবই কম লেখেন তিনি। সম্প্রতি আধুনিক গদ্যভাষা ও শৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে এক ধরনের ক্লান্তিকর সৃজনসাহিত্যের স্রোত লক্ষ করা যাচ্ছে। যাঁরা সরল গল্প বুনতে জানেন, তাঁদের অনাধুনিক, প্রাচীনপন্থী এবং এক ধরনের করুণার পাত্র বলে গণ্য করার প্রবণতাও জন্ম নিয়েছে। মানুষের চিরকালীন গল্পপাঠ ও জানার আকাঙ্ক্ষা ও তার মধ্য দিয়ে নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে আপ্লুত হওয়ার স্বাভাবিক সরলতাকে নিম্নমানের সাহিত্যরুচি রূপে অভিহিত করা হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের লেখকদেরও কেউ কেউ এ-রকম মত পোষণ করেন। সাহিত্য জগতে সব সময়েই অবশ্য এ-রকম তর্ক-বিতর্ক জীবন্ত থাকে। লক্ষ করার বিষয় হল গল্প তার নিজস্ব প্রয়োজনেই কখনও সরল, কখনও বা ভয়ঙ্কর জটিল রূপ ধারণ করে।

সত্যপ্রিয় ঘোষের গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায় যে একই সঙ্গে তিনি সরল এবং গভীর। অনন্য তাঁর কথন-ক্ষমতা। গল্প

ডাল-পালা মেলতে মেলতে ছড়িয়ে যায় বহুদূর অথচ আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কখনও কখনও তাঁর গল্প বিস্তার লাভ করতে করতে অনেক উপগল্পের ইঙ্গিত দিয়ে যায়, কিন্তু কোনও সময়েই তা মূলের গতিরোধ করে না। সরলতায় তাঁর গল্পের বিকাশ, গভীরতায় তাঁর চমকপ্রদ পরিসমাপ্তি। মেদহীন ভাষা, বাক্য গঠন হয়ত মাঝে মাঝে অনাধুনিক কিন্তু সমাজমনস্কতার স্পষ্টতায় হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল। সমকালীন ঘটনাবলি সত্যপ্রিয় ঘোষের কলমে চিরকালীন মানবতার বৈভব সঞ্চার করে। দেশবিভাগ, উদ্বাস্তুজীবন, মানবতার লাঞ্ছনা-অপমান-অভিমান, নারী জীবনের মর্যাদা ও মর্যাদাহীনতা, স্মৃতিতাড়িত বরিশালের জীবন—সব মিলিয়ে অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান মারেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁর গল্পের নায়ক হয়ে ওঠেন অমল মানুষ। তাঁর গল্পে রাজনীতির প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিমায় উঠে আসে কিন্তু ভুলেও মনে হয় না, সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে তা রাজনীতির আঙিনায় অনাবশ্যক আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছে।

'দ্বিতীয় জন্ম' সত্যপ্রিয় ঘোষের সম্ভবত দ্বিতীয় ছোটগল্প সংকলন। শেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে জানা যাচ্ছে তাঁর আরও অন্তত একটি গল্প সংকলন আছে—'অমৃতের পুত্রেরা'। এ ছাড়াও আছে কয়েকটি উপন্যাস। 'দ্বিতীয় জন্ম' গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১০টি গল্প: 'দ্বিতীয় জন্ম, পাগলাঝোরা, তাস, মেল ট্যাহা, গ্রাম, আলোকিত অন্ধকার, কলম এবং তার খাপ, আগে বালির বস্তা এবং দলছুট।

গল্পকার সত্যপ্রিয় ঘোষের যে-বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তা দৃষ্টান্তায়িত করতে হলে সংকলনের নামগল্প 'দ্বিতীয় জন্ম'-র কথাই প্রথম উল্লেখ করতে হয়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর চারশ বছরের প্রাচীন এক ঐতিহাসিক এবং বিতর্কিত কাঠামো অসভ্য বর্বরের মতো উগ্র হিন্দু ধর্মান্ধরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর দেশব্যাপী যে অস্থিরতা ও অমানবিক হিংস্রতা ছড়িয়ে পড়েছিল তার নিখুঁত দর্পণ হয়ে উঠেছে এই গল্প। বেশ বড় পরিসরে নিজের অসাম্প্রদায়িক ভাবনাকে কাহিনীর আকৃতি দিতে চেয়েছেন তিনি। দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত যে-কোনও গল্পের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্যতা দাবি করে এই গল্প।

'পাগলা ঝোরা' গল্পে দীর্ঘ গল্পের শিথিলতার সম্ভাবনা সযত্নে পরিহার করে লেখক অনবদ্য ভঙ্গিমায় ভয় জয় করে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়ানোর কাহিনী শুনিয়েছেন।

'তাস' গল্পে সত্যপ্রিয়বাবু আবার প্রতীকী প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে নিয়েছেন। অরুণা-শাস্তার কান্নার নীরব প্রতিবাদ, অব্যক্ত যন্ত্রণা সামাজিক মূল্যবোধহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা পায়। বিয়ে, কন্যাপণ, ঘটকের নির্লজ্জ ব্যবসা টুকরো টুকরো কথায় চিত্রিত হয়েছে। নির্মলকান্তি-বিমলকান্তি—শ্যামলকান্তি-মহামায়া—মনোজ বিপন্ন আত্মমর্যাদার অসহায়তার বাক্প্রতিমা। খুবই দক্ষ শিল্পীর ভাস্কর্য। 'আলোকিত অন্ধকার' গল্পে মালতী স্বামীর মৃত্যুশোক বুকে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে এসেছিল। রাজ্য সরকার অসহায় পরিবার রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে চাকরির বিশেষ সুযোগ তৈরি করেছে। হঠাৎ নেমে আসা অন্ধকারে আবার আলো ফিরে আসে এই সিদ্ধান্তে। কিন্তু এই আলো একই সঙ্গে চিনিয়ে দেয় অনেক অন্ধকার, অন্ধকারের মুখ। অন্যান্য সব গল্পেই সত্যপ্রিয়বাবু নিরন্তর অমল মানুষের সন্ধান করেছেন। এই সন্ধান তাঁকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে। আসলে প্রত্যেক লেখকই তো তাঁর গল্পের নায়ক। নিজের জীবন আরও একটু অন্যভাবে অনুভব করার তাগিদেই মানুষ গল্প রচনা করেন, শিল্পের সত্য অনুসন্ধান অব্যাহত রাখেন। লেখকের সেই দায় অত্যন্ত দক্ষতায় প্রস্ফুটিত হয়েছে 'দ্বিতীয় জন্ম' গ্রন্থে।

গ্রন্থটির মুদ্রণমান খুব ভাল নয়, ব্যবহৃত কাগজও খুব সাধারণ অথচ এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে রূপ-রস-গন্ধ। আঞ্চলিক ভাষা, বিশেষত পূর্ব বাংলার বরিশালের মানুষের কথনভঙ্গিমা বিভিন্ন গল্পে নিপুণভাবে তুলে সত্যপ্রিয়বাবু এক্ষেত্রে তাঁর স্বাভাবিক অধিকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময় দেখা যায় ওপার বাংলার আঞ্চলিক ভাষা হাস্যকরভাবে লেখকরা উপস্থিত করেন—সত্যপ্রিয়বাবুর সে-রকম বিপর্যয় কখনও দেখা দেয়নি।

প্রবীণ লেখক কান্তি গুপ্তর 'লীলার জন্যে অসময়ে' গল্প সংকলনে ৯টি মাত্র গল্প স্থান পেয়েছে—বক্সিং, লীলার জন্যে অসময়ে, গোঁজ, মুখ, রাতের তারারা, অকুপেশন / পেশা, বুক পকেটে, খোঁদল এবং ছবি।

কান্তি গুপ্তর গল্পে সামাজিক অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব এবং মানবিকতার স্পর্শ থাকলেও গল্প বুনন ভঙ্গি সাধারণ। গল্পের ভাষা ও কথন ভঙ্গিমা অনেক ক্ষেত্রে আকর্ষণও হারিয়েছে। নাটকীয় পরিবেশ রচনার ঝোঁক কান্তিবাবুর অনেক গল্পেই ছড়িয়ে পড়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসঙ্কট ও জটিলতা, নীচতা, সঙ্কীর্ণতার ছবি খুব ছোট পরিসরে তিনি তুলে ধরতে পারেন। গল্পে নাটকীয়তা থাকায় পাঠক শেষ পর্যন্ত হয়ত পড়তেও বাধ্য হন এবং নিশ্চিতভাবে বলতেই হবে কান্তিবাবু মানবিকতার প্রতি আস্থাশীল বলেই পাঠকও ইতিবাচক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন।

নাটকীয়তার প্রসঙ্গ ধরেই 'ছবি' গল্পটিতে আমরা উপস্থিত হতে পারি। বন্ধু-পত্নীর মা প্রয়াত হয়েছেন—মৃত্যুর নির্মম করুণ কাহিনী মেয়ের মুখ থেকে শুনতে শুনতে লেখক (গল্পটি প্রথম পুরুষে রচিত) বিষণ্ণ। ওষুধ খেয়ে শুয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় নাটকীয় আলাপচারিতা। অ্যালবামের ছবি রক্তমাংসের মানুষের মতো কাহিনী বুনে চলে।

লেখক সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ মিশিয়ে সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবন এবং সামাজিক পরিবেশ চিত্রিত করেছেন। ছেলে মেয়ের স্বার্থপরতা, বৃদ্ধ বয়সে টাকার অভাবে চিকিৎসার বিভ্রাট, হাসপাতাল—থানা-পুলিশ-মন্ত্রী চক্র এবং একজন সাধারণ যোগাযোগহীন নাগরিকের জীবনযন্ত্রণার কাহিনী বিধৃত করেছেন লেখক নাটকীয় ভঙ্গিমায়। কেন এই ফর্ম নেওয়ার প্রয়োজন হল ঠিক বোঝা গেল না। সমালোচনামূলক সমাজভাবনার প্রকাশ ঘটানোর জন্য যে তীক্ষ্ণতা প্রয়োজন কান্তিবাবুর কলমে তার অভাব আছে।

অপেক্ষাকৃত নবীন গল্পকার গৌর বৈরাগীর প্রথম গল্প সংকলন পড়ার আগে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল, প্রাপ্তি তার চেয়ে যে কম নয় তা নিঃসংকোচে বলা যায়। গল্পগুলি আয়তনে ছোট, কখনও কখনও অতি স্বল্পদৈর্ঘ্য—গৌর খুব সাধারণ ভাষায় গল্প বলেন। প্রবল গল্পহীনতার আধুনিকতার বিরুদ্ধে যেন সরব প্রতিবাদ জানাতে চান তিনি। অথচ তিনিও অত্যন্ত আধুনিক। ভাষার সরলতা ও স্বচ্ছতার পাশাপাশি আছে তাঁর আধুনিক মনের প্রতিফলন। আপাত সরল গল্প গড়াতে গড়াতে এক সময় পাঠককে সচকিত করে তোলে। সরলতার পোশাক ছেড়ে গল্প জটিলতার আবরণে নিজেকে আবৃত করে নেয়। মধ্যবিত্ত মানসিকতা, সমকাল ও তার যন্ত্রণা নিপুণভাবে ধরতে পারেন গৌর। কোনও তত্ত্ব, তথ্য বা নীতিকথা গল্পে জোর করে তুলে আনার চেষ্টা করেন না তিনি। কাহিনীর ভার বহন করতে হলেও তাঁর গল্প পাঠককে ক্লান্ত করে না, বরং কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ে কাহিনীর ঋজু টানটান অবয়বে। মানবিক ও আধুনিক স্বচ্ছ দৃষ্টি তাঁর কলমকে শানিত করেছে, তাঁর গল্পগুলি মানবিক মূল্যবোধের উচ্চতর আদর্শে পৌঁছে দেয় পাঠককে।

গৌর বৈরাগীর গল্পগ্রন্থটিতে ১৭টি গল্প সংকলিত হয়েছে।

'সেই জ্যোৎস্নায় গোলক ও আমরা কয়েকজন' গল্পটিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মধ্যবিত্ত জীবন ও আবেগের ছবি চিত্রিত করা হয়েছে। যৌবনের উদার দিনগুলিতে, অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রবল আবেগ মানুষকে অন্যরকম উজ্জ্বলতায় নিয়ে যায়, সেই অনন্য দিনগুলির টুকরো টুকরো ছবির সঙ্গে মধ্যবিত্তের সুখবিলাস জীবন নিরাপত্তা, সঙ্কীর্ণতা এবং স্বপ্ন হারিয়ে যাওয়ার ছবি তুলেছেন লেখক। অনিমেষ, বিনয়, ব্রতীন, তুষার, স্নেহাকর এবং গোলকদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে সেইসব দারুণ দিনগুলি। এখন গোলক বড় ইঞ্জিনিয়ার, ঘুষখোর, টাকার কুমির, সুন্দরী বউ। বিনয়, স্নেহাকর, ব্রতীন যে-যার কাজে ব্যস্ত—ঈর্ষা, ব্যর্থতার গ্লানি পরশ্রীকাতরতায় বিষণ্ণ তাদের জীবন থেকে ভুলে না যাওয়ার শপথ হারিয়ে গেছে। কোনও রাজনৈতিক চালচিত্র নেই, তবু পড়তে পড়তে সত্তর দশকের অতিবিপ্লবীদের নিশ্চিন্ত জীবনে ভেসে যাওয়ার প্রতীক হয়ে উঠেছে তারা। কেবল অনিমেষ এখনও সেই স্বপ্নে আবিষ্ট হতে চায়, সংকলনের সেরা প্রতীকী গল্প সেই জ্যোৎস্নায় গোলক ও আমরা কয়েকজন।

'স্মরণসভার তারিখ' এ-রকমই আর একটি সুনির্মিত গল্প যার সমস্ত শরীর জুড়ে অন্তর্লীন ব্যঙ্গের স্রোত। বন্ধুর শবদাহ করার সময় থমথম করছে দুঃখ। টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে আসছে প্রণব, বিকাশ, বিনায়ক, পুলকদের।

নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া, অন্যের জন্য নিজের জীবনের একটা অংশ খরচ করে ফেলা এক বন্ধুর শব শ্মশানে দাহ করার সময় তাকে নিয়ে একটা দিন আলাপচারিতায় মেতে ওঠার জন্য স্মরণসভা করার তাগিদ অনুভব করেছিল প্রণব, বিকাশ, বিনায়ক, পুলকরা। কিন্তু স্মরণসভার কোনও দিন ঠিক করতে পারে না ওরা। শোকের আয়ু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনগুলো জরুরি হয়ে ওঠে। ছুটি খুঁজে সব দিক দেখে দিন স্থির করার প্রস্তাব আসে। মধ্যবিত্ত জীবনের এই ছবি গৌরের কলমে বার বার উঠে এসেছে। তিনি বিশ্লেষণের অনাবশ্যক দায়িত্ব গ্রহণ করেননি, ছবি এঁকে অন্তঃসারশূন্যতার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছেন মাত্র।

মানবিক মূল্যবোধ ও আর্থিক সঙ্কটে বিপন্ন খণ্ডবিখণ্ড মানুষের ছবি 'ফিরে আসা'। বাঁচার জন্য আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল এক বৃদ্ধ। ধ্রুব তাঁকে বেঁচে থাকার স্বাদ এনে দিল। অসহায় আত্মহননে প্রস্তুত সমাজকে বাঁচাতে ব্যক্তিস্বার্থ এবং সঙ্কীর্ণ হিসাব-নির্ভর জীবন নয়, চাই উদার মানবিকতায় সমৃদ্ধ মানুষ—এই প্রতীতি স্পষ্ট হয়েছে এই গল্পে। গৌরের প্রতিটি গল্পই বিস্তৃত আলোচনার গুরুত্ব দাবি করতে পারে। লক্ষ করার বিষয়, প্রায় দু' দশক আগে রচিত কয়েকটি গল্প এই সংকলনে আছে অথচ এখনও তা উজ্জ্বল।

চারজন গল্পকারের মধ্যে কিন্নর রায় সম্ভবত বয়সে নবীন যদিও বহু কাগজে বহুভাবে নামটা বার বার উঠে আসায় তিনি সুপরিচিত লেখক।

সত্তর দশকের লেখক কিন্নর গল্প ছাড়াও নিয়মিত উপন্যাস, প্রবন্ধ, ফিচার এবং কাগজের প্রয়োজনে সবই লেখেন। সর্বক্ষণের লেখক কিন্নরের কলম পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি এক ধরনের দক্ষতাও অর্জন করেছে এরই অনিবার্য পরিণতিতে।

কিন্নর প্রচুর লিখলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি নেন। শব্দ ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতন, বাক্য গঠনে মনোযোগী, কখনও কখনও নতুন রীতি প্রচলনে আন্তরিক। সমকাল কিন্নরের গল্পের প্রধান নায়ক হয়ে ওঠে সব সময়। ফলে ফিচার ও গল্পের সীমারেখা অনেক সময় দিগন্তে মিলেমিশে যায়। তাঁর আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল গল্পের অবয়বে খুব সাবলীলভাবে তিনি নানা তথ্য ও অতীতের কাহিনী ব্যবহার করতে পারেন। কোনও আকর্ষণীয় তথ্য পেলে তিনি বেমালুম হারিয়ে যেতে

দেন না, তাই তাঁর গল্পে গল্প ছাড়াও আরও অনেক অন্য প্রাপ্তি ঘটে।

কিন্নরের গল্পে একটা বড় সীমাবদ্ধতাও আছে বলে আমার অনুমান। তাঁর সব গল্পের নায়ক প্রায় একই ভাষায় ও একই ছকে ভাবে, অনুভূতির যন্ত্রণায় ছটফট করে এবং বিকশিত হয়। ফলে তাঁর গল্পে এক ধরনের যান্ত্রিকতা এবং গতির অস্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। কখনও কখনও এই পদ্ধতি আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও অনেকক্ষেত্রেই হোঁচট খেতে হয়। যান্ত্রিকতা ও সাংবাদিকতার ঝোঁক প্রবল হয়ে ওঠে। গল্পের কাঠামো শুধু নয়, বিষয় ও চরিত্র নির্বাচনেও কিন্নর প্রচলিত ধারার পরিপন্থী। 'অরূপ-কথা' সংকলনে ১০টি গল্প সংকলিত হয়েছে।

'অরূপ-কথা' গল্পের নায়ক নিতাই সাধু ভাবে, "বছর চারেক হল আমি আবার ঘড়ি পরি, মাথায় বড় চুল, দাড়ি কেটে ফেলেছি", 'দেওয়ার জন্যের ঘোড়া' গল্পে আলাপচারি ভঙ্গিতে জবেদ আলির ভাবনা: "আমার চার মেয়ের পর দুই ছেলে। ছেলেরা ছোট। চার মেয়েরই বিয়ে দিয়েছি। মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পর বাদামতলার পুরনো কাগজ ব্যবারির দোকানে আর নিয়ম করে বসি না"। 'কথা সাহিত্যিক' গল্পে লেখক সুকুমার ভাবে: "আমি রাইটার্সের ইউ ডি ক্লার্ক সুকুমার দত্ত আর কত পারি। আমার তো আর তিন মাস পরে ছেচল্লিশ হবে"।

কিন্নরের প্রায় সব গল্প থেকেই এ-রকম ভাবনা-পদ্ধতি তুলে আনা যায়। এক সঙ্গে পড়তে শুরু করলে এই ভাবনা-পদ্ধতি লেখকের এক ধরনের ম্যানারিজম বলে মনে হয়।

সমসাময়িক সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল টুকরো টুকরো ঘটনায় জড়িয়ে গেঁথে রাখার ঝোঁক কিন্নর পরিহার করতে পারেন না। হিন্দি ফিল্মের বাজার চলতি গানের কলি গল্পে অতীতেও ব্যবহার করেছেন তিনি। বর্তমান সংকলনেও তার ব্যতিক্রম নেই।

'মেড ইন ইন্ডিয়া' গল্পে কিন্নর অনেকটাই স্বাধীনতা নিয়েছেন। পাক-ভারত ক্রিকেট যুদ্ধ (সংবাদপত্র এভাবে চিত্রিত করতে অভ্যস্ত) ঘিরে বাতাসে যে টুকরো টুকরো মন্তব্য ঘুরে বেড়ায় সেগুলি গল্পে ব্যবহার করেছেন লেখক। শহিদুল আলি মল্লিক ধর্মে মুসলমান কিন্তু সে মনেপ্রাণে ভারতীয় দলের বিজয় চায়। লেখক যেন ধর্মান্ধ শক্তির মিথ্যা প্রচারের কথা মনে রেখেই শহিদুল চরিত্র চিত্রিত করার তাগিদ অনুভব করেছেন। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের খেলার ধারাভাষ্য দেওয়ার প্রবণতায় ফিচার-লেখকের আভাস ফুটে ওঠে। তবে এই গল্পে সমকালের ছবি খুব নিপুণ হাতে বুনেছেন কিন্নর।

'কথা সাহিত্যিক' গল্পেও ফিচার লেখকের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের স্মৃতিতে যে সাংস্কৃতিক মেলা বসে সেই মেলার বিবরণ, বিভূতিভূষণের বাসস্থান, পরিবেশ ও সমকালের অন্যান্য ছবি লেখক চিত্রিত করেছেন। কোনও পাঠক এই গল্প পড়তে পড়তে বিভূতিমেলা ও বিভূতিভূষণের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির মানসভ্রমণ সেরে নিতে পারবেন।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই — সংক্ষিপ্ত পরিসরে একজন লেখকের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিই কেবলমাত্র পাঠকের নজরে আনা সম্ভব। সেই চেষ্টাই করা হল। চার জন গল্পকারেরই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হল।

আলোচনা শেষ করার আগে একটি বিনীত অভিমত পেশ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। 'এই যে শুনছেন' শিরোনামায় কিন্নর গল্পগ্রন্থের কথামুখ লিখেছেন। 'চুয়াল্লিশ বছর' পেরিয়ে আসা লেখকের এ-রকম চুঁলতা বাঞ্ছনীয় কি না তা ভেবে দেখলে ভাল হয়। তা ছাড়া "এখন বুঝতে পারি গল্প লিখে উপন্যাস ফেঁদে সমাজ বদলান বোধ হয় সম্ভব নয়।" মন্তব্যটি কিন্নর 'এই যে শুনছেন'-এ লিখেছেন। লেখকের দায় ও কর্তব্য প্রসঙ্গে কিন্নরের ভাবনা-চিন্তা আরও একটু গভীরতা অর্জন করুক এই কামনা করি। □

দ্বিতীয় জন্ম — সত্যপ্রিয় ঘোষ / প্রত্যয়, কলকাতা-১৪ / ৬০.০০

লীলার জন্য অসময়ে — কান্তি গুপ্ত / অন্বয়, কলকাতা-১২ / ৫০.০০

গৌর বৈরাগীর গল্প — গৌর বৈরাগী / অনুষ্টুপ, কলকাতা-৯ / ৫০.০০

অরূপ-কথা — কিন্নর রায় / আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, কলকাতা-৯ / ৪০.০০

ভ্রমণ সাহিত্যলোকে মূল্যবান তিনটি সংযোজন

রণেন্দ্রনাথ দেব

অধ্যাপক গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, এ হেন বিজ্ঞানীর লেখা ভ্রমণকাহিনী পড়তে শুরু করার আগে মনে একটু ভয় ছিল। ২১৯ পৃষ্ঠার ঘনসন্নিবিষ্ট ছাপার মধ্যে অজস্র ইংরাজি কথা ও উদ্ধৃতি দেখে ভয় বেড়ে যাবারই কথা। কিন্তু বইটি পড়া শুরু করলে পর

বিরতি দিতে ইচ্ছা করে না। লেখক এটিকে রম্যরচনা বলেছেন। এই সংজ্ঞা সম্ভবত অপ্রযোজ্য। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী হিসাবে অতি উপাদেয় হয়েছে। আজকাল অবশ্য ভ্রমণকাহিনীর নামে নানান অলীক গালগল্পে পূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে এক বা একাধিক নায়িকা অপরিহার্য, সঙ্গে থাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে সংগৃহীত প্রচুর তথ্য। এই ককটেল উপভোগ্য হলেও সত্যকার ভ্রমণকাহিনী হলে গণ্য হবে কি? অন্যদিকে, কারও কারও লেখায় তথ্য প্রাচুর্য এত বেশি যে খুব বোদ্ধা না হলে সে লেখা পড়ে অধিকাংশ পাঠক তৃপ্তি পান না। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের লেখা তথ্যভূয়িষ্ট হলেও প্রাণবন্ত, এতে অবান্তর মনগড়া গল্পেরও স্থান নেই। তাঁর সত্যাবাদিতাই তাঁর লেখার প্রধান গুণ। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় চিত্রিত মহিলাদের প্রসঙ্গ দিয়েই আরম্ভ করা যাক। তিনি নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ, নারীর সাহচর্যে আনন্দ পান — একথা অকপটে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিদেশে যাবার পূর্বে তাঁর বিয়ে হয়েছে এবং তিনি একটি কন্যার পিতা, একথা কখনও বিস্মৃত হননি। ভোগকে সংযমের দ্বারা তিনি শাসিত করেছেন, তাই অঙ্গের অতীত যে মায়া নারীকে ঘিরে আছে তিনি তার সুধারস আকণ্ঠ পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। এই নারীদের সংখ্যাও কম নয় — জাপানি মেয়ে নরিকো (এর অনেক চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে) ও রোজি তানিগুচি লোরেন, ন্যানসি, বারবারা, সিন্ডি, জুলি, ডায়ান, বোজা রুডিন, মনিক প্রভৃতি। মেকসিকোর মেয়ে এমা রীজ-এর সহায়তায় মেক্সিকান সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সন্ধান পেয়েছেন লেখক। আবার ব্যাঙ্গালোরের মেয়ে সুধা রাও তাঁকে বিদেশে ভারতীয় সভ্যতার স্নিগ্ধ স্পর্শ দিয়েছেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শে দীক্ষিত। নারীর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলি উদ্ধৃত করেছেন সেগুলি সম্পূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ। দুয়েকটি নারীর আচরণ অশোভন হলেও (যেমন মিসেস মার্ক) নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অকৃত্রিম। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় বিদেশিনীদের মধ্যে শাড়ির রুচি শোভনতার প্রতি আকর্ষণের কথা জেনেও আমরা খুশি হলাম। আমেরিকার মেলায় তিনি হঠাৎ শাড়ি পরা আমেরিকান মেয়ে দেখে বিস্মিত হয়েছেন। বেলজিয়ামেও ওরকম ভারতীয় শাড়ি-পরা মেয়ে তাঁর চোখে পড়েছে। মাদার উইলি তো একাস্তই হিন্দু ভাবাপন্ন। অবশ্য ডঃ চট্টোপাধ্যায় প্রায় তিরিশ বছর আগে আমেরিকায় যান। রোজ মার্গারেটের মতো শাড়ি প্রেমিক মেয়ে এখনও কি আমেরিকায় দেখা যায়?

লেখক ১৯৬৪ সালে প্রথম আমেরিকায় যান, বসবাস করতেন প্রধানত কালিফোর্নিয়া অঞ্চলে। পরে অন্যান্য রাজ্যেও তাঁকে যেতে হয় এবং নিউ ইয়র্কেও কিছুদিন থাকেন। আমেরিকার বিভিন্ন সুন্দর স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেন, এগুলির বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী। নিউ ইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাসাদটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা মনোজ্ঞ। আমেরিকা ত্যাগ করার পরে ফেরার সময় তিনি লন্ডন প্যারিস বার্লিন রোম কায়রো পরিদর্শন করেন। বিশেষত সুইজারল্যান্ডের চিরনবীন সৌন্দর্য চমৎকার ধরা পড়ে। লেখকের চোখ দিয়ে আমরা এই অঞ্চলগুলির রূপ সানন্দে উপভোগ করেছি। পরবর্তীকালে লেখক আবার আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশেষত জার্মানিতে অবস্থান করেছেন। কালের ব্যবধানে দেশগুলিতে যে পরিবর্তন এসে গেছে তা চিহ্নিত করেছেন অভ্রান্তভাবে।

অধ্যাপনায় যুক্ত থাকায় আমেরিকার যুবসমাজকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। দেখেছেন, আমেরিকার ছেলেরা চঞ্চল ও পরিবর্তনপ্রিয় হলেও মেয়েরাও একান্তভাবে কামনা করে একটি স্থির বিবাহিত জীবন। তারা চায় নিরাপত্তা, একটি নির্ভরযোগ্য স্বামী। "ওদের দেশের মেয়েরা অর্থশালী মানুষের চেয়ে প্রতিভাশালী মানুষদের বেশি পছন্দ করে" (পৃ. ১১০)। সেই চিরন্তনী নারী। আমেরিকাবাসী ভারতীয় যুবকদের বর্ণনাও মনোজ্ঞ — বিশেষত জ্যাক সরদেশাইয়ের কথা। প্রসঙ্গত ঢাকার ছেলে আমানুল্লা খানের কথাও বলতে হয় যে ছিল প্লে বয় শিরোমণি। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণসঙ্গিনী একটি নান-মেয়ে তাঁকে তাঁর মনের গুপ্ত কথা খুলে বলেছিল, একথা শুনে আমানুল্লা মন্তব্য করেছিল সে নারীরূপের জগতে মত্ত মধুকর হলেও কখনও কোনও ধর্মযাজিকার মর্মে প্রবেশ করতে পারেনি। দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আমানুল্লাকে দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখে সুখী হয়েছিলেন।

লেখক গভীর ভাবে অভিভূত হয়েছেন ইউরোপ আমেরিকার মানুষের মনে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লক্ষ করে। কখনও কখনও তীব্র ভারতনিন্দার সম্মুখীনও হতে হয়েছে তাঁকে, যেমন মিসেস মার্কের কটূক্তিতে (পৃ. ২০৬)। এমনকী মনিকের মতো সহানুভূতিপরায়ণ মেয়েও একবার বিদ্রূপ করেছেন কলকাতাকে। কিন্তু এ জাতীয় ভারত দূষণের দৃষ্টান্ত অতি অল্প।

ভ্রমণকাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে লেখকের গভীর চিন্তাপ্রসূত মন্তব্যগুলিও আমাদের নাড়া দেয়। একটি উদাহরণ দিই। জ্যাক সরদেশাই তাঁর স্ত্রী ও ছোটমেয়ে সবিতাকে আমেরিকা নিয়ে এলে, লেখক লক্ষ করলেন, সবিতা অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে নিল। লেখক তা দেখে বলছেন — "আমাদের দেশে ইংরেজি শেখা যদি class I বা infant class অর্থাৎ Kinder garten থেকে আরম্ভ করে তাহলে ভাষা যে ভাল করে সহজে শিখতে পারে এই বোধশক্তি রাজনীতিবিদদের নেই" (পৃ. ৩৫)।

দুটি গুণের জন্য "পরবাসের পথে পথে" পড়ে আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি — এক, লেখকের আন্তরিকতা ও সততা। তিনি সত্য কথা শোভনভাবে বলার চেষ্টা করেছেন।

দুই, তাঁর কাব্যপ্রীতি বইটির আস্বাদ্যমানতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তো সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এ ছাড়া জীবনানন্দ ও এলিয়টও উদ্ধৃত হয়েছেন। লেখক বলছেন তাঁর এই বই "নিছক কাব্যিক মনের অভিব্যক্তি" (পৃ. ৮৬)। আরেক জায়গায় লিখেছেন, "আমি মূলতঃ কবিমনসম্পন্ন মানুষ দৈবাৎ গ্রহের ফেরে বিজ্ঞানী হয়েছিলাম কিছুদিন" (পৃ ১০৪)। আমাদের সৌভাগ্য, কেবল বিজ্ঞানচর্চার গণ্ডিতে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। বইটিতে কবিতার মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

"যেতে যেতে" বইটি ন'-টি রচনার সংকলন। ইরাকে, সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে এবং যুদ্ধের ছায়াতে স্মৃতিতে — এই দুটি মালবিকা চট্টোপাধ্যায় রচিত। অন্য সাতটি রচনা — ফ্লোরেন্সে, দান্তের বাড়িতে; বার্লিনে ব্রেশ্‌ট সেন্টারে, গোটের ভূগোলে; গ্রিসে, এপিডাভ্‌রসের থিয়েটারে; থিয়েটারের শহরে; কোচিনের ইহুদী পাড়ায় এবং পোলান্ডে, আউশউইৎসের মৃত্যুশিবিরে — জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। লেখক লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি এক রকম, রচনাশৈলীতেও মিল আছে। একই কলমের সৃষ্টি বলে মনে হয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বইটি লেখা। ব্যতিক্রম শুধু ইরাক ও কোচিনের ইহুদি পাড়া। প্রধানত জার্মানির, অংশত পোলান্ড ও গ্রিসের বর্ণনা বইটির বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে। রচনাগুলো ধারাবাহিক নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তান্তের আকারে লিখিত। কিন্তু এদের মধ্যে অন্তর্লীন একটা সূত্র আছে যাতে বইটি একটি সামগ্রিক চেহারা পেয়েছে। এই ঐক্যসূত্রটিকে বুঝতে হবে। লেখক-লেখিকা পাশ্চাত্যের শুধু স্থানের বর্ণনা দেননি, ওখানকার মানুষ ও সমাজের ছবিটিকে তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের দুটি বৈশিষ্ট্য সর্বাপেক্ষা বেশি ধরা পড়েছে —

এক, সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য — ইউরোপবাসীর ব্যাকুলতা দুই, মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে বিস্মৃত না হওয়া।

ইউরোপে মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে সমস্ত সাংস্কৃতিক পীঠস্থান প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। জার্মানি পুনর্গঠনের কাজে হাত দেবার পরই তাদের রঙ্গালয় ও বিধ্বস্ত চার্চগুলির পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে। কোনও কোনও অট্টালিকাকে হুবহু পূর্বতন রূপে বানাবার জন্য তাঁরা অশেষ শ্রম করেছে, অকাতরে অর্থব্যয় করেছে। সঙ্গীত চিত্রকলা নাটকের পীঠস্থানগুলিকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা তুলনাহীন। পাশ্চাত্যবাসীর মনোজীবনের এই দিকটি আমাদের বিস্মিত করে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রাচীন ও বৈচিত্র্যবহুল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে ও রকম সর্বাত্মক সংস্কৃতিঅনুরাগের অভাব স্পষ্ট। শিল্পী-সাহিত্যিক ও প্রতিভাবানদের গৃহগুলি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র সর্বদা তৎপর। লেখক কলকাতার ছোট ছোট রঙ্গকর্মী সংস্থার সঙ্গে সুপরিচিত বলে জার্মানির ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছেন ও তাদের বিকাশের বলিষ্ঠতা দেখে আনন্দিত হয়েছেন। জার্মানিতে নাট্যশালাগুলির সমৃদ্ধি, ব্রেশটের নাটকের উৎকর্ষ রক্ষার অতন্দ্র চেষ্টা দেখে লেখকের মতো আমরাও চমৎকৃত হয়েছি। দুটি প্রবন্ধ অনেকটা রম্যরচনাধর্মী। দান্তে ও গ্যেটে সম্বন্ধে প্রবন্ধ দুটি পাঠকেরা উপভোগ করবেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই দুই মহারথী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত। তাঁদের জীবনকথা প্রায় গল্পের মতো করে লেখক বিবৃত করেছেন। রেনেসাঁর যুগ থেকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিজগৎ কী আশ্চর্যভাবে বিকশিত হয়েছিল। আমরা শুনতে পাই অধুনা পাশ্চাত্যের জীবনে অবক্ষয়ের ছাপ পড়েছে। লেখকের বর্ণনা পড়ে আশ্বস্ত হলাম, অবক্ষয় অতদূর গড়ায়নি। গ্রিসে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চের পরিচিতিটিও খুব চিত্তাকর্ষী হয়েছে। সাধারণ ভ্রমণকাহিনীতে গ্রিসের এইসব দ্বীপগুলি উপেক্ষিত হয়ে থাকে — সেই জন্য লেখাটি আরও স্বাদু মনে হল।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয় ১৯৪৫ সালে। কিন্তু ইউরোপ আজও ওই যুদ্ধের বীভৎস ছায়া থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারেনি, সেই দিনগুলিকে কখনও ভুলতে পারেনি। সাধারণ পাশ্চাত্যবাসীর চেতনায় যুদ্ধ এক অবর্ণনীয় ক্ষতের মতো জেগে আছে। লেখিকা পট্‌স্‌ডামের যে ছবিটি এঁকেছেন তা স্পষ্ট ও জীবন্ত। এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে গভীরভাবে আলোড়িত করে আউশউইৎসের মৃত্যুশিবিরের চিত্র। ফ্যাসিস্ট নৃশংসতার একটি জ্বলন্ত আলেখ্য এটি। মানুষের মধ্যে যা কিছু হীন ও ঘৃণ্য তাকে জাগিয়ে তোলাই ছিল ফ্যাসিস্ট নীতির মূলকথা। সেই নীতির কুৎসিততম নিদর্শন আউশউইৎস যা লেখক স্বচক্ষে দেখে এসে অবিস্মরণীয়ভাবে চিত্রিত করেছেন। দু-একটি পংক্তি উদ্ধৃত করি :

"আমরা আউশউইৎসের প্রধান প্রবেশ দ্বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বৃষ্টি নামলো। প্রথমে টিপ্ টিপ্ করে, তারপর বেশ জোরে, সঙ্গে বাতাস। আমরা প্রায় কাঁপতে থাকি শীতে। এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। যখনই আমরা কোনও মৃত্যুশিবির দেখতে গেছি, অনিবার্যভাবে বৃষ্টি নেমেছে। জার্মানিতে ভাইমারের কাছে বুখেনওয়াল্ডে, মিউনিখের কাছে ডাখাউ-এ, বার্লিনের কাছে সাকসেন হাউজেন-এ, ডেনমার্কে ফ্রোরেস্লাভে। এখানেও বাদ গেল না।

"গেটের ওপর সেই লোহার লেখাটা : 'আরবাইট মাখ্‌ট ফ্রাই' — কর্মই আনে মুক্তি। নাৎসিরা এ জাতীয় ব্যঙ্গ করতে বোধহয় ভালবাসত। প্রায় সব বন্দিশিবিরের গেটেই কিছু না কিছু বাণী আছে। বুখেনওয়াল্ডে লেখা আছে 'ইয়েডেম ডাস জাইনে — যার যা প্রাপ্য সে তাই পায়।"

(পৃ. ১২১–২২)

"যেতে যেতে" শুধু ভ্রমণকাহিনী নয়, ইউরোপীয় জীবনচর্যার একটি ছোট দলিল। বাঙালি পাঠক এর মধ্যে চিন্তার খোরাক পাবেন।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর লেখা "আমার আমেরিকা আবিষ্কার" একটি সুন্দর সুলিখিত গ্রন্থ। আকারে ছোট হলেও (৯৮ পৃষ্ঠা) বইটি মনোহর। ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধের নামেই গ্রন্থের নামকরণ। পরেকার প্রবন্ধগুলি আনুষঙ্গিক রচনা।

শরৎকুমার ও তাঁর স্ত্রী বিজয়া মুখোপাধ্যায় দু'জনই কবি। ১৯৯৬ সালে উভয়ে আমেরিকা যান কয়েকটি সাহিত্যসভায় যোগদানের জন্য। এর মধ্যে ওদের দশদিন থাকার খরচ আমেরিকার সরকার বহন করেন, বাকিটা ওরা সংগ্রহ করেন নিজেদের উদ্যোগে। নিউ ইয়র্ক শিকাগো প্রভৃতি বড় শহর গুলো দেখা ছাড়াও ওরা টরন্টো ভ্রমণ করে আসেন। এই শহরগুলিতে তাঁদের পরিচিত বন্ধুদের কথা তো রয়েছেই, যেমন ভারতী মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ, তা ছাড়া আমেরিকার বিভিন্ন সাহিত্যসংস্থা ও সাহিত্যপত্রিকার কথাও প্রাসঙ্গিক ভাবে এসে গেছে; পি-ই-এন ও পোয়েট্রি পত্রিকার বর্ণনা পড়ে আমাদের কৌতূহল বাড়ল। তারা দু'জনই রামকৃষ্ণ মিশনের সাংস্কৃতিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত। স্বভাবতই আমেরিকার বিভিন্ন বেদান্ত কেন্দ্রে তাঁরা গেছেন। হয়ত আমেরিকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশবার ততটা সুযোগ তাঁরা পাননি, কিন্তু স্যাম ও এলভিরা মেরিটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অনেক চরিত্রের ছোট রেখাচিত্র তিনি এঁকেছেন। আমেরিকার জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে লেখক ১৯৯৬ সালের বাজার দরে ভারত ও আমেরিকার পার্থক্য চমৎকার স্পষ্ট করে তুলেছেন। সারণীটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হবার যোগ্য :

	ভারতে ভারতীয় মুদ্রায়	আমেরিকায় তুলনীয় ভারতীয় মুদ্রায়
মধ্যবিত্তের মাসিক আয়	৩০০০	১,০৮,০০০
পেট্রোল (লিটার প্রতি)	২২	১২
আমিষ টিফিন (এক প্লেট)	২৫	১৮০
ব্রয়লার মুরগি বা মাছ (এক কেজি)	৬০	২৫
চাল-গম (এক কেজি)	১২	৫
সাধারণ দুধ (লিটার প্রতি)	১৬	৯
আপেল (এক কেজি)	৩০	১৩
আলু (এক কেজি)	৩	২২
ডিম (এক ডজন)	১৮	২২
স্থানীয় ফোন কল	২	বিনামূল্য
জোড়া বিস্কুট (১৫০ গ্রাম প্যাকেট)	১৫	৪০
কলকাতার বাংলা পূজা সংখ্যা	৫০-৭৫	৩০০-৪০০
নতুন ছোট মোটর গাড়ি	২,০০,০০০	২,০০,০০০
মেট্রো ভাড়া	৩	১০৮

এ-বছরে টাকার বিনিময় মূল্য ও দামের অনেক হেরফের হয়েছে, তবু এই তুলনামূলক মূল্যতালিকাটি আমেরিকার প্রতিদিনকার জীবনযাত্রকে বুঝতে সাহায্য করে।

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ। তাঁর বিচারপ্রণালী পক্ষপাতহীন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হলেও আমেরিকায় স্বামীজির অবস্থান ও প্রভাব বিষয়ে অনেক স্পষ্ট কথা বলেছেন। মিথ্যা অপবাদ খণ্ডনও করেছেন। জনৈক বাংলাদেশি লেখক তাঁকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ১৪০০ সাল.কবিতাটি একজন ইংরাজ কবির রচনার অনুকৃতি। তিনি তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন এই মন্তব্য ভিত্তিহীন, অসার। লেখকের অভিমতগুলি সুচিন্তিত এবং যুক্তিনিষ্ঠ। প্রবন্ধটির প্রথমাংশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হলেও সুলিখিত।

একটি বিষয় শুধু আমাদের কাছে পীড়াদায়ক ঠেকেছে — অ্যালান গিন্‌স্‌বার্গ প্রসঙ্গ। গিন্‌স্‌বার্গ মানুষ হিসাবে না কবি হিসাবে গণনীয়? এই চরিত্রটিকে নিয়ে এতগুলি পৃষ্ঠা লেখক কেন ব্যয় করলেন? সম্ভবত এই একটি ক্ষেত্রে বন্ধুপ্রীতি তাঁর বিচার স্পৃহাকে ব্যাহত করেছে। সেই তুলনায় ভাল লেগেছে উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামসের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন। উইলিয়ামসের কবিতাগুলির অনুবাদ অবশ্যই উপভোগ্য।

'স্বামীজির চোখে আমেরিকা, আমেরিকান' এই পর্যায়ে

স্বামীজির মন্তব্যগুলির বাংলা অনুবাদও হৃদ্য লেগেছে আমাদের। আরেকটি জিনিসের প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা থেকে উদ্ধৃতিগুলি চমৎকার।

নতুন আমেরিকাকে যাঁরা জানতে চান শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বইটি তাঁদের অবশ্যপাঠ্য বলে গণ্য হবে।

বাংলা ভাষায় ভ্রমণকাহিনী একান্ত শীর্ণ না হলেও বিশাল নয়। এদের মধ্যে অনেক মূল্যবান রত্ন রয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্রের "পালামৌ" একটি অপূর্ব সৃষ্টি। বাংলায় "পালামৌর" মতো বই দুটি লিখিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির ও ব্যাপ্ত সহানুভূতির পরিচয় বহন করে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখাগুলি সংখ্যায় কম হলেও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী। জলধর সেনের পথ ধরে প্রবোধকুমার সান্যাল, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ প্রভৃতি বাংলা ভ্রমণসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ভ্রমণকথায় একটি নতুন স্বাদ যুক্ত করেছিলেন। রামনাথ বিশ্বাস দিয়েছিলেন বহু অচেনা জগতের সন্ধান। অন্যদিকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণকথাগুলি অফুরন্ত তথ্য ও জ্ঞানগর্ভ মন্তব্যের খনি। বাংলার এই সমৃদ্ধিশালী ভ্রমণসাহিত্যলোকে আলোচ্য তিনটি গ্রন্থই মূল্যবান সংযোজন রূপে পাঠকদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে, তা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। □

পরবাসের পথে পথে — গোরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় / দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭৩ / ৬০.০০

যেতে যেতে — মালবিকা চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ / ৫০.০০

আমার আমেরিকা আবিষ্কার — শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় / এম-সি-সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স্‌, কলকাতা -৭৩ / ৩০.০০

বাংলা ও মারাঠি নাটক

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

আমরা ভারতীয়রা যে নাগরিক থিয়েটার চর্চা করি তার সূত্র যে ইউরোপীয় নাট্যকলার প্রেক্ষাপট থেকে ধার করা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউরোপীয় শিল্প-সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার আগে যে এ দেশে নাট্যচর্চা ছিল না, তা নয়, তবে এই নাট্যচর্চা ছিল মুক্তলোকনাট্যচর্চা। বাংলায় যাত্রা, হাফ আখড়াই, আখড়াই, কীর্তন, অসমে ওজাপলি, মহারাষ্ট্রে তামাশা, পাঞ্জাবে ভাণ্ড প্রভৃতি সব ধরনের নাট্যচর্চা ছিল মূলত লোকআঙ্গিকের রূপে মুক্তনাট্যচর্চা। ইউরোপীয়রা এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিজেদের বৃহত্তর প্রয়োজনেই প্রথমে ভাষা তারপরে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির নির্মাণ ও চর্চায় মনোযোগী হয়ে উঠল। এদেরই উৎসাহ ও উদ্যোগে তৈরি হল থিয়েটার, যার বিবর্তিত রূপ আজকের নাগরিক থিয়েটার। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হল আধুনিক ভারতীয় ভাষায় নাট্যচর্চা। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় নাট্যচর্চা যখন কোথাও দ্বিধান্বিত বা কোথাও ঈষৎ বিলম্বিত তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাংলা ভাষায় ও পশ্চিম ভারতে মারাঠি ভাষায় এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস প্রথম লক্ষ করা গেল। এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক নাগরিক থিয়েটারের (বিশেষত বাংলা ও মারাঠি থিয়েটারের) গতিপ্রকৃতি ও প্রধান প্রধান প্রবণতাকে অনুধাবনের চেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে বিপ্লব চক্রবর্তীর "বাংলা নাটক : মারাঠি নাটক" গ্রন্থে।

সাতটি মূল্যবান পরিশিষ্টসহ চারপর্বের এই গ্রন্থে বাংলা নাটক ও মারাঠি নাটকের এক তুলনামূলক ইতিহাস রচনার প্রয়াস করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথমপর্বে বাংলা ও মারাঠি নাটকের সাধারণ আলোচনার সঙ্গে একেবারে প্রাথমিক পর্বের সামাজিক নাটক, নিষিদ্ধ নাটকের ছদ্মবেশে রাজনৈতিক নাটকের উদ্ভব ও বিবর্তন, সহবাস সম্মতি আইন কেন্দ্রিক সামাজিক সংক্ষোভ এবং বাংলা ও মারাঠি নাটকে সেই প্রভাবের তুলনামূলক বিচার করা হয়েছে, গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা নাটকের ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তৃতীয় পর্বে মারাঠি নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, চতুর্থ পর্বের প্রথমার্ধে বাংলা ও মারাঠি নাটকের পারস্পরিক সংযোগ ও প্রভাবের কথা বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় পর্বে বাংলা নাটক ও মারাঠি নাটকের একটা তুলনামূলক কালপঞ্জি বিবৃত করা হয়েছে। আধুনিক বাংলা ও মারাঠি নাটকের তুলনামূলক এক আলোচনার মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থে আধুনিক ভারতীয় নাটকেরই একটি রূপরেখা নির্মাণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা নাটকের একেবারে সূচনাপর্বে ১৮৫৫ সালে "কুলীন কুলসর্বস্ব" এবং তার পরবর্তী সময়ে "নীলদর্পণ," "জমিদার দর্পণ", "চা-কর দর্পন", "সধবার একাদশী", "একেই কি বলে সভ্যতা", "বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ" প্রভৃতি নাটকে সমাজজীবনের গভীর ও জটিলরূপ যেমন অঙ্কিত হয়েছে তেমনই সমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও অবিচারের ছবিও নাট্যরচনাতে প্রতিভাত হয়েছে। বাংলা ভাষায় লিখিত এই নাটকগুলির অনেক নাটকই অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই অনুবাদ কর্মগুলির মধ্যে রাধাচরণ গোস্বামীকৃত হিন্দি অনুবাদ "বুড়ে মুঁহ মুখমে" (বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ) এবং মা. ডি. বল্লডেকর কৃত নীলদর্পণের মারাঠি অনুবাদ খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ। বাংলা নাটকে যেভাবে বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কুলীনবিবাহ প্রভৃতি সমস্যা স্থান পেয়েছে, অন্যান্য ভারতীয় ভাষার নাট্যকর্মেও বিশেষ করে মারাঠি নাট্যচর্চাতেও এই সমস্যাগুলি স্থান করে নিয়েছে। কার্যত উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে সমাজসংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার ঢেউ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রান্তেই ছড়িয়ে পড়ে। তারই প্রভাবে দেখা যায় ১৮৬৫ সালে বিষ্ণুপরশুরাম শাস্ত্রী পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের বিধবাবিষয়ক গ্রন্থটির মারাঠিতে অনুবাদ করেছেন। দেখা যায় ১৮৪৮ – ১৮৫০ সাল নাগাদ মহারাষ্ট্রেও সংস্কারবাদী লেখকদের রচনা প্রকাশ পাচ্ছে। গোপালহরি দেশমুখ এই সময়ই "প্রভাকর" পত্রিকায় "শতপত্র" লিখে আলোড়ন তুললেন। এই লেখায় বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ঠাঁই পেল। প্রায় এই একই সময়ে সমাজসংস্কার আন্দোলন-প্রসূত সামাজিক নাটক মারাঠি ভাষায় রচিত হতে শুরু হল। দীনবন্ধু, মধুসূদন, উপেন্দ্রনাথের নাট্যরচনার মতো গোবিন্দবল্লাল দেওল বা কোলহটকরের "শারদা" ও "মতিবিকার" দুই নাটকেই বাংলা প্রহসনধর্মী নাটকের প্রভাব স্পষ্ট। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবেই খাদিলকর "কীচক বধ" (১৯০৭) এবং "ভাইবন্ধকী" (১৯০৯) নাটক দুটি রচনা করেন। ১৮৭৬ সালে লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলটি গৃহীত হবার আগে "গজদানন্দ ও যুবরাজ", "সুরেন্দ্রবিনোদিনী" ও "দি পোলিশ অফ্ পিপ্ অ্যাণ্ড শিপ্" নাটকগুলি যেভাবে বাংলায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল ঠিক তেমনই "কীচক বধ", "রানা ভীমদেও", "সঙ্গীত রাষ্ট্রোদ্ধার" প্রভৃতি নাটকগুলি মহারাষ্ট্রে আলোড়ন তুলেছিল। বাংলা ও মারাঠি এই সব নাটকগুলি প্রায় একইভাবে দর্শকের মনে দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিল; এবং ব্রিটিশ শাসকের কাছে এগুলি " লাইক টু এক্সাইট ফিলিং অফ্ ডিস্‌স্যাটিস্‌ফ্যাকসন টুওয়ার্ডস দি গভর্মেন্ট," বোধ হওয়ায় নাটকগুলির নিষিদ্ধকরণ ঘটেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলা ও মারাঠি এইসব নাটকগুলির নিষিদ্ধকরণ এটাই প্রমাণ করে যে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্বে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তে বাংলা ও মারাঠি নাটক একই সঙ্গে বিশেষ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। প্রায় এর কাছাকাছি সময়ে ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন পাশ হয়। সহবাস সম্মতি বিতর্ক মারাঠি নাটকে যতটা গুরুত্ব পেয়েছিল, বাংলা নাটকে ততটা গুরুত্ব পায়নি।

কালের বিচারে বাংলা নাটক মারাঠি নাটকের তুলনায় অগ্রজ। ১৭৯৫ সালে লিয়েবেদফ বাংলায় এবং ১৮৪৩ সালে বিষ্ণুদাস ভাবে মারাঠিতে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৮৫৬ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন কুলসর্বস্ব" বাংলাভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক। ১৮৫৯ সালে মারাঠি ভাষায় রচিত গোবিন্দনারায়ণ মাড়গাঁওকারের "ব্যবহারোপোযোগী নাটক" হল প্রথম মারাঠি সামাজিক নাটক। বঙ্গভঙ্গের সময়কাল থেকেই বাংলা ও মারাঠি নাটকের সাদৃশ্য সর্বগোচর হতে শুরু করল। ক) দেশাত্মবোধক নাটক, খ) রঙ্গব্যঙ্গ এবং হিউমার আশ্রয়ী নাটক, গ) বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ, ঘ) বিদেশি নাটকের অনুবাদ ও অনুপ্রেরণা ঙ) রিয়েলিজম বা বাস্তববাদকে পরিহারের চেষ্টা — বাংলা ও মারাঠি উভয় ভাষায় নাট্য কর্মগুলিতেই পরিলক্ষিত হল।

চারের দশকে একই সঙ্গে বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে ব্যবসায়িক থিয়েটারের প্রথাবাহিত নাটকের পরিবর্তে পরীক্ষামূলক নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু এই সময়ই বাংলা ও মারাঠি নাটকের তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যও স্পষ্ট হল। যদিও গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলন হল মুম্বাই শহরে তথাপি গণনাট্যের ক্ষেত্রে প্রভাবের মাত্রাটা তত বেশি স্পষ্ট হল না। রাজনৈতিক নাটক বিশেষ করে বামপন্থী নাটকের ধারা বাংলা নাটকের গতিশীলতাকে চারের দশক থেকে পুষ্টি জুগিয়েছে। কিন্তু বামপন্থী রাজনীতি মারাঠি নাটকের ক্ষেত্রে আদৌ তেমন গুরুত্ব পায়নি। তবে ছয়ের বা সাতের দশকে বাংলা ও মারাঠি নাটক প্রায় একই ভাবে বৈচিত্রের সন্ধানে এগিয়ে এসেছে। বাংলা নাটকের উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখের নাট্যরচনা ও নাট্যকর্মের সঙ্গে বিজয় তেণ্ডুলকর, জয়বন্ত দলভি, মহেশ এলকুঞ্চওয়ার, সতীশ আলেকর, অনিল বারওয়ে প্রভৃতির নাট্যরচনা ও নাট্যকর্ম একইভাবে আধুনিক ভারতীয় নাটকের সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতিকেই চিহ্নিত করেছে।

গ্রন্থের প্রথমপর্বে বাংলা নাটক ও মারাঠি নাটকের এই তুলনামূলক আলোচনার পর শ্রীচক্রবর্তী দ্বিতীয় পর্বে বাংলা নাটকের বিকাশের ধারা (১৮৫২ – ১৯৯৩) এবং পরে মারাঠি নাটকের ইতিহাস (১৮৪৩ – ১৯১৩) বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পর্বে বিষ্ণুদাস ভাবের "সীতা স্বয়ংম্বর" নাটকের সূত্রে মারাঠি নাটকের প্রারম্ভকাল ও পরবর্তী সময়ে (১৮৬১) বিনায়ক জনার্দন কীর্তনের "থোরাল মাধব রাও পেশাবে" নামে মৌলিক নাট্য রচনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নাটক রচনার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই পর্বেই পৌরাণিক নাটকের বিকাশ, প্রহসন ও সামাজিক নাটকের প্রস্তুতিপর্বের কথা বিবৃত হয়েছে। বাংলা নাটকের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে ১৮৫৪ – '৯৯ সালের মধ্যে বাংলায় পাঁচশত প্রহসন রচিত হয়েছে। এরূপ বিপুল সংখ্যক প্রহসন অবশ্য মারাঠি নাটকের ইতিহাসে নেই। তবে ১৮৮৯ সালের পরের মারাঠি নাটকে আন্নাসাহেব কির্লোস্কর নবযুগ সঞ্চারিত করলেন। তাঁরই প্রভাবে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে মারাঠি নাটকে নতুন প্রাণস্পন্দন শোনা গেল। দেওল, খাদিলকর, গডকরি, ওয়েরেকর প্রমুখ

নাট্যকারের নাট্যরচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠল মারাঠি নাটক। এই সময়ই ১৯৩৩ সালে মারাঠি ভাষায় "প্রবলেম প্লে" তৈরি করে নাট্যমন্বন্তর গোষ্ঠী এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটিয়ে দিল। "আন্ধাভ্যাচী শালা" নাটকে (১৯৩৩) প্রশ্ন তোলা হল একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীরূপে কোনও নিষ্কলুষ চরিত্রের মেয়েকে আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, তা হলে একজন নারী কেন অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা করবে না। চল্লিশের দশকে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার সময়ে তুকারাম করমলকরের "দাদা" নাটিকাটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই অবশ্য মারাঠি নাটকে প্রগতিবাদী চিন্তার প্রসার স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ঘটনা ও পটভূমি অবলম্বনে লেখা এই ধরনের নাটকগুলিকে মারাঠিতে বলা হয় "রাজকীয় নাটক"। খাদিলকরের "কীচকবধ" থেকে শুরু করে সহস্রবুদ্ধের "হওন", দেশাই গুরুজী রচিত "কাঙাল ভারত" নাটকগুলি তারই প্রমাণ। এই গ্রন্থে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যেমন বুদ্ধদেব বসুকে আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, মারাঠি নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনই বিজয় তেণ্ডুলকর, মহেশ এলকুঞ্চওয়ার, অনিল বারওয়ের নাটকগুলিকে একটু অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থপর্বের প্রথম অর্ধে বাংলা ও মারাঠি নাটকের পারস্পরিক সংযোগ ও প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। একথা ঠিক যত সামাজিক নাটক বাংলায় রচিত হয়েছে, মারাঠিতে তত হয়নি। অন্যদিকে মারাঠিতে যত "দলিত নাটক" লেখা হয়েছে, বাংলায় তা হয়নি। অবশ্য নিষিদ্ধ নাটকের ক্ষেত্রে বাংলা ও মারাঠি নাটক একইভাবে বিদেশি শাসকশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আসলে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থানগত তারতম্য এই দুই ভাষার নাটকের মৌল পার্থক্য সূচিত করেছে। চল্লিশের দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা উত্তর উদ্বাস্তু সমস্যা, ষাট ও সত্তরের দশকে রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা, আশির দশকে শাসক দলের একটি বড় অংশের গণসংগঠনরূপে গণনাট্যের সুস্থিতি ও রাজ্য সরকারের আনুকূল্য লাভ বাংলার মতো এসবের কিছুই মহারাষ্ট্রে ঘটেনি। ফলে পশ্চিমবাংলার নাটকে রাজনৈতিক সচেতনতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, মহারাষ্ট্রে ততটা পায়নি।

এই পর্বের দ্বিতীয়ার্ধে ১৭৯৫ থেকে শুরু করে ১৯৯৫ সাল অবধি বাংলা নাটক ও মারাঠি নাটকের এক তুলনামূলক কালপঞ্জি রচিত হয়েছে, সেখানে বাংলা ও মারাঠি নাটক ও নাট্যাভিনয়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টগুলিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বাংলা নাটকের মারাঠি অনুবাদ, মারাঠি নাটকের বাংলা অনুবাদ, শেক্সপিয়র ও অন্যান্য বিদেশি নাট্যকারের রচনা, বাংলা ও মারাঠি অনুবাদের এক বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ তালিকা।

বিপ্লব চক্রবর্তীর এই কাজ ভবিষ্যতে বাংলা ও মারাঠি নাটক নিয়ে যারা গবেষণা করতে ইচ্ছুক সেই সব অনুসন্ধিৎসুদের কাছে এক উন্মুক্ত পথের সন্ধান দিতে পারবে। প্রাদেশিক গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপনার যুগপৎ অনিবার্যতা ও গুরুত্ব এই গ্রন্থ রচনায় দৃষ্ট হয়।

তবে গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থে কতিপয় অসঙ্গতিও চোখে পড়ে। দ্বিতীয় পর্বে বাংলা নাটকের বিকাশের ধারা বর্ণনায় কেন এবং কী কারণে শিশিরকুমারের নাট্যচর্চা ও রবীন্দ্রনাট্যচর্চাবাদ পড়ল তা বোঝা গেল না। নাট্যচর্চার বিবর্তনে নাট্যদলগুলির উদ্ভব ও তার সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটও এই গ্রন্থের আলোচনায় স্থান পায়নি। বাংলা নাটক ও মারাঠি নাটকের তুলনামূলক কালপঞ্জিতে (১৭৯৫–১৯৯৫) আশ্চর্যজনক ভাবে কলকাতা ও মফস্বলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দল ও তাদের নাট্যচর্চার বর্ণনা বাদ পড়ে গেছে। নাট্যচর্চার বিবর্তনের ইতিহাসেও রাহুল সংকৃত্যায়ন, জন রিড বা নিকোলাই অস্ত্রভস্কির বিখ্যাত রচনাগুলির অনুপ্রেরণায় রচিত বাংলা নাটকগুলির প্রসঙ্গ আলোচনাযোগ্য বোধ করেননি কেন এই গ্রন্থে তারও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। এই ধরনের সামান্য কিছু অসঙ্গতি সত্ত্বেও বিপ্লব চক্রবর্তীর "বাংলা নাটক : মারাঠি নাটক" উৎসাহী নাট্যমেদী ও নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাসচর্চাকারীদের কাছে এক মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবেই বিবেচিত হবে। □

বাংলা নাটক : মারাঠি নাটক — বিপ্লব চক্রবর্তী / রত্নাবলী, কলিকাতা-৮ / ৯০.০০

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

মিসেস এস.সি. বেলনো — উনিশ শতকের এক মহিলা শিল্পী

আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে ইউরোপীয় শিল্পী বিশেষ করে ব্রিটিশ শিল্পীরা ধনদৌলত, নৈসর্গিক শোভার টানে ঐশ্বর্যময় দেশ ভারতে আসতে শুরু করেন। স্বদেশের প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি পরিত্যাগ করে ভাগ্য ফেরানোর তাগিদে ওদের এদেশে আসা। এসেছিলেন টিলি কেটল ও জন যোকানি 'স্বর্ণধূলির উপর গড়াগড়ি খাওয়ার' ('anticipated to roll in gold dust') আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। অভিযানকারী শিল্পী উইলিয়াম হজেস এদেশে এসে পর্যাপ্ত পরিভ্রমণ করে বহু উপঢৌকন ও অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে যান। আসেন শিল্পী জর্জ উইলিয়ামসন, জর্জ সেটন, টমাস হিকি, ওজিয়াস হামফ্রে, জন আলেফাউন্ডার, জেমস ওয়েলস, টি. মরিস, জর্জ চিনারি যাঁরা টিলি কেটল যোকানির মতো প্রতিকৃতি চিত্র এঁকে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন। অন্যদিকে হজেস, টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল ঐতিহাসিক ইমারত, স্মৃতিসৌধ, নৈসর্গিক চিত্র অঙ্কন করে স্বদেশে 'সুভেনির' চিত্র হিসাবে উপহার দিয়েছেন। এই শিল্পীরা কখনও এদেশের লোকেদের সামাজিক জীবন আঁকেনি। এই কাজে প্রথম ব্রতী হন তিনজন মহিলা শিল্পী যাঁরা উনিশ শতকে প্রথমে এদেশে আসেন এবং দেশের মানুষের ঘনিষ্ঠ সমাজজীবনের ছবি আঁকেন। এই তিনজন শিল্পী হচ্ছেন মিসেস ফ্যানি পার্কস, মিস এমিলি ইডেন ও মিসেস এস.সি. বেলনো। এঁদের মধ্যে মিসেস বেলনোর নাম সর্বপ্রথম করতে হয় কারণ তাঁর তুলি থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র প্রথম পাওয়া যায়।

ফ্যানি পার্কস ও এমিলি ইডেনের পূর্ব জীবন সম্বন্ধে যেমন বিস্তারিত তথ্য জানা যায় বেলনোর বাল্যজীবন বা শিক্ষা জীবন সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায় না। এমনকী তাঁর পূর্ণ নামও অজানা। তাঁর সম্বন্ধে জানার একমাত্র সূত্র হচ্ছে তাঁর অঙ্কিত দুটি অ্যালবাম বা আলেখ্য কুঞ্চিকা যার শিরোনাম হচ্ছে "24 Plates Illustrating of Hindoo and European Manners in Bengal" এবং "The Sandhya or The Daily Prayers of the Brahmins Illustrative in a series of original Drawings from Nature", যথাক্রমে কলকাতা ও এলাহাবাদ থেকে ১৮৩২ ও ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। অবশ্য ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত নামে একজন বাঙালি ডাক্তারের প্রতিকৃতি চিত্রও তাঁর আঁকা। তৈলমাধ্যমে অঙ্কিত এই চিত্রটি বর্তমানে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে সংরক্ষিত।[১] শিল্পীর পূর্বজীবন সম্বন্ধে যে তথ্যটুকু পাওয়া গেছে তা হচ্ছে ফরাসিভাষী এই মহিলা জঁ জ্যাক বেলনো নামে এক ফরাসিকে বিয়ে করেন। মিঃ বেলনো ১৮০৬ সালে এদেশে আসেন এবং একজন অনুচিত্রকর হিসাবে শ্রীরামপুরে বসতি স্থাপন করেন। পরের বছর তিনি কলকাতায় এসে প্রথম ধর্মতলায় ও পরে কসাইতলায় বাসা নেন।

এই সময় মূল্যের বিনিময়ে চিত্র অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা দিতে শুরু করেন।[২] ১৮১৩ সালে কলকাতার কোনও দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় মিঃ বেলনো তাঁর সমস্ত চিত্রসম্ভার নীলামে বিক্রি করবেন বলে ঠিক করেছেন কারণ তিনি ইউরোপ চলে যাবেন।[৩] কিন্তু কোনও কারণবশত তাঁর ইউরোপ যাত্রা হয়নি। ১৮২২ সালে মিঃ বেলনো চিত্রশিল্পের অন্যতম শাখা লিথোগ্রাফ বা খোদাইচিত্র অঙ্কনে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন।[৪] সম্ভবত মিসেস বেলনো এই সময়ে এই দক্ষতার অধিকারী হন। কেননা তার প্রথম অ্যালবাম "24 Plates Illustrating of Hindoo and European Manners in Bengal" ১৮৩২ সালে প্রকাশিত।[৫] বেলনো পরিবার ১৮৩২ সাল পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন এবং তারপর ফ্রান্স চলে যান। এই শিল্পী দম্পতি সম্ভবত ১৮৩৯ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং উত্তর ভারতের বেশ কিছু প্রাচীন শহর দেখার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এর পরে তাঁরা প্রাচ্য দর্শনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন কিন্তু ১৮৬৪ সালে বাটাভিয়ায় মিঃ বেলনো ৬৪ বছর বয়সে মারা যান।[৬] বিধবা মিসেস বেলনো কলকাতায় ফিরে আসেন এবং শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি জল রং, চক, ক্রেয়ঁ প্রভৃতি মাধ্যমে কাজ করেন। উত্তর ভারতে থাকাকালীন তিনি বেনারস, এলাহাবাদ ও 'হিন্দু ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যক্তিদের

অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করেন।[৬] এই পরিভ্রমণ তাঁর জীবনে বিরাট ফলপ্রসূ হয়েছিল। কারণ ব্রাহ্মণদের পূজা অর্চনার বিধিপ্রণালী চিত্রায়ন করতে সাহায্য করেছিল। এই কাজে তিনি একাধারে পেন ও পেনসিল ইত্যাদি ব্যবহার করে হিন্দুদের পূজাআচারের যথার্থ চিত্রায়ন করার প্রয়াসী হন। এই সময়ে ১৮৫১ সালে এলাহাবাদ থেকে তাঁর দ্বিতীয় অ্যালবাম 'সন্ধ্যা' প্রকাশিত হয়।[৭] মিসেস বেলনোর শেষ ঠিকানা পাওয়া যায় ৬নং রাইটার্স বিল্ডিংস।[৮] তাঁর মৃত্যুর তারিখ আজও অজানা।

মিসেস বেলনোর জাতীয়তা নিয়ে এদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে তিনি বাঙালি মহিলা।[৯] অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন তিনি পর্তুগিজ জাতি উদ্ভূত।[১০] কিন্তু উভয়ের কেউ তাঁদের এই ধারনার পিছনে কোনও যুক্তি দেননি। ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায় মনে করেন ডক্টর সেনের এই ধারনা সম্ভবত তাঁর বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করা থেকে এসেছে। রায়-এর মতে মিসেস বেলনোর মাতৃভাষা ফরাসি এবং তিনি বিয়ে করেন একজন ফরাসি শিল্পীকে। এই শিল্পী দীর্ঘদিন এদেশে বিশেষ করে কলকাতায় কাটিয়েছেন।[১১] তাঁর আরও বিশ্বাস যে মিসেস বেলনো এদেশেরই মেয়ে। কারণ এদেশের মেয়ে হিসাবে তিনি যে সুবিধা ভোগ করেছেন অন্য কোনও বিদেশির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না যতই সেই আলোকপ্রাপ্ত বিদেশি এদেশের লোকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন না কেন।[১২] অঞ্জলি সেনগুপ্তও এই ধারণা পোষণ করেছেন।[১৩] রায় ও সেনগুপ্ত উভয়াই মিসেস বেলনোর প্রথম অ্যালবামের ভূমিকার উপর ভিত্তি করে তাঁকে এদেশের মেয়ে বলে মনে করেছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন 'A native of the country some peculiarities of whose custom and ceremonies I have attempted to depict'[১৪] এই উক্তি করে সম্ভবত শিল্পী বলতে চেয়েছেন এদেশীয় বাসিন্দার জীবনযাত্রার অদ্ভুত সব প্রথা ও উৎসবাদি যা তিনি অত্যন্ত বাল্যকাল ('earliest child-hood') থেকে দেখে এসেছেন সেগুলি তিনি আঁকার চেষ্টা করেছেন। ভূমিকায় তিনি আরও লিখেছেন "from earliest child-hood I was a curious and interested spectator of every object and went characteristic of native opinions and manners in Bengal..... so intimately acquainted had I become with the style and character of manners, whether exhibited in the scenes of public display or in the less exposed habits of domestic life."[১৫] নিশীথরঞ্জন রায়ের মতে মিসেস বেলনো এদেশে জন্মগ্রহণ করে বড় হয়ে উঠেছেন। বেলনোর নিজের বক্তব্য প্রমাণ করে তিনি এদেশে থেকে বড় হয়েছেন কারণ তিনি লিখেছেন অত্যন্ত বাল্যকাল থেকে তিনি এদেশীয় ব্যক্তিদের আচার আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু তিনি এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এই প্রতিপাদ্য কোথাও প্রমাণিত হয়নি। ভূমিকায় কোথাও তিনি এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আভাস দেননি। এটা মনে করা যেতে পারে তিনি অন্য কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাংলাদেশে থেকে বড় হয়েছেন এ তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর অ্যালবামের ভূমিকায় বা চিত্রের বর্ণনায় তিনি এদেশীয় ব্যক্তিদের 'নেটিভ' আখ্যা দিয়েছেন। একজন দেশীয় ব্যক্তি কী করে অন্য একজন স্বদেশীয় ব্যক্তিকে 'নেটিভ' বলতে পারে? কেননা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'নেটিভ' কথাটি ভারতীয়দের প্রতি 'দিশি' নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হত।

তাঁর প্রথম অ্যালবামের ছবিগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে কখনও মনে হবে না তিনি ভারতীয় বা বাঙালি। প্রতিটি চিত্রের পাত্রপাত্রী কি মহিলা কি পুরুষ যদিও দেশীয় পোশাক পরিচ্ছদে আবৃত কোথাও 'এথনিক' বা জাতিতত্ত্বের দিক থেকে এদেশীয় বলে মনে হয় না। এই দিক থেকে তারা সকলেই ইউরোপীয়। ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের ভাস্কর্যকরণ তাঁর ছবির পাত্রপাত্রীদের মধ্যে লক্ষণীয়। তাঁর সকল নারীচরিত্রগুলি তরুণী, প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ ও যৌন আকর্ষণমূলক যা পশ্চিমি শিল্পের বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর দুটি চিত্রের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটিতে দেখা যায় একদল মুসলমান ভিক্ষুক ভিক্ষা করতে পথে বেরিয়েছে, অন্যটিতে চিত্রিত হয়েছে গঙ্গাবক্ষে একটি এদেশীয় নারীর মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায়। মুসলমান ভিক্ষুক কি নারী কি পুরুষ উভয়ের অঙ্গে পোশাকের স্বল্পতা। তারই মধ্যে ফুটে উঠেছে যৌনতা। গঙ্গার জলে মৃতদেহটি একটি তরুণীর কিন্তু সম্পূর্ণ নগ্ন এবং এই রকম একটা ভয়াবহ দৃশ্যেও যৌন আবেদন প্রকটভাবে লক্ষণীয়। একজন ভারতীয় মহিলা শিল্পী যিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে বাল্যকাল থেকে দেখে এসেছেন তিনি নিশ্চয় নগ্ন চিত্র আঁকতেন না। তাঁর অঙ্কনগুলি পশ্চিমি রীতিতে আঁকা। ক্রমান্বয়ে বর্ণবৈচিত্র প্রদান করে দেহের গঠনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং পায়ের কাছে দেহের ছায়ার সংস্থাপন। চিত্রগুলি অবশ্যই অঙ্কনবিদ্যায় শিল্পীর দক্ষতা প্রমাণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোনও ভারতীয় মহিলার পক্ষে পশ্চিমি রীতি আয়ত্ত করে এই ধরনের অঙ্কন করা কি সম্ভব? এই সময় কোনও ভারতীয় মহিলা শিল্পীর নাম শোনা যায় না। সনাতন ভারতীয় চিত্রশিল্প এই সময় পরিবর্তনশীল। মোগল পরবর্তী চিত্রকলা কোম্পানি চিত্রশৈলীতে পরিবর্তিত এবং এই কোম্পানি চিত্রশিল্পে কোনও মহিলা শিল্পীর নাম শোনা যায় না।

এমনকী তাঁর দ্বিতীয় অ্যালবাম 'সন্ধ্যা'য় একই রীতি লক্ষণীয়। এই চিত্রসম্ভারে ব্রাহ্মণকে দেখা যায় গঙ্গার জলে কিংবা পাড়ে কঠিন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে স্তব কিংবা সূর্য বন্দনা করতে। একই ইউরোপীয় 'এথনিক' বা জাতিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধুতি পরিহিত অবস্থায়। এখানে মূর্তিগুলি কঠোর নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ ও প্রচলিত

প্রথা অনুযায়ী অঙ্কিত।[১৬] মিসেস বেলনো তাঁর দ্বিতীয় অ্যালবামের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে তিনি 'ইউরোপীয় মহিলা' (European Female)। তিনি লিখেছেন 'few Brahmans would condescend to enlighten an European female on such grave topics', অর্থাৎ খুব কম সংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁর মতো ইউরোপীয় মহিলার কাছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক। বোধহয় তিনি উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাছে ব্রাহ্মণ্যবাদ শিক্ষা নেওয়ার প্রয়াসী হয়েছিলেন। এমত অবস্থায় তাঁকে বাঙালি বা ভারতীয় বলে মনে করা যথার্থ হবে না। তিনি ইউরোপীয় জাতিভুক্ত। বড় জোর বলা যেতে পারে তিনি কোনও ইউরোপিয়ান পরিবার উদ্ভূত।

এসব সত্ত্বেও মিসেস বেলনোর তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা আর এদেশের মানুষের রীতিনীতি সম্বন্ধে জানার আগ্রহ সত্যি আশ্চর্যজনক। তাঁর প্রথম অ্যালবামের বেশ কিছু ছবি এত অন্তরঙ্গভাবে আঁকা হয়েছে যে মনে হয় যেন তিনি ওই পরিবারের একজন। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি "every plate is executed from sketches after nature which I made chiefly during my pedestrian excursions in the interior of the country, on the banks of the Ganges." ভূমিকায় তিনি আরও লিখেছেন "my great source of ammusement, too after witnessing spectacles of more than ordinary interest, was to trace rudely... ...upon the walls of the garden, a representation of what I had seen." তাঁর মধ্যে দৃশ্যগুলি সযত্নে রক্ষা করে পরে অঙ্কন করেছেন। তাঁর নিজের কথায় 'so intimately acquainted had I become with the style and character of native manners, whether exhibited in the scenes of public display or in the less exposed habits of domestic life, that in after years, my recollections alone would have enabled me to sketch the various subjects."[১৭] দ্বিতীয় অ্যালবামের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "shortly after my residence in Bengal, my observation was attracted to the many interesting novelties which the habits and manners of the natives exhibited, and of a few which I attempted in a former work to offer some illustration. There remained, however various singular practices which appeared to me deserve more careful attention forming as they evidently did an essential element in the daily ritual of the Hindoos and particularly of the Brahmans."[১৮] তাঁর দ্বিতীয় অ্যালবামের বিষয়বস্তু নির্বাচন সম্বন্ধে এদেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে কেননা তিনি হিন্দুধর্মের মূল সারাংশ ও নানা রকম আচারঅনুষ্ঠান চিত্রিত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু মিসেস বেলনোর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে "to communicate a correct idea of the practices which are obvious to the daily observer, and not to enter into the recondite subject of religion itself."[১৯]

প্রথম অ্যালবামের ছবিগুলি নানা ধরনের এবং সেগুলি উনিশ শতকের প্রথম ভাগের সামাজিক বৈচিত্র্য তুলে ধরে। যদিও শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'Hindoo and European manness in Bengal' মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে নিম্নজাতীয় লোকেদের চিত্রণও দেখা যায়। আটটি চিত্রে বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রা স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে 'অভিজাত মহিলার স্নানপর্ব', 'গ্রাম্য মহিলাদের জটলা', 'কলকাতার রাস্তায় মুসলমান ভিক্ষুকদের দল', 'দোল-উৎসব', 'চড়ক', 'অন্তর্জলি যাত্রা' ইত্যাদি।

মিসেস বেলনোর স্কেচ থেকে সরাসরি পাথরের উপর খোদাই করেছেন এ. কলিন নামে জনৈক ব্যক্তি। খোদাই চিত্রে রূপান্তর করেছেন জে. জে. বেলনো, সম্ভবত তাঁর স্বামী। মোট ২৪টি ছবির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মিসেস বেলনো ছবির বিপরীত পৃষ্ঠায় ইংরাজি ও ফরাসিতে এই বর্ণনা দিয়েছেন।

শৈলীগতভাবে মিসেস বেলনো ইউরোপের Natural History Painting ঘরানার অন্তর্গত। অচেনা অজানা ভূখণ্ডে যা যা দেখেছেন সেগুলিকে যথাযথভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে তিনি সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পের প্রধান ভাবধারার অনুগামী। অঙ্কন রীতিনীতি সম্বন্ধে ছিল দৃঢ় চেতনা আর ছিল কেতাবি বা academic ধ্যানধারণা। তাঁর মূর্তিগুলি প্রসারিত ও প্রাক্-র‍্যাফালাইটদের মতো অনুভবশীল ও নিখুঁতভাবে আঁকা। অবশ্যই অঙ্কনপদ্ধতি ছিল পেশাগত। মূর্তিগুলিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থাপন করে তিনি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে পটভূমি রচনা করেছেন। ফলে মূর্তিগুলি ছবির মধ্যভাগে স্থাপিত, সম্মুখ ভাগ অপেক্ষাকৃত হালকা আর পশ্চাৎভাগ পটভূমি হিসাবে রাখা হয়েছে।

শিল্পীর দ্বিতীয় অ্যালবামটি সংস্কৃত 'ত্রিসন্ধ্যা'র একটি অংশ হিসাবে গণ্য। 'ত্রিসন্ধ্যা' অর্থাৎ দিনের মধ্যে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তে তিনি পরম ভক্ত হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে প্রাত্যহিক প্রার্থনা করতে দেখেছেন।[২০] ছবিতে ব্রাহ্মণের আচারআচরণ দেখানো হয়েছে। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে ধুতি পরিহিত অবস্থায় হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে কিছুটা জল তার মাথার উপর ছড়িয়ে দিতে দেখা যায়। নদীর পাড়ে সবুজের সমারোহ, দূরে মন্দিরের চূড়া আর জলের উপর একটি দুটি নৌকা। অন্যান্য ছবিগুলিতে দেখানো হয়েছে ব্রাহ্মণের নদীতে উৎসর্গ প্রদান, গায়ত্রী-জপ, শিব, দেবী, হনুমান, সূর্য প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাআচার অনুষ্ঠানে

ব্যবহৃত তৈজসপত্র এবং বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা যা ব্রাহ্মণের উপাসনায় দেখা যায়।

প্রথম আলবামের ছবিগুলির একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা না দিলে তাঁর চিত্রের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মোটামুটি ভাবে চব্বিশটি চিত্রকে তিনটি ভাগ করা হয় যদিও এই বিভাগ অনড় বলা যাবে না। প্রথম বারোটি ছবিতে সামাজিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। পরবর্তী চারটি ছবিকে ধর্মীয় উৎসব পর্যায়ে গণ্য করা যায়। বাকি আটটিতে ইন্দো-ইউরোপীয় বিষয়ের চিত্রণ দেখা যায়।

প্রথম ছবিটির শিরোনাম হচ্ছে 'A Hindoo Returning from Callee Ghaut' ছবিতে দেখা যায় রক্তবসন পরিহিত উত্তরীয়ধারী একটি যুবককে একটি ইমারতের পটভূমিকায় দুটি পূর্ণ সালংকারা যুবতীর সঙ্গে। যুবকটির গলায় লাল জবার মালা আর কাঁধের উপর একটি ছাগশিশুর মুণ্ডহীন ধড়। সুচারুরূপে কেশবন্ধন ও অন্তর্বাসহীন শাড়ি পরিহিতা মহিলা দুটি একটি গাছের কাছে দাঁড়িয়ে পুরুষটির সঙ্গে কথোপকথনে রত। মিসেস বেলনোর মতে যুবতী দুটি বারাঙ্গনা যারা কালী মন্দির থেকে প্রত্যাবর্তনকারী তীর্থযাত্রীদের নানাভাবে প্রলোভিত করে লুণ্ঠন করে। তাদের চাউনি ও প্ররোচনামূলক সাজপোশাকে তা পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান।

বাঙালি মহিলার স্বামীসেবার বিষয় নিয়ে দ্বিতীয় ছবিটি অঙ্কিত। শিরোনাম 'A Hindoo woman serving her husband's dinner' শাড়ী পরিহিতা একটি মহিলাকে দেখা যায় বৃহৎ গাছের তলায় আসনের উপর উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে খাবার পরিবেশন করতে। পটভূমিতে চালাঘর সমেত কলাগাছ ও অন্যান্য গাছ। গ্রামবাংলার অতি পরিচিত দৃশ্য। শিল্পী এ ছবির বর্ণনায় লিখেছেন জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কীভাবে আহার গ্রহণ করে, দিনে কতবার করে, তার স্ত্রীর আহার করার সময় ইত্যাদি। ব্রাহ্মণরা কলার পাতায় খায়, গরমের দিনে বাড়ির কাছে গাছের তলায় কিংবা পুকুরপাড়ে মৃদু মন্দ হওয়া উপভোগ করতে করতে খাওয়া। এমনকী দরিদ্র হিন্দুরা কী কী খায় তার একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন।[২২]

উনবিংশ শতাব্দীতে দরিদ্র ব্যক্তিরা কীভাবে মৃতদেহ সৎকার করত তার একটা মর্মস্পর্শী চিত্র বেলনো এঁকেছেন "A Hindu woman exposing the body of her dead infant on the bank's of the Ganges" ছবিতে। একজন শাড়ি পরিহিতা মহিলাকে গঙ্গাতীরে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখা যায়। সামনে তার মৃত সন্তান মাদুরের উপর শায়িত, পাশে ভাঙা হাঁড়িকুড়ি। মহিলার ঊর্ধ্বাঙ্গ থেকে শাড়ি খসে পড়ে বাম স্তন অনাবৃত। চুল এলোমেলো ভাবে কাঁধে ও পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। নদীর তীরে নারকেল গাছের সারি ও দূরে গঙ্গাবক্ষে একটা নৌকা। বিষাদময় করুণা উদ্রেককারী দৃশ্যের বর্ণনায় শিল্পী লিখেছেন এই ক্রন্দনরত মহিলাটি দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত যার মৃত সন্তানকে সৎকার করার অর্থ নেই। যখন কোনও দরিদ্র হিন্দু-মায়ের সন্তানের মৃত্যু হয় তখন মা সেই মৃতকে কোলে করে গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে বালির বা মাদুরের উপর শুইয়ে দিয়ে কিছুটা দূরে অপেক্ষা করে গঙ্গার ঢেউ এসে মৃতদেহটি নিয়ে যায় কি না। এই সময় সে সতর্ক থাকে যাতে শকুনি কুকুর শিয়াল দেহটিকে টেনে না নিয়ে যায়।[২৩]

'The Dying Hindoo brought to the Ganges' শিরোনামে আর একটি ছবিতে প্রায় মৃত ব্যক্তির গঙ্গালাভ দেখানো হয়েছে। এক অতিবৃদ্ধকে তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা গঙ্গার জলে নিয়ে এসেছে। তিনজন পুরুষের মধ্যে একজন প্রার্থনারত, একজন সম্ভবত পুরোহিত — মন্ত্র উচ্চারণে ব্যস্ত, তৃতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধের মাথাটি উঁচু করে ধরে আছে। বৃদ্ধের একটি হাত ধরে যুবতী মহিলাটি ক্রন্দনরত। নদীর তীরে দেখা যায় একটি কুটীর ও কলাগাছ। দৃশ্যটি অবশ্যই উনিশ শতকে হিন্দুদের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের একটি দৃষ্টান্ত। বর্ণনায় মিসেস বেলনো লিখেছেন মুমূর্ষু হিন্দুবৃদ্ধকে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব শীত প্রীষ্ম নির্বিশেষে দূরদূরান্ত থেকে নিয়ে এসে গঙ্গার জলে বসিয়ে মুখে জল ও তুলসী পাতা দেয়। যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয় ততক্ষণ তাকে ওই ভাবে রাখা হয়। এই অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথা এদেশে 'অন্তজলি যাত্রা' নামে পরিচিত।[২৪]

অমানবিক নিষ্ঠুর সংস্কারগ্রস্ত প্রথার আরও চিত্র পাওয়া যায় মিসেস বেলনোর তুলি থেকে। 'A Hindoo woman exposing her infant supposed to be under the influence of malignant spirit' ছবিটিতে দেখা যায় একটি মহিলা তার শিশুসন্তানকে একটি কুড়িতে শুইয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। হাতে লাঠি নিয়ে তাদের দৈনন্দিন গৃহকর্ম চালিয়ে যায়। কেউ তকলিতে সুতো কাটে, কেউ মশলা বাঁটে, কেউ জল আনে, কেউ পাকা চুল তোলে আবার ধূমপানও করে। এই প্রসঙ্গে মিসেস বেলনো তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন। তাঁর মতে সম্ভবত সৃষ্টির আদি থেকে সব দেশে সব আবহাওয়ায় গ্রাম-জটলার রূপ একই রকম। নিজেদের চেয়ে পরচর্চা পরনিন্দায় বেশি মুখর। পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বোধহয় এদেশে পরচর্চা বেশি আর এই সব আলোচনায় মুসলমান এবং শূদ্র সম্প্রদায়ের আধিক্য লক্ষণীয়। প্রতিবেশীদের চরিত্র হনন থেকে শুরু করে পরস্পর বিবাদমান ব্যক্তিদের মধ্যে কলহ প্রধান হয়ে ওঠে।[২৫] এই ছবিটি গ্রাম জীবনের সঙ্গে শিল্পীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথাই প্রমাণ করে।

মিসেস বেলনোর বাঙালি জীবনের সঙ্গে পরিচয় যে কত নিবিড় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'The interior of a Native Hut' চিত্রে। একটি ঘরের মধ্যে একজন যুবতীকে জ্বলন্ত উনুনের সামনে বসে থাকতে দেখা যায়। উনুনের উপর একটি মাটির হাঁড়ি বসানো। যুবতীর বক্ষোদেশ নগ্ন হলেও নিম্নাঙ্গ শাড়ি পরিহিতা, অলংকৃত এবং সুন্দর কেশসজ্জামণ্ডিত। পাশে দুটি উলঙ্গ শিশুকে একটি কুড়ির উপর ঝুঁকতে দেখা যায়। ঘরের মেঝেতে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু ছড়ানো ছিটানো, মাটির কলসি, কুলো, শীলনোড়া, বস্যার টুল, হুঁকো ইত্যাদি। যুবতীর পিছনে চরকা, বিছানাসমেত খাট, একটি বাক্সের উপর বিড়ালছানা, দেশি পাখা ইত্যাদি। এই খড়ের চাল দেওয়া ঘরটি একজন হিন্দুর যার উপার্জন কোনও মতে বেঁচে থাকার মতো। এই প্রসঙ্গে শিল্পী বাঙালি উচ্চ হিন্দু মধ্যবিত্তদের গৃহ সম্বন্ধেও লিখেছেন।[২৬]

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার গঙ্গার জল দূষণ করা হত মিসেস বেলনোর 'The corpse of a native woman floating on the Ganges' ছবিতে তা দেখা যায়। শিল্পী নৌকা করে গঙ্গা পারাপারের সময় দেখেছিলেন একটি নারীর সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ গঙ্গার জলে ভাসতে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এঁকে নিয়েছিলেন। ছবিতে দেখা যায় একটি বড় পাখি সম্ভবত শকুন ডানা মেলে মৃতদেহের উপর বসে। গঙ্গার পারে বাড়িঘর গাছপালা ও জলে একটি নৌকা দৃশ্যমান। শিল্পীর মতে এই বীভৎস দৃশ্য গঙ্গায় প্রায়ই দেখা যায়। দরিদ্র ব্যক্তিরা মৃতদেহ সৎকার করতে না পারায় জলে ফেলে দেয়। নারীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে মৃতদেহ বালির উপর জমা হয়ে থাকে। কুকুর বেড়াল শকুন শিয়াল সেগুলিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।[২৭]

গত শতকের কলকাতার রাস্তায় পেশাদার ভিখিরিদের দেখা যেত ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতে। কখনও কখনও তারা যন্ত্রসঙ্গীতসহ ভক্তিমূলক গান গাইত। যে যন্ত্র সহ তারা গান গাইত সেটা একতারা। মিসেস বেলনো সেটাকে গিটার বলেছেন। তাঁর মতে নারকোলের মালার সাহায্যে এই যন্ত্রটি তৈরি করা হত। শিল্পীর এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ একতারা সাধারণত লাউ এর খোল দিয়ে করা হত। তাঁর 'Mussilman Mendiant' ছবিতে এইরকম একদল ভিক্ষুক — তিনজন পুরুষ, একটি মহিলা ও তিনটি শিশুকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। তাদের একজনের হাতে একতারা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। এদের দেহে পোশাকের স্বল্পতা লক্ষণীয় বিশেষ করে মহিলার অঙ্গে পোশাক তার দেহকে বিশেষ আবৃত করে না।[২৮]

'Men of Low Cast skinning of dead bull' শিরোনামের চিত্রটিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীয় জাতি যথা হাড়ি, পরিয়া, শূদ্র, মুর্দোফরাস প্রভৃতির অবর্ণনীয় জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় তিনটি প্রায় উলঙ্গ পুরুষ নদীর ধারে একটি মৃত মহিষের ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত, পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে। বেশ কিছু শকুনি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিসেস বেলনো এদের সম্বন্ধে লিখেছেন এই সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তিরা বংশ পরম্পরায় দুঃস্থ জীবন কাটায়। লজ্জা

'distinguished personage', ঈশ্বরের পরেই তার স্থান বলে লোকের ধারনা। শিল্পীর মতে সে হচ্ছে "a Master, a Teacher..... who with the scythe of wisdom moweth down very branch, plucketh up very root of vice and sin." এহেন ব্যক্তি গ্রামে এলে গ্রামবাসীরা পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, তার পায়ের ধুলো মাথায় বুকে মুখে দেয়।[২৯]

অভিজাত পরিবারের মহিলাদের স্নানপর্ব ও গ্রাম্য মহিলাদের জটলাও শিল্পীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। 'Ablutions of a young Hindoo Woman of rank on the bank's of the Ganges' এবং 'The village Gossips' শিরোনামে দুটি ছবিতে এই দৃশ্য দেখা যায়। প্রথম চিত্রটিতে বাঁধানো ঘাটে একজন তরুণীকে এক পা সিঁড়িতে আর এক পা জলে দিয়ে বসা অবস্থায় লক্ষ করা যায়। মহিলার ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন, নিম্নাঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি দিয়ে ঢাকা। পাঁচজন পরিচারিকা যুবতীর অঙ্গে তৈল মর্দন, গাত্রমার্জনা, কেশ ধৌতকরণ প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত। অন্যান্যরা পুজোর জোগাড় করায় কাজে কিংবা গঙ্গায় ফুল উৎসর্গ করার কাজে রত। শিল্পী মিসেস বেলনোর মতে অভিজাত মহিলাদের নিরাবরণ হয়ে সর্বসম্মুখে স্নান করা নিষিদ্ধ। হয় গঙ্গা থেকে জল নিয়ে এসে স্নান কিংবা সম্পূর্ণ ঢাকা পাল্কি জলের ধার পর্যন্ত নিয়ে এসে স্নান করা। কোথাও কোথাও গঙ্গা বাঁকের মুখে কিংবা সরু শাখা হয়ে ধনীব্যক্তিদের বাগানে প্রবেশ করে সেখানে মহিলারা কোনওরকম লজ্জা না করে জলে নেমে পড়ে।[৩০]

গ্রাম্য-জটলা বা 'Village Gossips' চিত্রে বিভিন্ন বয়সের মহিলাদের কুটীরের দাওয়ায় বসে গল্প করতে দেখা যায়। জটলা করার সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু তাদের দৈনন্দিন গৃহকর্ম চালিয়ে যায়। কেউ তকলিতে সুতো কাটে, কেউ মশলা বাঁটে, কেউ জল আনে, কেউ পাকা চুল তোলে আবার ধূমপানও করে। এই প্রসঙ্গে মিসেস বেলনো তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন। তাঁর মতে সম্ভবত সৃষ্টির আদি থেকে সব দেশে সব আবহাওয়ায় গ্রাম-জটলার রূপ একই রকম। নিজেদের চেয়ে পরচর্চা পরনিন্দায় বেশি মুখর। পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বোধহয় এদেশে পরচর্চা বেশি আর এই সব আলোচনায় মুসলমান এবং শূদ্র সম্প্রদায়ের আধিক্য লক্ষণীয়। প্রতিবেশীদের চরিত্র হনন থেকে শুরু করে পরস্পর বিবাদমান ব্যক্তিদের মধ্যে কলহ প্রধান হয়ে ওঠে।[৩১] এই ছবিটি গ্রাম জীবনের সঙ্গে শিল্পীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথাই প্রমাণ করে।

মিসেস বেলনোর বাঙালি জীবনের সঙ্গে পরিচয় যে কত নিবিড় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'The interior of a Native Hut' চিত্রে। একটি ঘরের মধ্যে একজন যুবতীকে জ্বলন্ত উনুনের সামনে বসে থাকতে দেখা যায়। উনুনের উপর একটি মাটির হাঁড়ি বসানো। যুবতীর বক্ষোদেশ নগ্ন হলেও নিম্নাঙ্গ শাড়ি পরিহিতা, অলংকৃত এবং সুন্দর কেশসজ্জামণ্ডিত। পাশে দুটি উলঙ্গ শিশুকে একটি কুড়ির উপর ঝুঁকতে দেখা যায়। ঘরের মেঝেতে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু ছড়ানো ছিটানো, মাটির কলসি, কুলো, শীলনোড়া, বস্যার টুল, হুঁকো ইত্যাদি। যুবতীর পিছনে চরকা, বিছানাসমেত খাট, একটি বাক্সের উপর বিড়ালছানা, দেশি পাখা ইত্যাদি। এই খড়ের চাল দেওয়া ঘরটি একজন হিন্দুর যার উপার্জন কোনও মতে বেঁচে থাকার মতো। এই প্রসঙ্গে শিল্পী বাঙালি উচ্চ হিন্দু মধ্যবিত্তদের গৃহ সম্বন্ধেও লিখেছেন।[৩২]

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার গঙ্গার জল দূষণ করা হত মিসেস বেলনোর 'The corpse of a native woman floating on the Ganges' ছবিতে তা দেখা যায়। শিল্পী নৌকা করে গঙ্গা পারাপারের সময় দেখেছিলেন একটি নারীর সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ গঙ্গার জলে ভাসতে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এঁকে নিয়েছিলেন। ছবিতে দেখা যায় একটি বড় পাখি সম্ভবত শকুন ডানা মেলে মৃতদেহের উপর বসে। গঙ্গার পারে বাড়িঘর গাছপালা ও জলে একটি নৌকা দৃশ্যমান। শিল্পীর মতে এই বীভৎস দৃশ্য গঙ্গায় প্রায়ই দেখা যায়। দরিদ্র ব্যক্তিরা মৃতদেহ সৎকার করতে না পারায় জলে ফেলে দেয়। নারীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে মৃতদেহ বালির উপর জমা হয়ে থাকে। কুকুর বেড়াল শকুন শিয়াল সেগুলিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।[৩৩]

গত শতকের কলকাতার রাস্তায় পেশাদার ভিখিরিদের দেখা যেত ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতে। কখনও কখনও তারা যন্ত্রসঙ্গীতসহ ভক্তিমূলক গান গাইত। যে যন্ত্র সহ তারা গান গাইত সেটা একতারা। মিসেস বেলনো সেটাকে গিটার বলেছেন। তাঁর মতে নারকোলের মালার সাহায্যে এই যন্ত্রটি তৈরি করা হত। শিল্পীর এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ একতারা সাধারণত লাউ এর খোল দিয়ে করা হত। তাঁর 'Mussilman Mendiant' ছবিতে এইরকম একদল ভিক্ষুক — তিনজন পুরুষ, একটি মহিলা ও তিনটি শিশুকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। তাদের একজনের হাতে একতারা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। এদের দেহে পোশাকের স্বল্পতা লক্ষণীয় বিশেষ করে মহিলার অঙ্গে পোশাক তার দেহকে বিশেষ আবৃত করে না।[৩৪]

'Men of Low Cast skinning of dead bull' শিরোনামের চিত্রটিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীয় জাতি যথা হাড়ি, পরিয়া, শূদ্র, মুর্দোফরাস প্রভৃতির অবর্ণনীয় জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় তিনটি প্রায় উলঙ্গ পুরুষ নদীর ধারে একটি মৃত মহিষের ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত, পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে। বেশ কিছু শকুনি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিসেস বেলনো এদের সম্বন্ধে লিখেছেন এই সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তিরা বংশ পরম্পরায় দুঃস্থ জীবন কাটায়। লজ্জা

নিবারণ বা শীত দূর করার জন্য পরনে একখণ্ড বস্ত্রও জোটে না। কুকুর শিয়াল শকুনের সঙ্গে লড়াই করে নদীর ধারে মৃত মহিষের চামড়া দখল করে আর এই চামড়া নামমাত্র দামে চামড়া ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে। কখনও কখনও মৃত মহিষের মাংসও কেটে নিয়ে গিয়ে ক্ষুধা দূর করে।"[২]

ধর্মীয় উৎসবের ছবিগুলিতে শিল্পী বাংলা দেশে চড়ক, দোল উৎসব, গঙ্গা পুজো প্রভৃতি বিষয় চিত্রিত করেছেন। 'The Fatua or offering to the Ganges' চিত্রটিতে দেখা যায় দুটি মহিলাকে গঙ্গাপূজা করতে। দু'জনের মধ্যে একজন নতজানু হয়ে গঙ্গার জলে একটা মাটির সরা ভাসায়। দ্বিতীয়জন অনুরূপ একটা সরা ডান হাতে ধরে আছে। সরার উপর প্রদীপ ও কিছু ফলফুল রাখা আছে। নতজানু মহিলার অঙ্গে শাড়ি, কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, অন্যজনের গায়ে জামা, ব্যাপার আর স্কার্ট জাতীয় পোশাক। উভয়ের পরিপাটি করে কেশসজ্জা। পটভূমিতে কয়েকটি চালাঘর, গাছপালা ডোম মিনার সহ একটি ইমারত, সম্ভবত মসজিদ। শিল্পীর মতে গঙ্গাপূজা করা হয় আকাঙ্ক্ষাপূরণ কিংবা রোগভোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এই প্রথা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ছবির মহিলা দুটি হয় মুসলমান ধর্মাবলম্বী এবং সেটা বোঝাবার জন্য শিল্পী মসজিদের অবতারণা করেছেন।[৩]

চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন ও চড়ক হিন্দুদের একটা বড় ধর্মীয় উৎসব। একমাস ধরে কঠোর ব্রত পালনের পর সন্ন্যাসীরা এইসময় শিব আরাধনায় নিজের উপর নানারকম যন্ত্রণাদায়ক কৃচ্ছ্রসাধন করে। কলকাতায় এই চড়ক উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার রাস্তায় চড়কের দুটি শোভাযাত্রা মিসেস বেলনো এঁকেছেন। ছবি দুটির শিরোনাম দিয়েছেন 'Feast of the Churruck Poojah'।

প্রথম ছবিটিতে রং বেরঙের পোশাক ও ফুলের মালা গলায় দুই ব্যক্তিকে ঢাকের বাজনার তালে তালে নাচতে দেখা যায়। একজনের বাঁ হাতে একটা তালপাতার পাখা উঁচু করে ধরা, অন্যজন দু'হাত উপরে তুলে নাচতে থাকে কিন্তু তার পেট বরাবর ফুটো করে একটা দড়ি ঢোকানো হয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তির জিব ফুটো করে একগুচ্ছ বেত ঢোকানো হয়েছে। একটি ছোট ছেলে সমেত একদল লোক এই নাচে সামিল হয়েছে। মিসেস বেলনোর ধারণা সন্ন্যাসীদের এইভাবে দেহকে কষ্ট দেওয়ার পিছনে দেবী কালীর কাছে প্রার্থনা থাকে যাতে তারা দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়ে ওঠে কিংবা কোনও বিপদসঙ্কুল যাত্রা সফল হয়।[৪]

দ্বিতীয় চিত্রটিতেও প্রথমটির মতো সন্ন্যাসীদের উদ্দাম নৃত্য লক্ষণীয় কিন্তু এটিতে নিজের উপর অত্যাচার আরও নিষ্ঠুর আরও অমানবিক। নৃত্যরত একজনকে দেখা যায় একটা জ্যান্ত সাপ মুখে পুরে জিবের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, অন্য এক ব্যক্তি একটা লোহার বেলচার দুটো ছুঁচলো হাতল পেটের কাছে ঢুকিয়ে দিয়েছে—হাতল দুটি অনবরত বেলচার উপর আগুন রেখে গরম করা হচ্ছে। তৃতীয় একজন দুই হাতে একটা বাঁশের লাঠি ধরে আছে এবং সেই লাঠি তার জিব ফুটো করে ঢোকানো হয়েছে। চতুর্থ ব্যক্তির কৃচ্ছ্রসাধন আরও নিষ্ঠুর। দু'দিকে দু'জন দুটো মোটা দড়ি দুইদিক থেকে ধরে আছে আর এই দড়ি তার কোমরের পাশে ফুটো করে ঢোকানো হয়েছে। যারা দুদিকে দড়ি ধরে আছে তারা দড়ি দুটো সামনে ও পিছনে অনবরত টেনে চলেছে। এই নিদারুণ ক্ষতের যন্ত্রণা ও রক্তপাত অগ্রাহ্য করে সন্ন্যাসীরা উন্মাদের মতো নেচে চলেছে। পটভূমিতে গাছপালার মধ্যে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত শিবমন্দির। এই চিত্রের বর্ণনায় শিল্পী লিখেছেন "The abominable festival of Churruck Poojah... is seen annually in the streets of Calcutta about the middle or latter end of March."[৫]

হোলি বা দোল উৎসব কৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে এ দেশে সর্বত্র মহাসমারোহে পালন করা হয়। মিসেস বেলনোর শিল্পী-চোখে এই উৎসবের একটা ছবি ধরা পড়েছে। 'The Hooly Festival' ছবিটিতে কলকাতার রাস্তায় একদল রং আবির মাখা লোককে খোল করতাল সহ নাচতে দেখা যায়। পটভূমিতে একটি বাড়ির প্রবেশদ্বার দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত শহর কলকাতা বোঝানোর জন্য। চিত্রের বর্ণনায় মিসেস বেলনোর মন্তব্য "fifteen days before the full moon, the Hindoos assemble in the night to sing and dance, and in the day they wander about streets throwing red powder at the passenger and on one another" তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি এই নৃত্যরত ব্যক্তিরা সকলেই পাক্কিবাহক।[৬]

আগেই বলা হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ছবিগুলি প্রধানত কলকাতার পটভূমিতে দেশীয় ব্যক্তি ও সাহেব মেমসাহেবদের পরস্পর দেওয়া নেওয়ার উপর অঙ্কিত। প্রথম ছবিটির শিরোনাম 'Cloth and Silk Marchant'। একটি সুসজ্জিত ঘরে সুন্দর হাতলওয়ালা চেয়ারে উপবিষ্ট সাহেব একজন ভারতীয় ফেরিওয়ালার সঙ্গে দরদস্তুরে ব্যস্ত। পাশে একজন মেমসাহেব একটা কাপড় নিয়ে দেখছে। একজন পরিচারক বিরাট পাখা নিয়ে বাতাস করছে আর সাহেব গড়গড়ায় তামাক সেবন করছেন। চিত্রের বর্ণনায় শিল্পী ভারতীয় বস্ত্র সম্বন্ধে প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে ঢাকা ও শান্তিপুরের তৈরি মসলিনের। তাঁর মতে মসলিন কাপড় ঘাসের উপর বিছানো থাকলে তার উপর শিশির পড়লে বোঝাই যায় না। এদেশের মোটা কাপড়ও ইউরোপের ক্যালিকোর চেয়ে অনেক ভাল। সাহেব যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে বাস্ত সে কলকাতার বড়বাজারের এক বস্ত্র ব্যবসায়ী। ইউরোপীয়দের বাড়িতে কাপড় ফেরি করে বেড়ায়।[৭]

'Pykary and Pedlary' ছবিতে একজন ভারতীয় ফেরিওয়ালাকে দেখা যায় একজন মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। লোকটি হাত জোড় করে মেমসাহেবকে কিছু বোঝাচ্ছে আর মহিলাটি তার সঙ্গে তর্ক করে যাচ্ছে। একটি সুসজ্জিত ঘরে সুন্দর পোশাকে ভূষিত মেমসাহেব আর তার পিছনে কাঁচি হাতে এক ব্যক্তি। পর্দার আড়ালে আর একজন মহিলা সম্ভবত পরিচারিকা। মিসেস বেলনো লিখেছেন এই ফেরিওয়ালা কলকাতার চীনাবাজারের একজন ধনী হিন্দু ব্যবসায়ী যারা মুটে ভাড়া করে বিরাট বাক্স করে বিভিন্ন অলংকার, রত্নপাথর, বিদেশি সাটিন ও সিল্ক, মসলিন প্রভৃতি ইউরোপীয়দের বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়ায় এবং ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বিক্রি করার চেষ্টা করে। এই চিত্রে মেমসাহেব কিছু কিনে তার আয়ার জন্য দস্তরি চাইছে। ব্যবসায়ী তাতে আপত্তি জানাচ্ছে। মিসেস বেলনোর মতে দস্তরি এক ধরনের পাওনা যা ক্রেতার প্রাপ্য। এই প্রাপ্য যে শুধু বিক্রেতার অসন্তোষের কারণ তাই নয় ক্রেতারও বিরক্তি ঘটায়। কারণ এই দস্তরি সাহেবদের বাড়িতে চাকরবাকরদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের কারণ হয়ে ওঠে।[৮]

এদেশে কোম্পানি আমলে সাহেব আধিকারিকদের জীবন নিয়ে একটা ছবি এঁকেছেন মিসেস বেলনো। 'Civilian going out' শিরোনামে ছবিটিতে দেখা যায় একজন সাহেব সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হয়ে অফিস বেরনোর পথে একজন ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলছে। তার মাথায় ছাতা ধরে আছে একজন পরিচারক। পটভূমিতে একটি বাড়ির প্রবেশদ্বারের সম্মুখে কিছু লোকের সমাবেশ ও বাহক সমেত দুটো পাল্কি। শিল্পী লিখেছেন সাহেবটি কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক যিনি তাঁর 'বাবু'র সঙ্গে কিছু হিসাবপত্তর নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। উচ্চিষ্যাবাসী এই বাবুটি একজন ধনী ব্যক্তি যিনি কোম্পানির কর্মচারী, আর্টানি প্রভৃতিকে চড়া সুদে টাকা ধার দেন।[৯]

কলকাতার রাস্তায় বাঁদরের খেলা আজও জনপ্রিয় এবং আবালবৃদ্ধবনিতা এই খেলা দেখে মজা পায়। উনিশ শতকে এই খেলা শুধু দেশীয়দের না বিদেশিদের আকৃষ্ট করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় বেলনোর 'A Bundar Wallah' ছবিতে। চিত্রে দেখা যায় এক ব্যক্তি দুই হাত দিয়ে ডমরু আকারের কিছু কাঠের তৈরি বস্তু একটার পর একটা সাজিয়ে দিচ্ছে। এর শীর্ষে উঠে একটা ছাগল তার চার পা দিয়ে সমতা রক্ষা করছে। লোকটির পাশে দুটি বাঁদর এই খেলা দেখছে। একজন ভারতীয় আয়ার কোলে একটি ও পাশে আর একটি ইউরোপীয় বালিকা চক্ষু বিস্ফারিত করে এই খেলা দেখছে। মিসেস বেলনোর মতে এই উত্তর ভারতীয় ব্যক্তি নানারকম কৌশল সহকারে বাঁদর ও ছাগলের খেলা দেখিয়ে বেড়ায় কিন্তু এদের আয় অত্যন্ত নগণ্য।[১০]

'Ba-yee or Dancing Boys' হচ্ছে এক ধরনের বালক যারা অল্প পয়সায় নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশীয় হিন্দু, মুসলমান ও এদেশীয় পর্তুগিজ (Black Portugeuse)-দের বিয়ে সাদি উপলক্ষে নাচগান করত। অন্যদিকে হিন্দুস্থানি বাইজি ছাড়া উত্তর ভারতীয় নামজাদা মুসলমান মহিলা গায়িকা-নর্তকী যারা অর্থের বিনিময়ে কলকাতার অভিজাত ব্যক্তিদের গৃহে দুর্গাপুজা, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে নাচগান করত। এইসব আসরে দেশীয় ব্যক্তিদের আমন্ত্রণে অনেক সাহেব মেম উৎসবে যোগ দিত। মিসেস বেলনো এদের নিয়ে কয়েকটি ছবি এঁকেছেন।

প্রথম ছবিটি 'Ba-yee (or Dancing Boy's)। নাচের আসরে দুটি সুসজ্জিত বালককে সঙ্গীতের তালে তালে নাচতে দেখা যায়। একদল বাজনাদার বাজিয়ে চলেছে। দুটি মেমসাহেব ও তিনজন সাহেব আগ্রহের সঙ্গে এই নাচ উপভোগ করছে। শিল্পীর মতে এদের নাচের ভঙ্গিমাও বেশ ছন্দোময়।[১১]

বাইজিদের নাচগানের দৃশ্য দেখা যায় 'Three Dancing girls of Hindoostan' শিরোনামের চিত্রটিতে। জাঁকজমকপূর্ণ রং বেরঙের মসলিন ও সাটিনের পোশাক পরে তিনজন বাইজিকে নাচতে দেখা যায়। নাচের মধ্যে নানারকমের মুদ্রা, ভঙ্গি ও গতিশীলতা লক্ষণীয়। নাচ সম্বন্ধে মিসেস বেলনো মন্তব্য করেছেন "Their steps are slow, their motions degnified and their figures graceful, generally indicative of different passions described in the song." ইউরোপীয়দের কাছে হয়ত এই নাচগান নীরস ও একঘেয়ে মনে হতে পারে কিন্তু এদেশীয়রা সম্পূর্ণ উপভোগ করত।[১২]

বাইজি নাচের আরও দুটি দৃশ্য দেখা যায় 'A Nautch' শিরোনামের দুটি ছবিতে। প্রথম ছবিটিতে অনুরূপ সজ্জিত ঘর, ঝাড়লণ্ঠন আর দামি কার্পেট দিয়ে সাজানো। একদল ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহেব মেম সুন্দর পোশাকে অলংকারে ভূষিত হয়ে বাইজির নাচ দেখছে। বাইজিকে সঙ্গত করছে একদল বাজনাদার। দুর্গাপুজা উপলক্ষে কলকাতার কোনও ধনীর গৃহে এই উৎসবমুখর জমায়েত। বর্ণনায় শিল্পী লিখেছেন "Three days previous to the throwing the image of their goddess Doorga, into the river ganges, the rich Hindoo Babooes and Rajahs given most splendid fets at their magnificant palaces in Calcutta..... invitation was sent to the ladies and gentlemen of the first circles in the settlement." প্রত্যেক ব্যক্তি এই স্বপ্নময় পরিবেশে এসে মোহিত হয়ে যায়, "dazzled by a blaze of lights from splendid lustres, triple wall shades, Chandle brass etc..... and the whole scene before him is but a fairy vision."[১৩]

দ্বিতীয় দৃশ্যটিও একটি নাচগানের আসর যেখানে একজন বাইজি জমকালো পোশাক পরে নতজানু হয়ে বসে গান করে

চলেছে এবং দুটি মেম সাহেব ও তিনটি পুরুষ সেই গান শুনছে। গান করার সময় গাইয়েদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ডান হাত কানের কাছে রাখা। একদল বাজনাদার বাজিয়ে চলেছে। এই চিত্র সম্বন্ধে শিল্পী লিখেছেন, আসল গানের আসর শুরু হওয়ার আগে বাইজি বিদেশি অতিথিদের বকশিসের বিনিময়ে বিশেষভাবে গান শোনায়।[৪৪]

মিসেস বেলনো দেশীয়ভাব বজায় রেখে আন্তরিকতার সঙ্গে এদেশের মানুষের সমাজজীবন এঁকেছিলেন। এতৎ সত্ত্বেও একথা বলা যাবে না তাঁর ছবি সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পীদের মতো ঔপনিবেশিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত। শিল্পের দিক থেকে এগুলিকে ঔপনিবেশিক শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাঁর ছবির মূল্যায়ন সমকালীন অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে করা উচিত। সেদিক থেকে চিত্রগুলি অবশ্যই ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। কারণ এই সময়ে ভারতীয় বা বাঙালির সমাজজীবনের চিত্র বড় একটা পাওয়া যায় না। এদেশের শিল্পীদের আঁকা ছবি বিরল বললেই হয়। এগুলি অবশ্যই ভারতীয় চিত্র নয় কিন্তু এমন এক চিত্রসম্ভার যা ভারতে বসে আঁকা এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে। ১৮৩২ সালের মার্চ মাসে মিসেস বেলনোর পাঠানো প্রথম অ্যালবামের একটা কপি পেয়ে রাজা রামমোহন রায় শিল্পীকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, "that they (the pictures) are true representation of nature so much so, that they have served to bring to my recollections, the real scenes alluded to of that unhappy country."

(Letter of Raja Rammohan Roy to Mrs. S.C. Belnos, dated March 5, 1832)

উল্লেখপঞ্জি :

১. ডি. বসু, 'মধুসূদন গুপ্ত — এক বিস্মৃত বিজ্ঞান-পথিক', নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত: 'এক্ষণ', শীত-গ্রীষ্ম, সন ১৩৯২–৯৩, পৃ. ৩১, ৩২, ফ্রন্টিস্‌পিস ছবি।
২. রীদ্ধি-ইণ্ডিয়া প্রকাশিত এস.সি. বেলনোর অ্যালবাম '24 Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal', পুনর্মুদ্রিত, ১৯৭৯, সম্পাদক নিশীথরঞ্জন রায় কর্তৃক ভূমিকা, পৃঃ III.
৩. নিশীথরঞ্জন রায় কর্তৃক ভূমিকায় উল্লেখিত 'Calcutta Gazette', এপ্রিল ২৯, ১৮১৩, রীদ্ধি-ইণ্ডিয়া প্রকাশিত বেলনো অ্যালবাম, পৃ. III.
৪. ব্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড, সন ১৩৭৭, পৃ. ৪০৮
৫. রীদ্ধি-ইণ্ডিয়া প্রকাশিত অ্যালবামের ভূমিকা, পৃ. IV
৬. তদেব, পৃ. IV
৭. তদেব, পৃ. V
৮. তদেব, পৃ. V
৯. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎ-বঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, সন ১৩৪১, পৃ. ৪৪৭
১০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'শতবর্ষের পূর্বকার বাঙ্গালীর জীবনের ছবি', প্রবাসী, কার্তিক, সন ১৩৩৯
১১. রীদ্ধি-ইণ্ডিয়া প্রকাশিত অ্যালবামের ভূমিকা, পৃ. II, III
১২. তদেব, পৃ. II
১৩. অঞ্জলি সেনগুপ্ত, Cameos of Twelve Women in India, পৃ. ১২২
১৪. মিসেস এস.সি. বেলনো, প্রথম অ্যালবামের ভূমিকা
১৫. তদেব
১৬. রীদ্ধি-ইণ্ডিয়া প্রকাশিত অ্যালবাম, পৃ. V
১৭. মিসেস এস.সি. বেলনো, প্রথম অ্যালবামের ভূমিকা
১৮. এস.সি. বেলনো, দ্বিতীয় অ্যালবাম 'সন্ধ্যা'-এর ভূমিকা
১৯. তদেব ২০. তদেব
২১. প্রথম অ্যালবাম, বেলনো, প্রথম ছবির (Plate I) বর্ণনা
২২. তদেব, দ্বিতীয় ছবির (Plate II) বর্ণনা
২৩. তদেব, তৃতীয় ছবির (Plate III) বর্ণনা
২৪. তদেব, চতুর্থ ছবির (Plate IV) বর্ণনা
২৫. তদেব, নবম ছবির (Plate IX) বর্ণনা
২৬. তদেব, দশম ছবির (Plate X) বর্ণনা
২৭. তদেব, অষ্টম ছবির (Plate VIII) বর্ণনা
২৮. তদেব, দ্বাদশ ছবির (Plate XII) বর্ণনা
২৯. তদেব, চতুর্দশ ছবির (Plate XIV) বর্ণনা
৩০. তদেব, ঊনবিংশতি ছবির (Plate XIX) বর্ণনা
৩১. তদেব, দ্বিবিংশতি ছবির (Plate XXII) বর্ণনা
৩২. তদেব, চর্তুবিংশতি ছবির (Plate XXIV) বর্ণনা
৩৩. তদেব, পঞ্চম ছবির (Plate V) বর্ণনা
৩৪. তদেব, ষষ্ঠ ছবির (Plate VI) বর্ণনা
৩৫. তদেব, সপ্তম ছবির (Plate VII) বর্ণনা
৩৬. তদেব, একাদশ ছবির (Plate XI) বর্ণনা
৩৭. তদেব, ত্রয়োদশ ছবির (Plate XIII) বর্ণনা
৩৮. তদেব, একবিংশতি ছবির (Plate XXI) বর্ণনা
৩৯. তদেব, ত্রয়োবিংশতি ছবির (Plate XXIII) বর্ণনা
৪০. তদেব, বিংশতি ছবির (Plate XX) বর্ণনা
৪১. তদেব, পঞ্চদশ ছবির (Plate XV) বর্ণনা
৪২. তদেব, ষোড়শ ছবির (Plate XVI) বর্ণনা
৪৩. তদেব, সপ্তদশ ছবির (Plate XVII) বর্ণনা
৪৪. তদেব, অষ্টাদশ ছবির (Plate XVIII) বর্ণনা।

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

আর্সেনিক খেয়ে বেঁচে আছি

তিমির বসু

পশ্চিমবঙ্গের নাম বঙ্গ হবে না অন্য কিছু — এসব নিয়ে ইদানীং আর কারও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বাঙালি জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হতে চলেছে এমন এক পরিবেশগত কারণে তাই নিয়েই বা ক'জনের মাথা ব্যথা রয়েছে!

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয় — সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমি অর্থাৎ বাংলাদেশও এমন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার যার বিভীষিকাময় পরিণতি চিন্তা করলেও শিউরে উঠতে হয়। অথচ এপার বাংলা ওপার বাংলা সর্বত্রই সরকারিভাবে এক আশ্চর্যজনক নীরবতা পালন করা হচ্ছে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে বসবাসকারী প্রায় সমস্ত মানুষই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কম বেশি আর্সেনিক যুক্ত জল খেয়ে যাচ্ছে। আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় পঙ্গু কোনও মৃত্যুপথযাত্রীর সংবাদ যখন কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় কেবলমাত্র তখনই কিছু হৈ চৈ হয়। তারপর আবার শ্মশানের নীরবতা। জনসচেতনতা বাড়ানো দূরে থাকুক, এমনকী পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী সরকারও মনে হয় আর্সেনিক দূষণকে কিছুটা খাটো করে দেখাতেই উৎসাহী। ভাবখানা এই, ভূ-তাত্ত্বিক কারণে যে আর্সেনিক সমস্যা দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে তাদের কিছু করণীয় নেই — ভাগ্যের ওপর ভরসা রেখে সরকার তার দায়িত্ব লঘু করতে চাইছে। পরিবেশ নিয়ে মার্কসবাদীরা অবশ্য কোনও কালেই উৎসাহ দেখায়নি, আর আজও এ ব্যাপারে তারা নীরব থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে তারা পরিবেশ ধ্বংসকারীদের দল ভারী করছে। পরিবেশ নিয়ে এখনও পর্যন্ত এদেশে যত বড় আন্দোলন হয়েছে ও হচ্ছে, সেখানে কোনও ধরনের মার্কসবাদীদেরই খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাছে সমস্যার ভয়াবহতা তথা ব্যাপকতা এবং সরকারের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে পড়ে সে জন্য আর্সেনিক দূষণ ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বিগত দশ বৎসরেরও বেশি সময় ধরে আর্সেনিক দূষণ নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে যে সমস্ত তথ্য এসেছে, তার ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত কোনও সুসংবদ্ধ প্রতিবেদন তৈরি হয়নি। সরকার আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানীয় জলের কী ব্যবস্থা করছেন সে সম্পর্কেও সাধারণ মানুষ রীতিমত অন্ধকারে। বলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলা — উঃ ২৪ পরগণা, দঃ ২৪ পরগণা, কলকাতা, হাওড়ার কিছু অংশ, বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানা এলাকা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা — দারুণভাবে আর্সেনিক আক্রান্ত। অথচ এখনও পর্যন্ত আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত কোনও বিশ্বাসযোগ্য মানচিত্র পাওয়া যায় না। বিশ্বব্যাঙ্কের কল্যাণে বাংলাদেশের একটা আর্সেনিক মানচিত্র অন্তত রয়েছে যার সাহায্যে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কয়েক কোটি বাংলাদেশি রোজ আর্সেনিকদুষ্ট জল খেতে বাধ্য হচ্ছে। মালদা জেলার কালিয়াচক অঞ্চলের এক গ্রামে বছরে নলকূপ থেকে ১৪৮ কিলো আর্সেনিক উঠে আসছে বলে খবর রয়েছে। যারা দিনের পর দিন এই আর্সেনিক জল খেয়ে যাচ্ছে, তারা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম পঙ্গু হতে বাধ্য। ডাঃ শেলি সাহা যখন ১৯৮২ সালে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগির চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রথম ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেন, তখন তাঁর কথায় তেমন কেউ গুরুত্বই দেয়নি। ইউনিসেফ বাংলাদেশে কয়েক মিলিয়ন নলকূপ বসিয়েছে পানীয় জলের জন্য। ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশের সরকারি মহল দীর্ঘদিন জানতেই পারেনি বহু ঘটা করে তারা যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রচার করে যাচ্ছে, সেই জল আদপেই নিরাপদ নয়। এই ইউনিসেফ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলেও বহু নলকূপ বসিয়েছে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য। এই জল রাসায়নিকভাবে পরীক্ষিত হয় কি না, তার খবর কেউ রাখে না। ঘটনা হচ্ছে, ১৯৯৪ সালের আগে আর্সেনিক দূষিত ভূজল নিয়ে তেমন কোনও ফলপ্রসূ আলোচনাই হয়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগের কাজকর্মের জন্য এখন কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে বহু আলোচনাচক্র নাকি অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে অনেকে অনেক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাও দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কর্মশালা মানেই অর্থ, প্রচার এবং সামাজিক প্রতিপত্তি।

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ্ ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের ছ'টি জেলায় জলে আর্সেনিক সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষা করেছিল। এটাই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রথম প্রকল্প। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার মতে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ। উত্তর চব্বিশ পরগণার গাইঘাটায় শতকরা ৯০ ভাগ নলকূপের জল বিষাক্ত এবং পানের অযোগ্য। গাইঘাটা থেকে আর্সেনিক-আক্রান্ত রোগির মৃত্যুর খবরও রয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের এই জল খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। উত্তর চব্বিশ পরগণার অন্যান্য অঞ্চলে যে সমস্ত নলকূপের জল পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের জলই পানের অযোগ্য কিন্তু এখানেও এই আর্সেনিক জল খাওয়া ছাড়া সাধারণ মানুষ নিরুপায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর ও সোনারপুর অঞ্চলে আর্সেনিকদূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে অথচ এইসব এলাকায় ক্রমাগত জনবসতি বাড়ছে। যারা বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পে ফ্ল্যাট কিনে ভাবছেন হাতে স্বর্গ পেলেন তারা জানতেও পারছেন না কী ধরনের বিষ প্রতিনিয়ত পান করে চলেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় উক্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা যে ৫৮টি নলকূপের জল পরীক্ষা করেছিল তার শতকরা ৬৮ ভাগের জলেই বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে। নদীয়া এবং মালদা জেলার অবস্থাও শোচনীয়। মন্বন্তরে বাঙালি মরেনি। মারি নিয়ে ঘর করবার অভ্যাস রয়েছে। আর্সেনিক নিয়ে ঘর করবার অভ্যাস কোনও কালে ছিল না। দুর্ভিক্ষ, মহামারি যে সর্বনাশ করতে পারেনি, একমাত্র আর্সেনিকই সেই ক্ষতি সাধন করবে। এমনকী খোদ কলকাতায় এবং বলা ভাল বৃহত্তর কলকাতার জলও আর্সেনিক দূষণ মুক্ত নয়। নতুন কলকাতার জন্য নির্বাচিত স্থান রাজারহাটের জলে বিপদসীমার ওপরে আর্সেনিক রয়েছে বলে খবর বেরিয়েছিল, কিন্তু তারপরেই ব্যাপারটা নিয়ে আর কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেনি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ধারিত আর্সেনিকের পরিমাণ প্রতি লিটার জলে ০.০১ মিলিগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। কোনও দৈব কারণে ভারতে এবং বাংলাদেশে এর পরিমাপ নির্ধারিত রয়েছে লিটার প্রতি ০.০৫ মিলিগ্রাম। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা — সর্বত্রই আর্সেনিকের পরিমাণ লিটার প্রতি ০.০৫ মিলিগ্রামের বেশি, কোথাও এর পরিমাণ ০.৮৫ মিলিগ্রাম। বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে ভূজলে আর্সেনিকের মাত্রা লিটার প্রতি ০.১–০.৬ মিলিগ্রাম। প্রসঙ্গত ব্রিটিশরা বোকা ছিল না। টালা-পলতা প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গার জল পরিশ্রুত করে তারা কলকাতার নাগরিকদের জন্য যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে হাজার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সেটাই যথেষ্ট নিরাপদ কর্মসূচি। সল্টলেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা থাকেন, তাদের জন্য সরকার এই টালা-পলতার জলের ব্যবস্থা করছেন কিন্তু বৃহত্তর কলকাতার ব্যাপক জন-জীবনের কী হবে?

কিংবা আর্সেনিক কবলিত বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত এলাকার? যথেচ্ছ নলকূপ, বিশেষ করে গভীর নলকূপ বসিয়ে যেভাবে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার নিঃশেষ করা হচ্ছে তার ফলে বৃহত্তর কলকাতার মাটির নীচে কী ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে এবং বেশির ভাগ মানুষ কী পরিমাণে আর্সেনিক খেতে বাধ্য হচ্ছে তার সঠিক পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি। কলকাতা পৌরসভা সম্প্রতি এক ফতোয়া জারি করে জানিয়েছে যে আবাসন প্রকল্পের জন্য নতুন কোনও গভীর নলকূপের অনুমতি দেওয়া হবে না। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে অত্যধিক জল তুলে নেওয়ার ফলে যে কোনও মুহূর্তে ধ্বস নামতে পারে। যাদবপুর, যোধপুর পার্ক প্রভৃতি অঞ্চলকে বিশেষ বিপদজনক এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিলজলা, তপসিয়া প্রভৃতি এলাকার গভীর নলকূপ খুব শিগগিরই নাকি অকেজো করে দেওয়া হবে। কারণ এ সব অঞ্চলে অচিরেই টালা-পলতার জল পৌঁছে যাবে। জনৈক ভূ-তাত্ত্বিকের মতে এসব অঞ্চলে ধ্বস নামার কোনও সম্ভাবনা নেই। নিন্দুকেরা অবশ্য বলাবলি করছে আসলে জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলেই এই আগাম সতর্কতা। সবার জন্য টালা-পলতার জলের ব্যবস্থা করাই উচিত, কিন্তু তার আশু সম্ভাবনা নেই। কর্তৃপক্ষ তিক্ত সত্য স্বীকার করতে নারাজ পাছে তাদের চূড়ান্ত গাফিলতি ফাঁস হয়ে যায়। গাফিলতি বলাই যথেষ্ট নয়, মানুষের বিরুদ্ধে এটা একটা জঘন্য অপরাধ। আর্সেনিকজনিত মৃত্যু মাঝে মাঝেই খবর হয়। কিন্তু তারপর আবার সব চুপচাপ।

কিছু ভূতাত্ত্বিকের মতে গঙ্গা রাজমহল পাহাড় থেকে যে পলি বহন করে এনেছে — সমস্ত গাঙ্গেয় সমভূমি অর্থাৎ বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা এই পলিদ্বারা গঠিত — যেখানে আর্সেনিক থাকতে বাধ্য। প্রাকৃতিক নিয়মেই এটা ঘটেছে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবার

ফলেই বিপত্তি ঘটেছে। আর এটা ঘটছে কেবলমাত্র খাবার জলের নলকূপ বসানোর জন্য নয়। অধিক ফলনশীল বীজ, ব্যাপকহারে সার ও কীটনাশক ইত্যাদির ফলে। সেচের জন্য এখন যেভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া হচ্ছে তার ফলে কীভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে সেসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার অবসর কারও নেই। জল তুলে নেওয়ার পর শূন্য জায়গায় বাতাস ঢুকছে, ঢুকছে অক্সিজেন এবং আর্সেনিক যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে। খাদ-শৃঙ্খলে বিভিন্নভাবে আর্সেনিক ঢুকছে, অথচ আর্সেনিক যুক্ত কীটনাশকের ব্যবহার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি অঙ্ক বোঝে, আর্সেনিক বোঝে না, তাদের বোঝার দরকার নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাচনে এর প্রভাব পড়ছে। সমগ্র কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বর্তমানে এমন ভাবে সার আর কীটনাশক নির্ভরশীল যে, এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসবার কোনও উপায় নেই। একটা সময় বামপন্থীরা ভূমি-সংস্কার নিয়ে হৈ চৈ করত, এখনও মাঝে মাঝে আমূল ভূমি-সংস্কার নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলে না এমন নয়। কিন্তু ভূমি-সংস্কার বলতে তারা বোঝে কেবলমাত্র কৃষকের হাতে কিছু খাস জমি তুলে দেওয়া। যদিও এর ফলে ভূমি-সম্পদের ক্ষেত্রে মৌলিক কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। আজকের পরিস্থিতিতে বহুজাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে কোনও ধরনের সদর্থক ভূমি-সংস্কার হতেই পারে না। পুরনো কায়দায় চাষবাসে উৎপাদন হ্রাস কম হত, কিন্তু কৃষিজমির বিপজ্জনক ক্ষয় হত না। আর্সেনিক যুক্ত কীটনাশক কিংবা অতি মাত্রায় অজৈব সারের ব্যবহারের বিরুদ্ধেই কৃষক সংগঠনগুলোর আন্দোলন করা উচিত প্রকৃত ভূমি-সংস্কারের লক্ষ্যে। চিরাচরিত বীজ ফিরিয়ে আনার দাবিও এখন ভূমি-সংস্কারের অঙ্গ হওয়া উচিত। জমিদারেরা দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার কৃষকের যে সর্বনাশ করতে পারেনি, বহুজাতিকপুঁজি নিয়ন্ত্রিত কৃষিঅর্থনীতি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা করতে পেরেছে।

সবুজ বিপ্লব ইতিমধ্যেই বাদামি হয়ে গেছে। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে নিবিড়ভাবে বোরো চাষের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের ব্যাপক ব্যবহার হয়ে আসছে বিগত প্রায় ৩০ বছর ধরে। এর উপরে আছে যথেচ্ছ নগরায়ণ। প্রতিবছরই কিছু কিছু পঞ্চায়েত এলাকা পুরসভায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলে পুরসভাকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতেই হচ্ছে। সহজ উপায় হচ্ছে গভীর নলকূপের সাহায্যে দিনের মধ্যেই কয়েকবার জল সরবরাহ করা। কলকাতা ইতিমধ্যেই বাড়তে বাড়তে প্রায় সুন্দরবন অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। রাজারহাটে 'মেগাসিটি' প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বৃহত্তর কলকাতার এক বিপুল অংশের মানুষই প্রতিনিয়ত আর্সেনিক দূষিত জল খেতে বাধ্য হবে যদি না গঙ্গার জল শোধন করে বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়।

সরকারি তরফে আর্সেনিক দূষণ থামা চাপা দেবার অন্যতম প্রধান কারণ এ রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ হওয়ার ভয়। নলকূপের বিকল্প জল সরবরাহ ব্যবস্থা কার্যকর করতে হলে যে-পরিমাণ অর্থ ও কারিগরি দক্ষতা থাকা দরকার তার কোনওটাই এখানে নেই। অবশ্য এখন বিদেশি সাহায্য না পেলে রাস্তাঘাট কিংবা উড়ালপুল জাতীয় প্রকল্পও রূপায়িত হয় না। ব্রিটিশরা লুণ্ঠন চালিয়েও কিছু রাস্তাঘাট তৈরি করতে পেরেছিল বাইরের সাহায্য ছাড়াই। লটারির টাকায় কলকাতার অনেক রাস্তা তৈরি হয়েছে বলে শোনা যায়। আর এখন নাকি লটারি বিক্রি করে সরকার রাজকর্মচারীদের মাইনে দেন।

মূলত ভূ-তাত্ত্বিক কারণেই আর্সেনিক দূষণ ব্যাপক আকার নিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু আর্সেনিক যুক্ত কীটনাশকেরও একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত কীটনাশক উৎপাদনকারী বহুজাতিক পুঁজি। আর্সেনিক যুক্ত কীটনাশকের ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত, বন্ধ হওয়া উচিত যথেচ্ছ বোরো চাষ, বন্ধ হওয়া উচিত সার নির্ভর অতি উৎপাদনশীল বীজের ব্যবহার। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার লোক পাওয়া দুষ্কর। এমনকী অতি বামেরাও এসব 'তুচ্ছ' ব্যাপার নিয়ে ভাবছে না। আর সরকারি মার্কসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যদিও মার্কসের 'পুঁজি' তাদের আর তেমন আগ্রহ করে না।

আর্সেনিক-দূষণ নিয়ে সবাই এখনও পর্যন্ত কী রকম ভাসা ভাসা কথাবার্তা বলে চলেছেন। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের ব্যাপার। অথচ যুক্তকালীন অবস্থার ভিত্তিতে এর মোকাবিলা করা উচিত। কেবলমাত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কর্মশালা সংগঠিত করে এর মোকাবিলা সম্ভব নয়। এর ফলে হয়ত বিদেশ থেকে কিছু অনুদান আসবে যার সাহায্যে আরও কিছু সেমিনার করা যাবে। শোনা যাচ্ছে আর্সেনিক মুক্ত করবার জন্যে ফিল্টার (অথবা ট্যাবলেট জাতীয় কিছু) বাজারে আসার মুখে। এই ফিল্টার কতটা জল থেকে কত ভাগ আর্সেনিক নির্মূল করতে পারবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আর্সেনিক দূষণের ভয়াবহ চিত্রটা একবার তুলে ধরতে পারলে মানুষ পাগলের মতো এই ফিল্টার কিনতে যাবে। গ্রামাঞ্চলে যাদের সামর্থ নেই তারাও ধার দেনা করে এই ফিল্টার কিনতে বাধ্য হবে। সরকার নাকি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে নদী-নালার জল পরিশ্রুত করে পানীয় জল সরবরাহ করবার কথা ভাবছে আর এর জন্য বিদেশ থেকে কিছু 'সাহায্য' পাওয়া গেছে বলে কানাঘুষো চলছে। কোথাও কিছু কিছু কাজও হয়েছে।

যদিও এই ব্যবস্থায় আর্সেনিক মুক্ত জল পাওয়া যাবে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের হাজা-মজা নদী নালার উপর ভিত্তি করে সর্বত্র সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পানীয় জলের চাহিদা মেটানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। কলকাতা পৌর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে অপ্রতুল পানীয় জলের জন্য প্রায়ই বিক্ষোভ হয়। এ ছাড়া এই যে দ্রুত এবং ব্যাপক শিল্পায়নের কথা বলা হচ্ছে, তার জন্যও প্রচুর জলের প্রয়োজন। কলকাতার খুব কাছেই বাবাসত, হাওড়া, গাইঘাটা কিংবা বনগা অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ জলে প্রচুর আর্সেনিক রয়েছে। আর্সেনিকআক্রান্ত কিছু মানুষ এ সব অঞ্চলে মারাও গেছে। বনগাঁ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের যশোর জেলা। এই জেলার সারসা থানা এলাকা মারাত্মকভাবে আর্সেনিক আক্রান্ত। ইতিমধ্যেই এ অঞ্চলে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও অনেকে মৃত্যু পথযাত্রী। যশোর জেলারই অভয়নগর এবং কেশপুর থানার শতকরা ৯৯ ভাগ নলকূপ আর্সেনিকদূষিত। ঢাকার গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা যশোর জেলারই নোয়াপাড়া শিল্পাঞ্চলের ৭৫০ টি নলকূপের জল পরীক্ষা করে জানতে পেরেছিল ওদের মধ্যে ৬৩০টি নলকূপের জলেই মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে। প্রায় ২০ হাজার লোকের বাস এই শিল্প উপনগরীতে ভয়াবহ পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহ কীটাতারের বেড়া মানছে না। সারসা-বনগাঁ-গাইঘাটা সর্বত্র একই স্তরের ভূ-জল। প্রকৃতির মার থেকে কারও নিস্তার নেই।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে যে পলিস্তরে এই আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তাদের আনুমানিক গভীরতা ধরা হচ্ছে— ১৫ থেকে ৩০ মিটারের মধ্যে এবং ১০০ মিটারের নীচে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে তিনটি 'অ্যাকুইফার' রয়েছে। প্রথমটি ২ থেকে ১৫ মিটারের মধ্যে, দ্বিতীয়টি ৪০ থেকে ৮০ মিটারের মধ্যে এবং তৃতীয়টি ১০০ মিটারের নীচে। বিশেষজ্ঞদের মতামত এরকমই। এর অর্থ হ্যাত দ্বিতীয় 'অ্যাকুইফারে'র জলে তুলনামূলকভাবে কম আর্সেনিক থাকবে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ব বিভাগে যোগাযোগ করেও সমগ্র বঙ্গভাষী এলাকার সার্বিক কোনও ভূ-তাত্ত্বিক প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। অবশ্য কোন পলির কত বয়স সে সব জানার আগ্রহ সাধারণ মানুষের নেই। তারা জানতেও চাইছে না আর্সেনিকের উৎস। তারা চাইছে বিশুদ্ধ জল, আর্সেনিকের অভিশাপ থেকে মুক্তি।

যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক কোনও সংস্থা উপ মহাদেশে কোনও প্রকল্প চালু না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু হবার উপায় নেই। আর বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মতামত ভিন্ন এক পা'ও এগনো যায় না। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪ মিলিয়ন পানীয় জলের নলকূপ রয়েছে (সৌজন্য : ইউনিসেফ)। বাংলাদেশের বহু নলকূপের বয়সই ১৫ থেকে ২৫ বছর। আর এই সময়টা আর্সেনিকজনিত ক্যান্সার কিংবা অন্যান্য রোগ মানুষের শরীরে পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধতে যথেষ্ট। উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশের কিছু এলাকা বাদ দিলে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশই আর্সেনিক কবলিত। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী দৈনিক প্রায় ১৮ মিলিয়ন মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আর্সেনিক জল পান করছে। প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। আর্সেনিক দুষ্ট বাংলাদেশের যে মানচিত্র বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকাশ করেছে তাতে কয়েক কোটি লোক দৈনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ার শিকার। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা নিতান্তই করুণ কারণ সঠিক বিস্তারিত তথ্য কবে পাওয়া যাবে কেউ জানে না। ৬টি না ৮টি জেলা আর্সেনিক কবলিত সেটা নিয়েও নাকি কিছু সংশয় রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক কবলিত এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক তথা ভূ-রাসায়নিক মানচিত্র তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে না। এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক সমীক্ষার কাজই সম্পূর্ণ হয়নি।

প্রযুক্তিগত কর্মশালার বাইরে যেটা এখনই দরকার, সেটা হচ্ছে, আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। সরকারি বা বেসরকারি ভাবে এখনও তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অতএব ওপরওয়ালাই ভরসা। □

সন্দর্ভ-এর যযাতীয় : উপভোগ্য হাসির নাট্য

মেঘ মুখোপাধ্যায়

যযাতীর উপাখ্যান মানুষকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। মানুষ বৃদ্ধ হতে চায় না, চায় চিরযৌবন। দেহমনে অটুট অচঞ্চল যৌবন নিয়ে মানুষ চায় নিরবধিকাল এই মেদিনীকে উপভোগ করতে। মনের তারুণ্য বজায় থাকলে হবে কি, কালের গতিতে রক্তমাংসের শরীর তো জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, শরীর শোনে না মনের বাসনা, মনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না জীবকোষ, রক্তপ্রবাহের গতি। শরীরে জরার প্রকোপ জীবনচক্রে এক মহাভিশাপ বলে মনে করেছে মানুষ। কিছু কিছু মহাপরাক্রমী মানুষ প্রবল কামনার ঘোরে তথা জীবনতৃষ্ণায় চায় জরাকে অস্বীকার করতে। বয়সকালে শরীরের ক্ষয় তাদের দমাতে পারে না। চিরযৌবন আকাঙ্ক্ষায় কাতর মানুষের পুরাণপ্রতিমা হলেন যযাতী। যযাতী তাঁর পুত্রদের কাছে তাঁদের কোনও এক জনের যৌবন প্রার্থনা করেছিলেন এই মনমোহিনী পৃথিবীকে আরও কিছুকাল উপভোগ করার জন্য। মাত্র এক পুত্র পিতার এই বিচিত্র প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। তারপর উভয়ের শরীর-মনের পরস্পরের আদানপ্রদান ঘটে, পৃথিবীতে রচিত হয় অদ্ভুত এক উপাখ্যান।

যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রলোভনে মধ্যযুগের মানুষ কত রকম করণকৌশল তথা অপবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছিল। আধুনিক মানুষও মানবশরীরে যৌবনের অবস্থান কীভাবে দীর্ঘমেয়াদী করে তোলা যায় তার জন্য বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছে বলে শোনা যায়। যাই হোক, এই মধুর আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের কল্পনা ও চিন্তাকে নানা যুগে নানা ভাবে আলোড়িত করেছে। কল্পনার এই আলোড়নের একটি অভিনব চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেখলাম সন্দর্ভ নাট্যগোষ্ঠীর 'যযাতীয়' নামের সাম্প্রতিক নাটকটির অভিনয়ে— নাটকটি লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন বহুরূপী গোষ্ঠীর বিখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র বসু। তাঁর কল্পনায় ব্যাপারটা ধরা দিয়েছে মজার আকারে। ঘটনাচক্রে বৃদ্ধের দেহ-মনে যৌবনের আবির্ভাব ঘটলে সমাজে-সংসারে যে কী বিপত্তি ঘটে, পরবর্তী ঘটনাধারা কী রকম লাগামছাড়া, হাস্যকর আর শেষ পর্যন্ত ভীতিউদ্রেককারী হয়ে দাঁড়ায় সেটাই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দক্ষ অভিনয়ের গুণে ফুটে উঠেছে 'যযাতীয়' নাট্যে।

নাটকের শুরু এক অত্যাশ্চর্য, অকল্পনীয় আবিষ্কার থেকে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বৃদ্ধ আদিনাথ বহুকালের সাধনায়-গবেষণায় ব্যাপৃত থেকে বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করেছেন সেই স্বর্গীয় মন্ত্র যার উচ্চারণে যযাতী আর তাঁর পুত্রের উভয়ের শরীর-মনে পরস্পরের বয়স বদল হয়েছিল— যযাতী লাভ করেছিলেন তরুণ পুত্রের যৌবন আর পুত্রের অস্থি-মাংসে-মনে ভর করেছিল পিতার বার্ধক্য। কিন্তু মন্ত্রের আবিষ্কার করলেই তো হয় না, যতক্ষণ না তার প্রয়োগ হচ্ছে ততক্ষণ তার প্রমাণই বা কী, মন্ত্র আবিষ্কারের সার্থকতাই বা কোথায়! আবিষ্কৃত মন্ত্র নিয়ে আদিনাথ যখন উল্লাসে বিহ্বল অথচ প্রয়োগ অভাবে সন্দিহান তখন হঠাৎ এক ঘটনাসূত্রে মন্ত্র প্রয়োগের তথা প্রমাণলাভের সুবর্ণ সুযোগ এসে যায় তাঁর হাতের মুঠোয়।

তাঁর অতিস্নেহের নাতনি হাসি যাকে বিয়ে করবে বলে বদ্ধপরিকর সেই টগবগে যুবক সুবীরের সঙ্গে কিন্তু আদিনাথের পুত্র দিবানাথ কিছুতেই বিয়ে দেবেন না; কারণ সুবীরের মানসিক গঠনের সঙ্গে এই ঐতিহ্যশালী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পরিবারের কোনও মিল তো নেই-ই উপরন্তু সুবীরের চোখে তারা অবজ্ঞার আর

তাচ্ছিল্যের পাত্র। সুবীরকে নিয়ে পিতা-পুত্রীর দ্বন্দ্বে মধ্যস্থতা করতে এগোন আদিনাথ। তিনি সুবীরের সঙ্গে দেখা করতে চান। সুবীর দেখা করতে আসে। সে এক প্রবল বিজ্ঞানবাদী যুবা — তার কাছে প্রাচীন শাস্ত্র, মন্ত্র ইত্যাদির কানাকড়ি দাম নেই। তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে অত্যন্ত উদ্ধত, সৌজন্যহীন, রুক্ষ করে তুলেছে। এই প্রবীণ, অভিজ্ঞ আদিনাথকে সে মানুষ বলেই পাত্তা দিতে চায় না। কোনও প্রাচীন জ্ঞানে তার আস্থা নেই। আদিনাথকে সে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে জর্জরিত করে দেয়। উভয়ের মধ্যে প্রীতিকর বাক্যালাপের বা মধুর সম্পর্ক স্থাপনের কোনও অবকাশই সে দিতে চায় না।

মূঢ় যুবকের অন্ধ বিরুদ্ধতায় বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত পণ্ডিত ক্রোধে জ্বলে ওঠেন এবং প্রাচীন জ্ঞানের উৎকর্ষের প্রমাণ দিতে অবিশ্বাসী যুবকের ওপর তাঁর বয়স বদলের মন্ত্র প্রয়োগ করেন। মন্ত্রের এই প্রথম ও আকস্মিক প্রয়োগ সার্থক হয়। শরীরে-মনে আদিনাথ সুবীরে আর সুবীর আদিনাথে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তারপর শুরু হয়ে যায় এক মজার নাটক — দমফাটা হাসির ঘটনাশৃঙ্খল। স্বচ্ছন্দে নিজের ধারায় অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে। এই চমকপ্রদ নাট্যের পুরো বিবরণ এখানে দেওয়া থেকে বিরত হলাম কারণ দেখার মজাটা তা হলে কিছু কমে যাবার আশঙ্কা থাকে। তবে এটুকু বলা যায় যে যুবকে পরিণত আদিনাথ আর কিছুতেই বৃদ্ধ দশায় ফিরে যেতে চান না, তিনি তাঁর নবলব্ধ যৌবনকে উপভোগ করবেন বলে ঘোষণা করে দেন। সুবীর পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে শত কাকুতিমিনতি করলেও পাত্তা দেন না। এদিকে, সুবীর বাড়ি ফিরছে না দেখে অধিকরাত্রে তার দাদা এ বাড়িতে খোঁজ নিতে আসে এবং সন্ধান না পেয়ে থানার দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে ফেরে। সে নিশ্চিত, প্রেমঘটিত ব্যাপারে তার ভাইকে ডেকে এনে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। দারোগা-পুলিশের আবির্ভাবে ঘটনা আরও জটিল, অদ্ভুতুড়ে হয়ে দাঁড়ায়, হাসির মজার ফোয়ারাও দ্বিগুণিত হয়ে যায়।

দারোগার সামনে যুবারূপী আদিনাথ আর বৃদ্ধরূপী সুবীরকে দস্তুরমতো 'অভিনয়' করে যেতে হয় — নাটকের মধ্যে নাটক জমে ওঠে। ব্যাপার আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায় যখন দারোগা বুঝতে পারে যে সে তার প্রাক্তন শিক্ষকের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে এসেছে। কিন্তু একসময় তার খটকা লাগে যে কোথাও একটা গোলমাল ঘটেছে কারণ একালের যুবা (রূপান্তরিত আদিনাথ) 'কেলো' শব্দটির মানে বুঝতে পারছে না, অন্যদিকে প্রবীণ পণ্ডিতের (রূপান্তরিত সুবীর) মুখ দিয়ে তার পক্ষে বেমানান একালের উপযোগী শব্দ বেরিয়ে আসে। দারোগার মনে সন্দেহ জাগা আর তার সন্দেহ নিরসনের জেদী চেষ্টা নাটকটিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

আদিনাথের ভূমিকায় সবিতাব্রত রায় এবং সুবীরের ভূমিকায় রাজা বর্ধনের যোগ্য অভিনয় এ নাটকের সাফল্যের মূল কারণ। তাঁদের মূল চরিত্র এবং রূপান্তরিত চরিত্রের কায়িক ও বাচিক অভিনয়ের নৈপুণ্য যে নাট্যকার-নির্দেশকের অভিপ্রায় পূরণ করতে পেরেছে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ঘনঘন হাসির উচ্ছ্বাস ওঠায় তা প্রমাণিত। প্রথম পর্বের গম্ভীর, বৃদ্ধ পণ্ডিতের ভূমিকায় সবিতাব্রতকে দেখে চোখ সয়ে যাওয়ার পর রূপান্তরিত টগবগে প্রাণচঞ্চল যুবকরূপী সবিতাব্রতর অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। একদিকে বার্ধক্যের, জরার আর বিপরীতক্রমে টগবগে যুবকের এবং জটিল নাট্যমুহূর্তে যখন একই শরীরে দুটো মানুষের মনের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে — সেই সব ক্ষেত্রে তাঁর অভিব্যক্তির সূক্ষ্মতা আর নিয়ন্ত্রণ অভিনয় কলার ওপর তাঁর দখল প্রমাণ করে। দারোগার ভূমিকায় দাপটে অভিনয় করেছেন বিশ্বনাথ মিত্র। তাঁর সতেজ অভিনয় ভিন্ন এ নাট্য পুরোমাত্রায় জমে উঠতে পারত কি না সন্দেহ। হাসির ভূমিকায় শর্মিষ্ঠা রায় যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন কিন্তু নাটকটিতে তাঁর জন্য আরও বিস্তৃত ভূমিকার অবকাশ ছিল বলে মনে হয়েছে — নাট্যকার তথা নির্দেশক নাটকের একমাত্র নারীচরিত্রটিকে আরও সুযোগ দিতে পারতেন।

তাপস সেনের আলো, গৌতম ঘোষের আবহ, শ্রীদাসের রূপসজ্জা এবং রণজিৎ চক্রবর্তীর মঞ্চ নাটকটির মূলরসের অনুসারী এবং সর্বাঙ্গীণ সার্থকতায় উপযোগী হয়েছে।

প্রথম কিছুক্ষণের গাম্ভীর্যের পর নাটকটি মূলত হাস্যরসের। হালকা হাসির নয়, বুদ্ধির স্পর্শে যে-হাসি দ্যুতিময় এবং উপভোগ্য। কিন্তু এই হাসির-মজার বাতাবরণের মধ্যেই নাট্যকার নির্দেশক মনুষ্যজীবনের দুটি প্রধান দশা যৌবন ও জরা নিয়ে আমাদের সামনে কিছু চিন্তাকর্ষক প্রশ্ন উত্থাপন করে দিয়েছেন — এইখানেই এ নাট্যের মূল সার্থকতা। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এই নাট্যের বহু অভিনয় হোক। □

স্মরণে

আহমদ শরীফ, শ্রদ্ধাস্পদেষু

তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য ও বাঙালি সমাজ সম্বন্ধে খ্যাতনামা গবেষক। মার্কসবাদই মানবমুক্তির একমেব পন্থা এই ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী স্বয়ংঘোষিত নিরীশ্বরবাদী — কথায় এবং কাজে। অথচ আমি মধ্যযৌবনেই অজ্ঞেয়বাদের নির্মোক পরিহার করে প্রকাশ্যে আস্তিক্যভাবনাকে গ্রহণ করেছি।

কিন্তু তবুও আমি তাঁর অনন্য ভক্ত বহু দিন থেকেই।

কারণ আপাত অমিলের চেয়েও বড় ছিল আমাদের একাত্মতার দিকগুলি। তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে এই ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদের সাধনাকে পরাভূত করেছিল তার সাংস্কৃতিক অভিন্নতা সত্ত্বেও। সাম্প্রদায়িকতা উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিবেশীসুলভ সম্বন্ধ গড়ে তোলার পথে এখনও বাধা। শুধু তাই নয়, সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে তিনটি রাষ্ট্রের সমাজ ও অর্থব্যবস্থাই ক্ষতবিক্ষত। কুত্রাপি জনগণের বাঞ্ছিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। সুতরাং আদ্যন্ত অসাম্প্রদায়িক এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কম্বুকণ্ঠে ও ক্ষুরধার লেখনীর সহায়তায় জেহাদকারী আহমদ শরীফ সাহেব আমার 'হিরো' হবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী?

বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিকতা ও যুক্তিবাদ ছিল আহমদ শরীফ সাহেবের ব্যক্তিত্বের অপর এক বিভূতি। এখানেও তিনি ছিলেন আপোষহীন। বারবার বলতেন (এবং লিখতেনও) যে সমগ্র চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের মূলসূত্রকে বার তেরশো বৎসর পূর্বেকার জ্ঞান ও সত্যে আবদ্ধ রেখে এগোবার চেষ্টা পায়ের পাতা দুটিকে পিছনে ঘুরিয়ে সামনে চলার প্রয়াসের মতো। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যসন্ধানের সাধনায় শেষ কথা বলে কিছু নেই। এ যাত্রা অনন্ত — এই ছিল তাঁর প্রতীতি। কোনও বিশ্বাস কোনও সত্যই তাঁর কাছে গ্রহণীয় ছিল না, যদি না আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তিবাদের কষ্ঠিপাথরের যাচায়ে তা উত্তরিত হতে পারে। কোনও অবতার, প্রেরিত পুরুষ অথবা শাস্ত্রগ্রন্থকে তিনি প্রামাণ্য স্বীকার করতেন না যদি না তাঁদের কথা বা উপদেশ তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়। এর জন্য একাধিকবার একাধিক মৌলবাদী গোষ্ঠী তাঁর গর্দান নেবার হুঙ্কার ছেড়েছে। শানমণ্ডীর তাঁর আবাস-ভবনেও বোমা পড়েছে। কিন্তু তিনি এসব ভয়-ভীতিতে আদৌ প্রভাবিত না হয়ে তাঁর কথা বারবার বলে গেছেন। গান্ধীবাদী না হয়েও গান্ধীবাদের দুই অনন্য উপাদান — নির্ভীকতা ও নিরস্ত্রের অহিংস প্রতিরোধের অনন্য উদাহরণ পেশ করেছিলেন তিনি।

প্রথমত অনুরাগী পাঠক হিসাবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরবর্তীকালে পত্র ও পুস্তক বিনিময়ের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা তা পুষ্ট হয়েছিল। আমার "দাঙ্গার ইতিহাস" বইটির যে দীর্ঘ সমালোচনাপ্রবন্ধ তিনি ঢাকার একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে লিখেছিলেন তাতে আমাদের উভয়ের যৌথ বিশ্বাস অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাই উদ্ভাসিত হয়েছিল। আমাদের মধ্যে এই সাধারণ মিলনভূমির জন্যই তিনি গান্ধীবাদী না হয়েও মহাত্মার প্রশস্তি রচনা দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছিলেন। আমার সম্পাদিত "মহাত্মাগান্ধী — ১২৫" সঙ্কলন গ্রন্থে তাঁর সেই মূল্যবান রচনাটি মুদ্রিত।

আলোচনা প্রসঙ্গে আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী শুনে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তা হলে আমার ধর্মনিরপেক্ষতায় ফাঁকি আছে। কারণ ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁর বিশেষ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের রূপকে অপরের ঈশ্বর বা তার রূপ থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আর ওই ঈশ্বরের কাছে উপনীত হবার বিশেষ মত ও পথ বা বিশিষ্ট ধর্মকেও অন্য ধর্মের তুলনায় মহীয়ান জ্ঞান করেন। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু, উদার বা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। আত্মপক্ষ সমর্থন প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে আমার বিশ্বাসের ঈশ্বর নিরাকার, বিশ্বচরাচরে ক্রিয়ারত পরমশক্তি। তাঁর কোনও রূপ বা আচার-অনুষ্ঠানে আমার আস্থা নেই। সৌভাগ্যের কথা এই ব্যাখ্যার পর আমার ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্বাস মেনে নিতে তাঁর আর আপত্তি হয়নি।

নিজ কর্তব্য ও বৌদ্ধিক দায়-দায়িত্ব যোগ্যতা সহকারে পালন করার পর প্রকৃতির নিয়মে আহমদ শরীফ সাহেব গত হয়েছেন। উভয় বঙ্গে তাঁর উত্তরসাধকদের তাঁর অপূর্ণ সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। মুক্ত মনের, বুদ্ধির মুক্তির এই অনন্ত সাধনার মন্ত্র চরৈবেতি, চরৈবেতি — এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। মার্কসবাদ অথবা গান্ধীবাদ, নিরীশ্বরবাদ অথবা আস্তিক্যবাদ এবং ওই জাতীয় ভেদাভেদ এখানে গৌণ। মুখ্য হল — খোলা মন, যা বলবে, "আ নো ভদ্রা: ক্রতবো যন্তু বিশ্বত:"। চতুর্দিক থেকে মহৎ চিন্তাধারা আমার দিকে প্রবাহিত হোক।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, আহমদ শরীফের অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁর দেহ কবরস্থ হয়নি, ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দান করা হয়েছিল। চক্ষুদুটিও আগে থেকেই দৃষ্টিহীনদের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। যা ইতিমধ্যেই দু'জনকে দৃষ্টিদানে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। □

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'সুভাষচন্দ্রের গুরুসন্ধান'

বৈশাখ-আষাঢ় (১৪০৫) সংখ্যায় সুভাষচন্দ্রের গুরুসন্ধান' শীর্ষক নিবন্ধটিতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উন্মেষকালের চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণের যে-চেষ্টা করা হয়েছে তা সাধু হলেও লেখকের কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উদ্ভব হয়, যা কিঞ্চিৎ আলোচনাযোগ্য বলে মনে করি।

রচনাটির প্রারম্ভে লেখক মন্তব্য করেছেন যে, গান্ধীর নির্দেশেই সুভাষচন্দ্র ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁকে 'গুরুবরণ' করেন—এমন একটি কথা নাকি সুভাষ গবেষকেরা 'চালু করে দিয়েছেন'। কিন্তু কোন গবেষকেরা একথা কোথায় চালু করলেন, তা না জানা গেলে কি এ-মন্তব্য গ্রহণ করা চলে? আমরা কিন্তু বাজারে প্রচলিত জনপ্রিয় সুভাষ-জীবনী থেকে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, সর্বত্রই দেশের কাজে আত্মনিয়োগের সংকল্প জানিয়ে বিলেত থেকে চিত্তরঞ্জনকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠির যথাযথ উল্লেখ দেখেছি। এরকম দু'টি সুপরিচিত বইয়ের নামও উল্লেখ করা যায়—মণি বাগচির 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র' ও পবিত্রকুমার ঘোষের (তিন খণ্ডে অসম্পূর্ণ) 'সুভাষচন্দ্র'। গান্ধী নিশ্চয়ই জানতেন না যে, সুভাষ আগেই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাই তাঁর পক্ষে তরুণ বাঙালি দেশহিতব্রতীকে বাংলাদেশের অবিসংবাদী নেতা চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে তাঁর কথাতেই ওই কাজ করেছিলেন এমন কথা মনে করার কারণ নেই। বিলেতে থাকতেই সুভাষচন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তের কথা যেহেতু সব জীবনীতেই পাওয়া যায়, শিশির বসু মহাশয় ১৯৯৬ সালে একথা লিখলেও, একে কাজে কাজেই খুব 'নতুন চিন্তা' বলা যায় না।

সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তির জন্য কমুনিস্ট আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হননি, এই সুবিদিত তথ্যকে সমর্থনের জন্য গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মতামত উদ্ধার করবার বা তাঁর পিতার কেমব্রিজে পড়াশোনার সময় শ্রমিক-সংগঠনে লিপ্ত হবার উন্মেষের কোনও প্রয়োজন ছিল কিনা সন্দেহ! সবচেয়ে বড় কথা—সুভাষচন্দ্র ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করার কথা ভাবেননি, শুধু অহিংস গণ-আন্দোলনে যোগ দেবার কথাই ভেবেছেন, এ রকম সরলরৈখিক সিদ্ধান্তও ঠিক নয়। কেমব্রিজ থেকে বালাবন্ধু চারুচন্দ্র গাঙ্গুলিকে একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র সে-সময় লিখেছিলেন: "এখানে এসে এবং এখানকার লোকজন ও কার্যপ্রণালী দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশে দুইটা জিনিস খুব বেশি রকম ভাবে চাই—(১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, (২) "Labour Movement...." (২০-৩-১৯২০)। যাঁরা নিজেদের ভারতীয় শ্রমিককুলের একচেটিয়া পরিত্রাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, সুভাষচন্দ্রকে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের জাতীয় আন্দোলনের সপক্ষে বড় শক্তি বলে মনে করতেন না—তাঁদের এই ধরনের পুরনো অপপ্রচার সত্যি হলে কংগ্রেস-নেতা রূপে সুভাষচন্দ্র বিশের দশকে বারবার শ্রমিক-আন্দোলনে যুক্ত হতেন না।

কেমব্রিজের ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র যে শুধু অহিংস গণ-আন্দোলনের কথাই ভাবেননি, তার কিছু প্রমাণও তাঁর জীবনবৃত্তান্তে পাওয়া যায়। এ সময় সুভাষ নানা দেশের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিশেষভাবে পড়াশোনা করেছিলেন। পবিত্রকুমার ঘোষ জানিয়েছেন—ছাত্র সংগঠনে গণসংযোগ ছাড়াও কেমব্রিজে সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপের কিছু গোপন দিকও ছিল। 'শোনা যায় এই সময় লণ্ডনের একটি বিশিষ্ট সংস্থায় তিনি ছদ্মবেশ ধারণের ট্রেনিংও নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি শিক্ষা সম্পূর্ণও করেছিলেন।...." [সুভাষচন্দ্র / দ্বিতীয় খণ্ড]। এ ছাড়া আয়ার্ল্যান্ডের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যে এ সময় থেকেই যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন, তারও ইঙ্গিত মেলে। তাঁর সহপাঠী দিলীপকুমার রায়ের কাছে শুনেছি, যখন অন্যান্য ছাত্রেরা ছুটি পেলেই পারি যেতেন অপেরা দেখতে তখন সুভাষচন্দ্র ছুটতেন আয়ার্ল্যান্ডে।

সমাজসেবা ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রে লেখকের আর একটি মন্তব্যেও কিছুটা বিভ্রান্তি জন্মাতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে। তিনি যেভাবে এক নিঃশ্বাসে "বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দের আত্মশক্তির রাজনীতির ধারার কথা" উল্লেখ করেছেন তাতে মনে হতে পারে যে, ওই তিন মনীষীই এক বিশেষ ধারার রাজনীতির প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ আত্মিকশক্তি দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনের কথা বললেও (নিঃসন্দেহে যা সুভাষসহ অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল) খোলাখুলি রাজনীতির কথা কার্যত কখনওই বলেননি। 'আত্মশক্তির রাজনীতি বলতে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ-প্রচারিত স্বদেশি সমাজের তত্ত্বের কথা মনে পড়ে—যে পন্থায় পল্লী সংগঠনের প্রস্তাব স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই দলের রাজনীতিকদেরই দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এঁদের সম্পর্কে এবং বিশেষ ভাবে চরমপন্থীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে হতাশ হয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য রয়েছে অবলা বসুকে লেখা ১৯০৮ সালের একটি চিঠিতে, যেখানে তিনি বলছেন যে, চরমপন্থীরা কেবল "চরমের কথাই ভাবছেন,... এ পর্যন্ত এঁদের দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র কাজও হয়নি।"

এই চরমপন্থী দের নেতা অরবিন্দ ঘোষও স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের ওই আত্মশক্তি-লক রাজনীতিকে সমর্থন করেননি। ১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তিনি 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ব' নামে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও মৈত্রীর ভাবধারাকে অস্বীকার করে মত প্রকাশ করেন যে প্রথমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না করে সমাজ-শিক্ষা-শিল্প ও নৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করাটা অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং অনর্থক। এই বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে অসহযোগ—যে-তত্ত্ব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষপর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেন। অরবিন্দ স্বল্পকাল জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষতা করা ছাড়া তেমন কোনও "গঠনমূলক রাজনীতির প্রয়াস" করেছেন কিনা সন্দেহ! তাই অরবিন্দ সম্পর্কে (তাঁর রাজনৈতিক মত সমাক অনুধাবন না করেই) রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে শ্রদ্ধানিবেদন করলেও, দু'জনে একই রাজনৈতিক ভাবধারার শরিক ছিলেন, এমন কথা আংশিকভাবেও ঠিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সমাজের সহযোগিতার তত্ত্বই পরিণততর রূপ নেয় অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বভারতীর ভাবধারায়। জাহাজে ভারতে ফেরার সময় রাজনৈতিক বিরোধিতা সম্পর্কে সতর্ক রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁর মনের তীব্র বিরোধিতার কথা সুভাষচন্দ্রের কাছে কতটা প্রকাশ করেছিলেন সন্দেহ। তবে পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' কাগজে যখন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আদর্শকে তীব্র আক্রমণ করা হয়, তখন চিত্তরঞ্জনের একনিষ্ঠ অনুগামী হিসাবে সুভাষচন্দ্র কিন্তু 'নারায়ণ'-এর লেখক গোষ্ঠীকেই সমর্থন করেছিলেন। ১৯২৩ সালে অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের জীবনে ও সাহিত্যে যে "শূন্যগর্ভ, অগভীর আন্তর্জাতিকতাবাদের মূলর সত্যটিকে অনুধাবন করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেন। কাজে কাজেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সমাজ গঠনের সংকল্প সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় গঠনমূলক রাজনীতির নতুনমাত্রা যোগ করেছিল কি না—লেখকের এই প্রশ্নের জবাব সুভাষচন্দ্রের এই মন্তব্যে কিছুটা অবশ্যই পাওয়া যায়। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় যে, পরবর্তীকালে (১৯৩৯) যখন রবীন্দ্র সুভাষ সম্পর্ক সর্বোত্তম, 'দেশনায়ক'-এর আসনে সুভাষবরণে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত, তখন বিশ্বভারতীর রক্ষণাবেক্ষণে জাতীয় নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের কাছে তিনি ভরসা চাইলেও সুভাষচন্দ্র কিন্তু প্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতি কখনওই দেননি।

লেখকের আর একটি মন্তব্য—সুভাষ সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে ১৯২১ থেকে ১৯৩০—এই দীর্ঘ নয় বৎসরের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল না। এ প্রসঙ্গে তিনি গবেষক হিসাবে নেপাল মজুমদার ও শিশিরকুমার বসু মহাশয়দের উল্লেখ করেছেন। মজার ব্যাপার এই যে এসময়ের যে-ঘটনাটি এই সম্পর্ক গড়ে না ওঠার জন্য সর্বাধিক দায়ী, লেখক-কথিত নেপালবাবুর বইটিতে বা শিশির বসুর লেখাটিতে কিন্তু তার উল্লেখমাত্র নেই! ঘটনাটি হচ্ছে, ১৯২৮ সালে সিটি কলেজে সরস্বতী পুজোর অধিকার নিয়ে ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের বিরোধে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রপক্ষ সমর্থন। খুব কম জীবনীকারই উল্লেখ করেছেন যে এই ঘটনায় সুভাষ সম্পর্কে যে বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথের মনে পুঞ্জিত হয়েছিল, তার জের ছিল ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-সভাপতি পদে মনোনয়ন পর্যন্ত।

প্রবন্ধটির শেষদিকে যে লেখক লিখেছেন, ১৯১৭ সালে চিত্তরঞ্জনের ভাষণে পল্লীসমাজের পরিকল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সমাজের ভাবধারার 'আশ্চর্য মিল' ছিল, তা যথার্থ। তবে এক্ষেত্রে একথাও বলা দরকার যে, এই মিল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীরা কিন্তু অভিযোগ করেছিলেন যে চিত্তরঞ্জনের এ বক্তব্য সরাসরি রবীন্দ্ররচনা (অর্থাৎ স্বদেশী সমাজ') থেকেই অপহৃত—যেমন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে (জৈষ্ঠ, ১৩২৪) একথা লেখেন। এমনকী, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জনের নাম না করে একই ইঙ্গিত করেছেন হেমন্তবালা দেবীর কাছে: "...আমি যখন 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম তখন তৎকালীন কন্‌গ্রেসওয়ালারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন।...কিন্তু আমার সেদিনকার কথার টুকরো নিয়ে পরবর্তী অনেক দেশাত্মবোধী তাঁদের বাণীক্রমে ব্যবহার করেছেন ও দেশে ধন্য হয়েছেন। বেঁচে থাকতে থাকতে এও দেখেছি।..." (৪ কার্তিক, ১৩৩৯)

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী
জামশেদপুর—৯